কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

২

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

সূচি

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ইতিহাসে বলপ্রয়োগের ভূমিকা (১)

আমাদের তত্ত্বকে এখন সমসাময়িক জার্মান ইতিহাস এবং তার বলপ্রয়োগ, তার নির্মম প্রচন্ড শক্তিপ্রয়োগের নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাক। কেন এই নির্মম প্রচন্ড শক্তিপ্রয়োগের নীতি কিছু কালের জন্য সফল হতে বাধ্য ছিল এবং কেন শেষে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল আমরা এইভাবে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাব।

১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেস (২) ইউরোপকে এমনভাবে বিভক্ত ও বিক্রি করে দেয়, যা সারা পৃথিবীর কাছে ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রনীতিকদের পরিপূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ ছিল নেপোলিয়ন যাদের পদদলিত করেছিলেন সেই সমস্ত জাতির জাতীয় মনোভাবেরই প্রতিক্রিয়া। এর জন্য কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে ভিয়েনা কংগ্রেসে নৃপতি ও কূটনীতিকরা সেই জাতীয় মনোভাবকে আরও বেশি অবজ্ঞাপূর্ণভাবে পদদলিত করলেন। ক্ষুদ্রতম রাজবংশকে বৃহত্তম জাতির চাইতে বেশি শ্রদ্ধা দেখানো হল। জার্মানি ও ইতালিকে আবার ছোট ছোট রাষ্ট্রে ভেঙে দেওয়া হল, পোল্যান্ডকে বিভক্ত করা হল চতুর্থবার আর হাঙ্গেরিকে রেখে দেওয়া হল দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায়। এমন কি এ কথাও বলা যায় না যে জাতিসমূহের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল: তারা তা সহ্য করল কেন, এবং কেন তারা রুশ জারকে* তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে বরণ করল?

কিন্তু বেশিকাল তা চলতে পারে নি। মধ্য যুগের শেষ থেকে ইতিহাস এগিয়ে চলেছে ইউরোপে বড় বড় জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের দিকে। একমাত্র এরূপ

---

* প্রথম আলেক্সান্দর। — সম্পাঃ

রাষ্ট্রই শাসক ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাভাবিক রাজনৈতিক কাঠামো এবং, সেই সঙ্গে, জাতিসমূহের মধ্যে সুসমঞ্জস আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপনের এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত — যা না-হলে প্রলেতারিয়েতের শাসন অসম্ভব। আন্তর্জাতিক শান্তি সুনিশ্চিত করতে হলে পরিহারযোগ্য সমস্ত জাতীয় সংঘাত অবশ্যই সর্বপ্রথমে দূর করতে হবে, প্রত্যেক জাতিকে অবশ্যই হতে হবে স্বাধীন এবং স্বগৃহে প্রভু। বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের বিকাশ এবং তার দ্বারা বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক পরাক্রমের বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র জাতীয় মনোভাব জাগ্রত হল এবং বিভক্ত তথা নিপীড়িত জাতিগুলি দাবি করল ঐক্য ও স্বাধীনতা।

তাই ফ্রান্স ছাড়া সর্বত্র ১৮৪৮-এর বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল যেমন মুক্তির দাবি পূরণ, তেমনই জাতীয় দাবি পূরণ। কিন্তু প্রথম আক্রমণে যারা বিজয়ী হয়েছিল সেই বুর্জোয়া শ্রেণীর পিছনে সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করল যারা প্রকৃতপক্ষে বিজয় অর্জন করেছিল সেই প্রলেতারিয়েতের দুর্দান্ত চেহারা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীকে তা ঠেলে নিয়ে গেল সদ্যপরাস্ত শত্রুর কোলে — রাজতন্ত্র-সমর্থক, আমলাতান্ত্রিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও সামরিক প্রতিক্রিয়ার কোলে: ১৮৪৯ সালে তারা বিপ্লবকে পরাস্ত করল। হাঙ্গেরিতে ঘটনাটা এরকম ছিল না, সেখানে রুশীয়রা ঢুকে পড়ে বিপ্লবকে চূর্ণবিচূর্ণ করল। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে রুশ জার ওয়ার্‌শ গেলেন, সেখানে তিনি ইউরোপের বিচারক হিসেবে বিচার করতে বসলেন। তিনি তাঁর বশংবদ জীব ক্রিস্টিয়ান গ্লুক্‌স্‌বার্গারকে ডেনমার্কের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন। প্রাশিয়াকে তিনি এমন অপমান করলেন, যেরকম অপমান সে কখনও ভোগ করে নি, এমন কি ঐক্যের জন্য জার্মান আকাঙ্ক্ষা কাজে লাগানোর সামান্যতম বাসনাও তার নিষিদ্ধ করা হল এবং তাকে বাধ্য করা হল পুনরায় বুন্ডেস্টাগ (৩) স্থাপন করতে এবং অস্ট্রিয়ার কাছে নতিস্বীকার করতে। প্রথম নজরে মনে হয়েছিল যে বিপ্লবের একমাত্র ফল হল অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ায় সরকারের এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, আকৃতিতে সাংবিধানিক হলেও যা মর্মগতভাবে পুরনো, এবং রুশ জার আগেকার যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক পরিমাণে ইউরোপের কর্তা।

প্রকৃতপক্ষে অবশ্য এই বিপ্লব এমন কি খণ্ড-বিচ্ছিন্ন দেশগুলিতেও,

বিশেষ করে জার্মানিতে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ধাক্কা দিয়ে তার পুরনো পরম্পরাগত বাঁধা-পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার, যত সামান্যই হোক না-কেন, ভাগ পেল এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিটি রাজনৈতিক সাফল্য ব্যবহৃত হল শিল্পের অগ্রগতিবিধানের জন্য। সফলভাবে কেটে-যাওয়া 'উন্মাদ বছরটি' (৪) বুর্জোয়া শ্রেণীকে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিল যে তাকে পুরনো জড়িমা ও ঔদাস্যের অবসান ঘটাতে হবে চিরতরে। কালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণবৃষ্টি (৫) এবং অন্যান্য পরিস্থিতির ফলে বিশ্ব বাণিজ্যিক সম্পর্কের এক অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ও ব্যবসায়ে তেজী-ভাব দেখা দিল—ব্যাপারটা ছিল সুযোগ গ্রহণ করা এবং নিজের ভাগ ঠিকমতো বুঝে-নেওয়া। ১৮৩০ সালের পর থেকে এবং বিশেষ করে ১৮৪০ সালের পর থেকে রাইন অঞ্চলে, স্যাক্সনিতে, সাইলেসিয়ায়, বার্লিনে এবং দক্ষিণাঞ্চলের কোনো কোনো শহরে যে বৃহদায়তন শিল্প আত্মপ্রকাশ করেছিল, এখন সেগুলির দ্রুত বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটানো হল; গ্রামাঞ্চলগুলিতে কুটিরশিল্প ক্রমেই বেশি বহুবিস্তৃত হয়ে উঠল, রেলওয়ে নির্মাণকর্ম ত্বরান্বিত হল, দেশ থেকে চলে গিয়ে বিদেশে বসবাস করা বিপুলভাবে বেড়ে-চলার ফলে সৃষ্টি হল অ্যাটলান্টিক-পাড়ি-দেওয়া এক জার্মান জাহাজ-চলাচল ব্যবস্থা, তার কোনো ভরতুকি দরকার হল না। জার্মান বণিকরা আগেকার যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক ব্যাপকভাবে বিদেশের সমস্ত বাণিজ্য-কেন্দ্রে বসতি স্থাপন করল, বিশ্ব বাণিজ্যের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ নিয়ে কারবার করতে লাগল এবং ক্রমে ক্রমে শুধু ইংলণ্ডেরই নয়, জার্মান শিল্পজাত পণ্যও বিক্রির জন্য নিজেদের কর্মোদ্যম দেখাতে শুরু করল।

কিন্তু জার্মানির ছোট ছোট রাষ্ট্রের প্রথা, তাদের অসংখ্য ও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বাণিজ্য ও শিল্পসংক্রান্ত আইনকানুন বলিষ্ঠভাবে ক্রমবর্ধমান শিল্প ও তার সঙ্গে জড়িত বাণিজ্যের উপরে অচিরেই অবশ্যম্ভাবীরূপে এক অসহ্য বেড়ি হয়ে উঠল। কয়েক মাইল অন্তর-অন্তরই বিনিময়-পত্র সংক্রান্ত আলাদা আলাদা আইন ছিল, বাণিজ্যের শর্তও ছিল পৃথক; সর্বত্র, আক্ষরিকভাবেই সর্বত্র ছিল সব ধরনের প্রতারণা, আমলাতান্ত্রিক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত ফাঁদ, এবং প্রায়শই ছিল গিল্ড বা বণিক সমবায়-সংঘের প্রতিবন্ধক, যার বিরুদ্ধে এমন

কি পেটেন্টেও কোনো কাজ হত না! তদুপরি ছিল বিভিন্ন স্থানীয় বসতি-সংক্রান্ত আইন এবং বসবাস-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, যার ফলে পুঁজিপতিদের পক্ষে তাদের আয়ত্ত শ্রম-বাহিনীকে যথেষ্ট সংখ্যায় সেইসব স্থানে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল, যেখানে আকরিক ধাতু, কয়লা, জলসম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থার অস্তিত্ব শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের অনুকূল! পিতৃভূমির শ্রম-বাহিনীকে দলবদ্ধভাবে ও অবাধে শোষণ করার ক্ষমতাই ছিল শিল্পবিকাশের প্রথম শর্ত, কিন্তু যেখানেই দেশপ্রেমিক পণ্যোৎপাদক সমস্ত প্রান্ত থেকে শ্রমিকদের জড়ো করত, পুলিস ও বেচারি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নবাগতদের বসতি-স্থাপনের বিরোধিতা করত। একটিমাত্র সারা-জার্মান নাগরিক অধিকার ও দেশের সকল নাগরিকের জন্য গতিবিধির পূর্ণ স্বাধীনতা একটিমাত্র বাণিজ্যিক ও শিল্প-সংক্রান্ত আইন আর আবেগদৃপ্ত ছাত্রদের দেশপ্রেমিক কল্পনামাত্র রইল না, এখন তা হয়ে উঠল শিল্পের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এক শর্ত।

তাছাড়া, প্রতিটি রাষ্ট্রে, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক, ছিল ভিন্ন মুদ্রা, ভিন্ন ওজন ও মাপ, এবং প্রায়শই একই রাষ্ট্রে দুই বা তিন ধরনের পৃথক পৃথক মুদ্রা, ওজন প্রভৃতি ছিল। আর অসংখ্য ধরনের এই সব ধাতুমুদ্রা, ওজন ও মাপের একটিও বিশ্বের বাজারে স্বীকৃত ছিল না। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, পৃথিবীর বাজারে যারা ব্যবসা করত, কিংবা আমদানি-পণ্যের বিরুদ্ধে যাদের প্রতিযোগিতা করতে হত সেই সব বণিক-ব্যবসায়ী ও পণ্যোৎপাদককে নিজেদের বহু মুদ্রা, ওজন ও মাপ ছাড়াও বিদেশী মুদ্রা, ওজন ও মাপও ব্যবহার করতে হত; কাপাস সুতো রীলে রাখা হত ইংরেজি পাউন্ড ওজনে, রেশম বস্ত্র তৈরি হত মিটারের মাপে, বিদেশী বিল তৈরি করা হত পাউন্ড স্টার্লিংয়ে, ডলারে এবং ফ্রাঁ-তে! এই সব সীমাবদ্ধ মুদ্রার এলাকায়, যার কোথাও ব্যাঙ্ক-নোট গুলডেনে, কোথাও প্রুশীয় টেলারে, তার পাশেই স্পর্ণ-টেলারে, 'নয়া দুই-তৃতীয়াংশ' টেলারে, ব্যাঙ্ক মার্কে, চলতি মার্কে, কুড়ি-গুলডেন প্রথায়, চব্বিশ-গুলডেন প্রথায় এবং তৎসহ অন্তহীন বিনিময়-সংক্রান্ত হিসাব এবং দরের ওঠা-পড়া চলছে, সেই এলাকায় বড় বড় ঋণদান প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যেত কীভাবে?

আর যদি শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত ব্যাপার কাটিয়ে ওঠা যেতও, তাহলে

এই সব বিরোধ-সংঘাতের পিছনে কত প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হত, অপচয় হত কত অর্থ আর সময়! শেষ পর্যন্ত, জার্মানিতেও লোকে এবিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিল যে আজকাল সময়ই অর্থ।

তরুণ জার্মান শিল্পের পক্ষে পৃথিবীর বাজারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দরকার ছিল, তার বৃদ্ধি ঘটতে পারত একমাত্র রপ্তানির মধ্য দিয়েই। এ জন্য বিদেশে তার আন্তর্জাতিক আইনের রক্ষণমূলক আশ্রয় দরকার ছিল। ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিন বণিক স্বদেশের চাইতে বিদেশে অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে পারত। তাদের কূটনৈতিক দূতাবাস তাদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করত, এবং দরকার হলে কিছু যুদ্ধজাহাজও পাঠানো হত। কিন্তু জার্মান বণিক? পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অস্ট্রিয়ান বণিক তার কূটনৈতিক দূতাবাসের উপরে অন্তত কিছুটা পরিমাণে নির্ভর করতে পারত, অন্যত্র তা তাকে খুব একটা সাহায্য করত না। কিন্তু যখনই বিদেশে কোনো প্রুশীয় বণিক তার প্রতি কোনো অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে তার রাষ্ট্রদূতের কাছে অভিযোগ করত, তখনই তাকে অনিবার্যভাবে বলা হত: 'উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে, এখানে তুমি কী চাও, স্বদেশে গিয়ে চুপচাপ থাকো না কেন?' ছোট রাষ্ট্রের প্রজারা সর্বত্র সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। যেখানেই যাওয়া যাক, জার্মান বণিকরা ছিল বিদেশী — ফরাসী, ইংরেজ অথবা মার্কিন — রক্ষণাধীনে, অথবা তা না হলে নতুন দেশে দ্রুত নিজেদের তদুপযোগী করে সেখানকার নাগরিক অধিকার পেত।* তাদের রাষ্ট্রদূতেরা যদি তাদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করতে চাইতেনও, তাহলেই বা কী লাভ হত? বিদেশে জার্মান রাষ্ট্রদূতদের জুতোর কালির চাইতে বেশি কিছু বলে গণ্য করা হত না।

এ থেকে দেখা যায় যে ঐক্যবদ্ধ 'পিতৃভূমির' বাসনার অত্যন্ত বৈষয়িক এক পশ্চাৎপট ছিল। তা আর ভার্টবুর্গ উৎসবে (৬), 'যেখানে সাহস ও শক্তি জার্মান অন্তরে উজ্জ্বলন্ত', এবং যেখানে, একটি ফরাসী সুরে নিবদ্ধ গানের ভাষায়, মধ্যযুগের রোমান্টিক রাজকীয় গরিমা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে 'সেই তরুণ পিতৃভূমির জন্য লড়াই করে প্রাণ দেওয়ার উত্তাল আকাঙ্ক্ষায় আত্মহারা

* এঙ্গেলস এখানে পৃষ্ঠার পাশে পেন্সিলে লিখেছিলেন 'Weerth'। — সম্পাঃ

হয়ে গিয়েছিল',* সেখানে কোনো জার্মান ছাত্র-সমিতির কোনো সদস্যের অস্পষ্ট অভীপ্সা ছিল না,—যদিও সেই উদ্দাম তরুণ তার প্রবীণতর বয়সে পরিণত হয়েছিল তার নৃপপুঙ্গবের একজন সাধারণ ছদ্ম-পবিত্রতাভিমানী ও সার্বভৌম-ভক্ত অনুচরে। হামবাখ উৎসবের (৭) আইনজীবী ও অন্যান্য বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের অপেক্ষাকৃত বেশি বাস্তবসম্মত ঐক্যের আহ্বানও তা আর ছিল না, তারা ভাবত নিজেদের জন্যই তারা স্বাধীনতা ও ঐক্য ভালোবাসে, কিন্তু আদৌ লক্ষ করে নি যে সুইশ ধাঁচে জার্মানিকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা—তাদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি সবচেয়ে কম তালগোল পাকানো তাদের আদর্শের অর্থ ছিল এটাই—উপরোক্ত ছাত্রদের 'হোহেনস্টাউফেন সাম্রাজ্যের' মতোই অসম্ভব ছিল। না, তা ছিল বাণিজ্য ও শিল্পের অবাধ বিকাশে প্রতিবন্ধক সমস্ত ঐতিহাসিকভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার, পৃথিবীর বাজারে প্রবেশ করতে ইচ্ছা হলে জার্মান ব্যবসায়ীকে যে অনাবশ্যক বিরোধ-সংঘাত স্বদেশে কাটিয়ে উঠতে হত, এবং যে ঝামেলার হাত থেকে তার সমস্ত প্রতিযোগীরা মুক্ত ছিল, সেগুলি বিলুপ্ত করার আশু ব্যবসায়িক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন বণিক ও শিল্পপতির বাসনা। জার্মান ঐক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থনৈতিক প্রয়োজন। যারা এখন তা দাবি করছিল তারা জানত কী তারা চায়। তারা শিক্ষা লাভ করেছিল বাণিজ্যে এবং বাণিজ্যের জন্য, তারা দর-কষাকষি করতে জানত এবং দর-কষাকষি করতে ইচ্ছুক ছিল। তারা জানত যে চড়া দাম দাবি করা দরকার, কিন্তু এও জানত যে সেই দাম বদান্যতার সঙ্গে কমানোও দরকার। তারা 'জার্মান পিতৃভূমির' গাথা গাইল, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করল স্টিরিয়াকে, টিরোল এবং 'গরিমায় ও বিজয়ে ধনী অস্ট্রিয়া'-কে,** এবং

মাস থেকে মেমেল
আদিগে নদী থেকে বেল্ট পর্যন্ত

---

* উদ্ধৃতিগুলি ক. হিংকেলের 'ইউনিয়ন সংগীত' কবিতা থেকে নেওয়া। — সম্পাঃ

** আর্নড্‌ট্‌-এর 'জার্মান পিতৃভূমি' কবিতা থেকে উদ্ধৃত। — সম্পাঃ

ডয়েটশল্যান্ড, ডয়েটশল্যান্ড উবের আলেস,
পৃথিবীতে সবার উপরে—*

কিন্তু নগদ-বিদায়ের জন্য তারা যে পিতৃভূমি আরও-আরও বড় হয়ে ওঠার কথা**, তার উপরে যথেষ্ট বাটা — ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ — ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। তাদের একীকরণের পরিকল্পনা ছিল তৈরি এবং অবিলম্বে রূপায়ণসাধ্য।

জার্মানির ঐক্য অবশ্য নিছক জার্মানির প্রশ্ন ছিল না। ত্রিশ বছরের যুদ্ধের (৮) পর থেকে অত্যন্ত লক্ষণীয় বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়া কোনো সারা-জার্মান বিষয়েরই মীমাংসা হয় নি।*** দ্বিতীয় ফ্রিডরিখ ১৭৪০ সালে সাইলেসিয়া জয় করেছিলেন ফরাসীদের সাহায্য নিয়ে। ১৮০৩ সালে ডেপুটিবৃন্দের সাম্রাজিক কমিটির দ্বারা পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন ঘটেছিল আক্ষরিকভাবেই ফ্রান্স ও রাশিয়ার নির্দেশে (১০)। তার পর, নেপোলিয়ন জার্মানিকে সংগঠিত করেছিলেন নিজের সুবিধা মতো। এবং সবশেষে, ভিয়েনা কংগ্রেসে**** আবারও রাশিয়া এবং দ্বিতীয়ত ইংলন্ড ও ফ্রান্সের দরুনই তাকে দু-শোর বেশি পৃথক পৃথক ছোট-বড় জমির টুকরো সহ ছত্রিশটি রাষ্ট্রে ভাঙা হল, এবং রেগেনসবুর্গে ১৮০২-১৮০৩ সালের রাইখস্টাগে (১১) যেমন ঘটেছিল, জার্মান রাজবংশগুলি সততার সঙ্গেই এতে সাহায্য করেছিল এবং ভাগাভাগি আরও খারাপ করে তুলেছিল। উপরন্তু, জার্মানির কোনো কোনো অংশ তুলে দেওয়া হল বিদেশী সার্বভৌম রাজাদের হাতে। এইভাবে জার্মানি যে শুধু আভ্যন্তরিক বিরোধে দীর্ণ, রাজনৈতিক, সামরিক, এমন কি শিল্পগত অকিঞ্চিৎকরতায় অক্ষম ও নিঃসহায় হয়ে পড়েছিল তাই নয়। তার চাইতেও যেটা আরও খারাপ, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানিকে বিভক্ত করার অধিকার বারংবার প্রয়োগ করে অর্জন করেছিল,

---

* হফমান ফন ফালেরস্লেবেন-এর 'জার্মান সংগীত' থেকে উদ্ধৃত। — সম্পাঃ

** আর্ন্ডট-এর 'জার্মান পিতৃভূমি' কবিতা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

*** এখানে এঙ্গেলস পৃষ্ঠার পাশে পেনসিলে লিখেছিলেন: 'ওয়েস্ট (ফালিয়া) ও টেশ (এন) শান্তি' (৯)। — সম্পাঃ

**** এখানে লাইনের মাঝে এঙ্গেলস পেনসিল দিয়ে লিখেছিলেন: 'জার্মানি — পোল্যান্ড' — সম্পাঃ

ঠিক যেমন ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া নিজেরাই ইতালি যাতে বিভক্ত থাকে সেটা দেখবার ভার নিয়েছিল। এই তথাকথিত অধিকার জার নিকোলাই প্রয়োগ করেছিলেন ১৮৫০ সালে; তখন রূঢ়তম ভঙ্গিতে সংবিধানের ইচ্ছা মতো কোনো পরিবর্তন করতে দিতে অস্বীকার করে তিনি জার্মানির অক্ষমতার সেই অভিব্যক্তি ফেডারেল ডায়েট — বুন্ডেস্টাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাধ্য করেন।

সুতরাং জার্মানির ঐক্য অর্জন করতে হত শুধু নৃপতিকুল ও অন্যান্য আভ্যন্তরিক শত্রুর বিরুদ্ধেই নয়, বাইরের দেশগুলির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করে। আর তা না হলে — বাইরে থেকে সাহায্য নিয়ে। বাইরে তখন পরিস্থিতি কী ছিল?

ফ্রান্সে, লুই বোনাপার্ট বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রামকে কাজে লাগিয়েছিলেন কৃষকদের সাহায্য নিয়ে নিজেকে প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদায় উন্নীত করার জন্য এবং সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে সিংহাসনে আরোহণের জন্য। কিন্তু, ১৮১৫ সালের ফ্রান্সের সীমানার মধ্যে যাকে সিংহাসনে বসিয়েছে সেনাবাহিনী, এমন এক নতুন নেপোলিয়ন ছিল এক অজাত অসার কল্পনা। পুনর্জাত নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের অর্থ রাইন নদী পর্যন্ত ফ্রান্সের বিস্তৃতি, ফরাসী জাত্যাভিমানের পুরুষানুক্রমিক স্বপ্নের রূপায়ণ। প্রথমে অবশ্য রাইন ছিল লুই নেপোলিয়নের আওতার বাইরে; সে দিকে যেকোনো প্রয়াসেরই ফল হত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক ইউরোপীয় কোয়ালিশন। অন্য দিকে, পশ্চিম ইউরোপে বৈপ্লবিক কালপর্বের সুযোগ নিয়ে যে-রাশিয়া নিঃশব্দে ডানিউব তীরবর্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে দখল করে নিয়েছিল এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে এক নতুন দখলদারি-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, প্রায় সমস্ত ইউরোপের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে ফ্রান্সের মর্যাদা বাড়াবার এবং সেনাবাহিনীর নতুন গৌরব লাভের একটা সুযোগ ছিল। ব্রিটেন ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীজোটে যোগ দিল, অস্ট্রিয়া উভয়ের জন্যই শুভেচ্ছা দেখাল, একমাত্র বীর প্রাশিয়াই চুম্বন করল রুশ শাসনদণ্ডকে, যে-দণ্ড তাকে কিছুকাল আগেই শাস্তি দিয়েছে; এবং সে রুশীয়দের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলল। কিন্তু ব্রিটেন বা ফ্রান্স কেউই শত্রুর গুরুতর পরাজয় চায় নি, তাই যুদ্ধ শেষ হল

রাশিয়ার পক্ষে সামান্য কিছুটা অবমাননা এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এক রুশ-ফ্রান্স মৈত্রীর মধ্যে*।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ফ্রান্সকে করে তুলল ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় শক্তি এবং

---

* ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১২) ছিল এক বিশাল, অতুলনীয় ভ্রান্তিবিলাস, সেখানে প্রত্যেক নতুন দৃশ্যে ভাবতে হত: এবারে কে প্রতারিত হবে? কিন্তু সেই ভ্রান্তিবিলাসের মূল্য দিতে হয়েছিল অপরিমেয় সম্পদ আর দশ লক্ষাধিক মানুষের জীবন দিয়ে। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রিয়া ডানিউব তীরবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি আক্রমণ করল; রুশীয়রা তাদের সামনে পশ্চাদপসরণ করল। এর ফলে, অস্ট্রিয়া যতদিন নিরপেক্ষ থাকছে ততদিন রাশিয়ার সীমান্তে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অসম্ভব হয়ে পড়ল। তবে, অস্ট্রিয়া এই সীমান্তে যুদ্ধে একজন মিত্র হতে ইচ্ছুক ছিল এই শর্তে যে পোল্যান্ড পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত দীর্ঘকালের জন্য ঠেলে পিছনে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সর্ববিধ গুরুত্বসহকারে এই যুদ্ধ চালাতে হবে। এতে টেনে আনা যেত প্রাশিয়াকেও, যার মারফৎ রাশিয়া তখনও তার আমদানি-সামগ্রী পাচ্ছিল। রাশিয়া তাহলে স্থলপথে ও জলপথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত এবং অচিরেই পরাস্ত হত। কিন্তু মিত্রপক্ষের পরিকল্পনায় তা প্রবেশ করে নি। বরং তারা গুরুতর যুদ্ধের বিপদ এড়াতে পেরে আনন্দিতই হয়েছিল। পামারস্টোন সামরিক-তৎপরতা ক্রিমিয়ায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন — রাশিয়া এটাই চাইছিল — এবং লুই নেপোলিয়ন তাতে সানন্দে রাজী হলেন। এখানে যুদ্ধটা একমাত্র সাজানো-যুদ্ধই হতে পারত, তাই প্রধান অংশগ্রহণকারীরা সবাই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু জার নিকোলাইয়ের মাথায় গুরুতর যুদ্ধ চালাবার বুদ্ধি ঢুকল এবং সেই সঙ্গে তিনি একথাও ভুলে গেলেন যে সাজানো-যুদ্ধের পক্ষে সে দেশ অনুকূল, কিন্তু গুরুতর যুদ্ধের পক্ষে প্রতিকূল। আত্মরক্ষায় রাশিয়ার যেটা শক্তি — তার ভূখণ্ডের বিপুল বিস্তৃতি, বিরল জনবসতি, পথঘাটের অভাব এবং আনুষঙ্গিক সম্পদের অভাব — সেটাই কোনো রুশ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ হলে রাশিয়ারই বিরুদ্ধে চলে যায় আর তা ক্রিমিয়ার দিকে যতটা বেশি ততটা আর কোথাও নয়। দক্ষিণ রাশিয়ার যে স্তেপভূমি হানাদারদের কবরস্থান হওয়া উচিত ছিল, তা পরিণত হল রুশ সেনাবাহিনীরই কবরস্থানে, নির্মম ও জান্তব মূর্খতায় নিকোলাই একটির পর একটি বাহিনী — সব শেষে শীতকালের মাঝামাঝি সময়ে — পাঠিয়েছিলেন সেভাস্তোপোলে। তাড়াহুড়ো করে সংগ্রহ করা, এলোমেলোভাবে অস্ত্রসজ্জিত এবং আহার্যাদির অব্যবস্থাযুক্ত শেষ বাহিনীর কার্যকর অংশের দুই-তৃতীয়াংশ যখন ধ্বংস হল (তুষার ঝড়ে গোটা এককেটি ব্যাটেলিয়ন ধ্বংস হয়েছিল) এবং বাকিরা যখন শত্রুকে রুশ জমি থেকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হল তখন উদ্ধত, নির্বোধ নিকোলাই শোচনীয়ভাবে ভেঙে পড়ে বিষপান করলেন। তারপর থেকে যুদ্ধটা আবার সাজানো-যুদ্ধ হয়ে উঠল এবং অচিরেই শান্তি স্থাপিত হল।

হঠকারী লুই নেপোলিয়ন হলেন তখনকার মহত্তম ব্যক্তি; অবশ্য সত্যি কথা বলতে কি, এতে খুব একটা বেশি কিছু বোঝায় না। যাই হোক, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের কোনো ভূখণ্ডগত সম্প্রসারণ ঘটে নি, তাই তার মধ্যে নিহিত ছিল নতুন যুদ্ধের বীজ; এই নতুন যুদ্ধেই লুই নেপোলিয়ন তাঁর প্রকৃত ব্রত, 'সাম্রাজ্য-বর্ধকের' ব্রত উদ্‌যাপন করবেন। এই নতুন যুদ্ধের মতলব আঁটা হয়েছিল প্রথম যুদ্ধ চলার সময়েই, কারণ সার্দিনিয়াকে পশ্চিমী শক্তিগুলির মৈত্রীজোটে যোগ দিতে দেওয়া হয়েছিল রাজতান্ত্রিক ফ্রান্সের তাঁবেদার হিসেবে এবং বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তার ঘাঁটি হিসেবে; এই যুদ্ধের আরও প্রস্তুতি করা হয়েছিল রাশিয়ার সঙ্গে লুই নেপোলিয়নের শান্তি সম্পাদনের সময়ে (১৩), অস্ট্রিয়াকে শাস্তি দেওয়ার চাইতে বেশি কিছু যার কাম্য ছিল না।

লুই নেপোলিয়ন এখন ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উপাস্য হয়ে উঠলেন। শুধু এই কারণে নয় যে ২ ডিসেম্বর, ১৮৫১ তারিখে (১৪) তিনি 'সমাজকে রক্ষা' করেছিলেন, কিন্তু তার দ্বারা বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসনকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন শুধু তার সামাজিক শাসন রক্ষা করার জন্য। শুধু এই জন্য নয় যে তিনি দেখিয়েছিলেন, অনুকূল অবস্থায় সর্বজনীন ভোটাধিকারকে পরিবর্তিত করে জনসাধারণের নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত করা যায়। শুধু এই কারণে নয় যে তাঁর শাসনে শিল্প ও বাণিজ্য এবং বিশেষ করে ফাটকাবাজী ও শেয়ার-বাজারের কলকৌশলের অভূতপূর্ব বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। বরং, প্রথমত ও প্রধানত, এই কারণে যে বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিল প্রথম 'মহান রাষ্ট্রনীতিককে', যিনি তাদের আত্মার আত্মীয়। তিনি ছিলেন প্রত্যেক খাঁটি বুর্জোয়ার মতো ভুঁইফোড়। 'সমস্ত ঝঞ্ঝা-ঝড় বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন', ইতালিতে তিনি ছিলেন একজন কারবোনারি-পন্থী ষড়যন্ত্রকারী, সুইজারল্যান্ডে গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার, ইংলন্ডে ঋণভার-জর্জরিত বিশিষ্ট পরিশীলিত ভবঘুরে ও বিশেষ কনস্টেবল (১৫), তা সত্ত্বেও সর্বদা সর্বত্র তিনি ছিলেন সিংহাসনের দাবিদার; তাঁর হঠকারিতাপূর্ণ অতীত আর সমস্ত দেশে নৈতিক কলঙ্ক নিয়ে তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন ফরাসীদের সম্রাটের ভূমিকা এবং ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তার ভূমিকার জন্য, ঠিক যেমন

দৃষ্টান্তস্থানীয় বুর্জোয়া, একজন মার্কিন কোটিপতির ভূমিকার জন্য নিজেকে তৈরি করে একের পর এক প্রকৃত ও জাল দেউলিয়া অবস্থা দিয়ে। সম্রাট হিসেবে তিনি রাজনীতিকে শুধু পুঁজিবাদী মুনাফা এবং শেয়ার-বাজারের কলকৌশলের স্বার্থেরই সেবায় লাগান নি, পুরোপুরি শেয়ার-বাজারের নিয়ম অনুযায়ী রাজনীতিও অনুসরণ করেছেন এবং 'জাতিসংক্রান্ত নীতি' নিয়ে ফাটকাবাজী করেছেন (১৬)। ফ্রান্সের পুরনো নীতিতে জার্মানি ও ইতালির বিভাজন ছিল ফ্রান্সের অলঙ্ঘ্য মৌলিক অধিকার; লুই নেপোলিয়ন অনতিবিলম্বেই সেই মৌলিক অধিকার একটু-একটু করে বিনিময় করতে শুরু করলেন তথাকথিত ক্ষতিপূরণের জন্য। ইতালি ও জার্মানিকে তাদের বিভাজন দূর করার জন্য সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন এই শর্তে যে জার্মানি ও ইতালিকে জাতীয় ঐক্যের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তাঁকে দাম দিতে হবে জমি ছেড়ে দিয়ে। এর ফলে শুধু যে ফরাসী জাত্যভিমানই তৃপ্ত হয়েছে, ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্য ১৮০১ সালের সীমান্ত (১৭) পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে তাই নয়, অধিকন্তু ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দিয়েছে আলোকপ্রাপ্ত শক্তি ও জাতিসমূহের মুক্তিদাতার অনন্য ভূমিকা এবং লুই নেপোলিয়নকে দিয়েছে নিপীড়িত জাতি-অধিজাতিগুলির রক্ষকের ভূমিকা। আর জাতীয় ধ্যানধারণার জন্য উৎসাহী গোটা আলোকপ্রাপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণী — কারণ পৃথিবীর বাজারে ব্যবসার পথে সমস্ত বাধা দূরীকরণে তারা একান্তই আগ্রহী ছিল — এই বিশ্বমুক্তিদায়ক জ্ঞানালোকের দরুন সর্ববাদীসম্মতভাবে উল্লসিত হয়ে উঠল।

সূত্রপাত হয়েছিল ইতালিতে।* অস্ট্রিয়া সেখানে অবিভক্তভাবে শাসন চালিয়েছিল ১৮৪৯ সাল থেকে, আর অস্ট্রিয়া তখন ছিল সারা ইউরোপের বলির পাঁঠা। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অকিঞ্চিৎকর ফলাফলের দায়, যারা শুধুই একটা সাজানো-যুদ্ধ চেয়েছিল সেই পশ্চিমী শক্তিগুলির দ্বিধার উপরে চাপানো হল না, হল অস্ট্রিয়ার অস্থিরসংকল্প মনোভাবের উপরে, যার জন্য খোদ পশ্চিমী দেশগুলির চাইতে আর কেউ বেশি দায়ী ছিল না। ১৮৪৯

* এখানে পৃষ্ঠার পাশে এঙ্গেলস পেনসিলে 'অরসিনি' কথাটি লিখেছিলেন। — সম্পাঃ

সালে হাঙ্গেরিতে রাশিয়ার সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, প্রূত-এ অস্ট্রিয়ানদের অগ্রগতি রাশিয়াকে এতই ক্ষুব্ধ করেছিল (যদিও সেই অগ্রগতিই রাশিয়াকে বাঁচিয়েছিল) যে অস্ট্রিয়ার উপরে প্রতিটি আক্রমণ সে সহর্ষে অবলোকন করেছে। প্রাশিয়াকে আর গ্রাহ্য করার দরকার ছিল না, প্যারিস সম্মেলনেই (১৮) তার প্রতি en canaille* আচরণ করা হয়েছিল। এইভাবে, 'আদ্রিয়াতিক পর্যন্ত' ইতালির মুক্তির জন্য যুদ্ধের ফন্দি আঁটা হয়েছিল রাশিয়ার অংশগ্রহণে, চালানো হয়েছিল ১৮৫৯-এর বসন্তকালে এবং শেষ হয়েছিল গ্রীষ্মকালে মিনচিও নদীর তীরে। অস্ট্রিয়া ইতালি থেকে বিতাড়িত হল না, ইতালি 'আদ্রিয়াতিক পর্যন্ত মুক্ত' হল না এবং ঐক্যবদ্ধ হল না, সার্দিনিয়া তার এলাকা প্রসারিত করল, কিন্তু ফ্রান্স লাভ করল স্যাভয় ও নীস্ এবং এইভাবে ইতালির সঙ্গে তার ১৮০১ সালের সীমান্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল (১৯)।

কিন্তু ইতালীয়রা এই অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল না। সেই সময়ে ইতালিতে হস্তশিল্প কারখানারই প্রাধান্য ছিল, বৃহদায়তন শিল্প তখনও শৈশবাবস্থায়। শ্রমিক শ্রেণী তখনও পুরোপুরি দখলচ্যুত ও প্রলেতারীয় হয় নি। শহরে তখনও তার নিজস্ব উৎপাদনের উপায় ছিল, গ্রামাঞ্চলে শিল্প-শ্রম ছিল ছোট ছোট কৃষক-মালিক কিংবা প্রজাদের আনুষঙ্গিক পেশা। সুতরাং বুর্জোয়াদের কর্মোৎসাহ তখনও পর্যন্ত আধুনিক এক শ্রেণীসচেতন প্রলেতারিয়েত-বিরোধিতায় খণ্ডিত হয় নি। এবং যেহেতু ইতালির বিভাজন সেখানে অস্ট্রীয়দের বৈদেশিক শাসনের ফলেই রক্ষিত হয়েছিল এবং তাদেরই আশ্রয়ে রাজন্যরা তাদের কুশাসন চরমে নিয়ে গিয়েছিল, সেই হেতু সম্ভ্রান্ত বৃহৎ ভূস্বামীরা এবং শহরের সাধারণ মানুষ জাতীয় স্বাধীনতার প্রবক্তা হিসেবে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করল। যাই হোক, ১৮৫৯ সালে ভেনিস ছাড়া বিদেশী শাসন সর্বত্র বিদূরিত হল; ফ্রান্স ও রাশিয়া ইতালিতে অস্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ হস্তক্ষেপ অসম্ভব করে তুলল, এবং তার ভয়ে কেউই আর ভীত থাকল না। গ্যারিবল্ডির মধ্যে ইতালি পেল পুরাকালের মর্যাদাসম্পন্ন এক বীরকে, যিনি অসাধ্যসাধনে সক্ষম এবং প্রকৃতপক্ষে তা করেওছিলেন। এক

---

* ইতরজন সুলভ। — সম্পাঃ

হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে তিনি সমগ্র নেপ্‌ল্‌স রাজ্য উচ্ছেদ করেন, বস্তুতপক্ষে ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং বোনাপার্টীয় রাজনীতির নিপুণ ঊর্ণা ছিন্নভিন্ন করে দেন। ইতালি মুক্ত এবং সারগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়— যদিও লুই নেপোলিয়নের কূটকৌশলে নয়, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

ইতালির যুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের (২০) বৈদেশিক নীতি কারও কাছে আর গোপন থাকল না। মহান নেপোলিয়নের বিজেতাদের শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু l'un après l'autre—একের পর এক। রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া তাদের প্রাপ্য পেয়ে গেছে, এর পরে প্রাশিয়ার পালা। আর প্রাশিয়ার প্রতি ঘৃণা ছিল আগেকার চাইতে অনেক বেশি; ইতালীয় যুদ্ধের সময় তার নীতি ছিল কাপুরুষসুলভ ও জঘন্য, ১৭৯৫ সালে বাসেল শান্তির (২১) সময়কার মতোই। সে তার 'খোলা-হাত নীতি' (২২) নিয়ে এমন জায়গায় গিয়ে পেঁছেছিল যেখানে সে ইউরোপে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন, এবং তার ছোট-বড় প্রতিবেশীরা তাকে কিমার মতো টুকরো-টুকরো করে কাটার দৃশ্য দেখার জন্য সানন্দে অপেক্ষা করে ছিল; তার হাত খোলা ছিল একটা জিনিস করার জন্যই—রাইন নদীর বাম তট ফ্রান্সকে ছেড়ে দেওয়া।

বস্তুতপক্ষে, ১৮৫৯ সালের অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলিতে সর্বত্র— এবং রাইন অঞ্চলের চাইতে বেশি আর কোথাও নয়—এই দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে উঠছিল যে বাম তট ফ্রান্সের হাতে চলে যাবে, তা আর পুনরুদ্ধার করা যাবে না। তা যে বিশেষভাবে কাম্য ছিল তা নয়, কিন্তু গণ্য করা হত নিয়তির লিখন হিসেবে, এবং সত্যি বলতে কি, তার জন্য বিশেষ শঙ্কাও ছিল না। ফরাসী আমলে সত্যিই স্বাধীনতা এসেছিল; সেই আমলের পুরনো স্মৃতি জাগ্রত হল কৃষক ও শহুরে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে; বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে অর্থপতি অভিজাততন্ত্র, বিশেষ করে কলোনে, গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়ল প্যারিসের Crédit Mobilier (২৩) এবং অন্যান্য বোনাপার্টপন্থী জুয়াচোর কোম্পানিগুলির চক্রান্তে; তারা উচ্চ কণ্ঠে রাজ্যাধিকার দাবি করতে লাগল।*

---

* মার্কস ও আমি ঘটনাস্থলে বারবার দেখেছি, রাইন অঞ্চলে সত্যিই এটা ছিল সাধারণ মনোভাব। বাম তটের শিল্পপতিরা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ফরাসী শুল্ক-হারে তাদের শিল্পের অবস্থা কেমন হবে।

কিন্তু, রাইন নদীর বাম তট হাতছাড়া হলে শুধু প্রাশিয়াই নয়, জার্মানিও দুর্বল হত। আর জার্মানি আগেকার যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি বিভক্ত ছিল। ইতালীয় যুদ্ধে প্রাশিয়ার নিরপেক্ষতার দরুন অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ অনেক বেড়ে গিয়েছিল; ক্ষুদ্র নৃপতিকুল এক নবরূপ-প্রাপ্ত রেনিশ কনফেডারেশনের (২৪) রক্ষক হিসেবে লুই নেপোলিয়নের দিকে তাকিয়ে ছিল আধেক শঙ্কা, আধেক আশার দৃষ্টি নিয়ে—এই ছিল সরকারী জার্মানির অবস্থা। এবং তাও এমন সময়ে যখন একমাত্র সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ শক্তিই অঙ্গচ্ছেদের বিপদ এড়াতে সক্ষম ছিল।

কিন্তু সমগ্র জাতির শক্তি ঐক্যবদ্ধ করা হবে কী করে? ১৮৪৮ সালের প্রচেষ্টা—তার প্রায় সবই ছিল অস্পষ্ট—ব্যর্থ হওয়ার পর এবং ঠিক সেই কারণেই কিছুটা অস্পষ্টতা কেটে যাবার পর খোলা ছিল মাত্র তিনটি পথ।

প্রথমটি ছিল, আলাদা আলাদা সমস্ত রাজ্যের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে প্রকৃত একীকরণের পথ, অর্থাৎ খোলাখুলি বিপ্লবী পথ। ইতালি এই পথেই সদ্য তার লক্ষ্যে পৌঁছেছে; স্যাভয় রাজবংশ বিপ্লবে যোগ দিয়ে ইতালির রাজমুকুট লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের জার্মান স্যাভয়রা—হয়েনৎসলার্নরা, এমন কি তাঁদের বিসমার্কীয় ভঙ্গির দুঃসাহসিকতম কাভুররাও এরূপ সাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণে একান্তই অক্ষম ছিলেন। জনগণকে নিজেদেরই সব কিছু করতে হত—এবং রাইনের বাম তট নিয়ে যুদ্ধ হলে তারা প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারত। রাইন ছাড়িয়ে প্রুশীয়দের অনিবার্য পশ্চাদপসরণ, রাইন নদীতীরে দুর্গগুলির দীর্ঘ অবরোধ, এবং নিঃসন্দেহে যা দেখা দিত, সেই দক্ষিণ জার্মানির নৃপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা একটি জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট হত, যে আন্দোলন সমগ্র রাজবংশীয় প্রথাকে বিদূরিত করতে পারত। সে ক্ষেত্রে, লুই নেপোলিয়নই সর্বপ্রথম তাঁর তরবারি কোষবদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য শুধু প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই বিরোধীদের দেখতে পেত, তাদের ব্যাপারে সে ফরাসী বিপ্লবের ধারাবাহী, জাতিসমূহের মুক্তিদাতার ভঙ্গিতে দাঁড়াতে পারত। বিপ্লব সম্পাদনকারী একটি জাতির বিরুদ্ধে তার কোনো ক্ষমতা থাকত না; বস্তুতপক্ষে, বিজয়ী জার্মান বিপ্লব সমগ্র ফরাসী সাম্রাজ্যের উচ্ছেদের প্রেরণা যোগাতে পারত। তা হত সবচেয়ে

ভালো ব্যাপার; সবচেয়ে খারাপ হত, নৃপতিরা যদি আন্দোলনকে করায়ত্ত করতে পারত, তাহলে রাইনের বাম তীর সাময়িকভাবে ফ্রান্সের হাতে চলে যেত, কিন্তু নৃপতিদের সক্রিয় বা অক্রিয় বিশ্বাসঘাতকতা প্রকট হয়ে পড়ত সারা পৃথিবীর কাছে এবং তা এমন এক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করত যেখানে বিপ্লবের পথ ছাড়া, সমস্ত নৃপতির উচ্ছেদ ও ঐক্যবদ্ধ এক জার্মান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ ছাড়া জার্মানির আর কোনো পথ থাকত না।

ঘটনাক্রমে, জার্মানির একীকরণের এই পথ নেওয়া যেত একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, লুই নেপোলিয়ন যদি রাইন সীমান্তে যুদ্ধ শুরু করতেন। কিন্তু এই যুদ্ধ হয় নি, তার কারণ আমরা শীঘ্রই ব্যাখ্যা করব। ফলে জাতীয় একীকরণের প্রশ্নটিও আর একান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকল না, এই প্রশ্ন অবিলম্বে মীমাংসা করা যেত ধ্বংসের বিনিময়ে। আপাতত, জাতি অপেক্ষা করতে পারে।

দ্বিতীয় পথটি ছিল অস্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে একীকরণের পথ। ১৮১৫ সালে অস্ট্রিয়া সুবিন্যস্ত, সুসংলগ্ন ভূখন্ডবিশিষ্ট একটি রাষ্ট্রের অবস্থা ইচ্ছুকভাবেই বজায় রেখেছিল, নেপোলিয়নের যুদ্ধ এই ভূখন্ড তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছিল। তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ জার্মানিতে তার প্রাক্তন অধিকৃত-অঞ্চলগুলির উপরে সে দাবি জানায় নি। রাজতন্ত্রের তখনও পর্যন্ত বিদ্যমান মূল অংশের সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে ও রণনৈতিক দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরনো ও নতুন এলাকা দখল করেই সে সন্তুষ্ট ছিল। দ্বিতীয় জোসেফের রক্ষণমূলক শুল্ক দিয়ে যার শুরু, ইতালিতে প্রথম ফ্রানজ্ পুলিসি শাসনে যার বৃদ্ধি ঘটে এবং জার্মান সাম্রাজ্যের ভাঙন ও রেনিশ কনফেডারেশন গঠনের দরুন যা চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয়—জার্মানির বাকি অংশ থেকে জার্মান অস্ট্রিয়ার সেই পৃথকীকরণ বস্তুতপক্ষে ১৮১৫ সালের পর চলতে থাকে। মেটেরনিখ তাঁর রাষ্ট্র ও জার্মানির মধ্যে রীতিমতো এক চীনের প্রাচীর গড়ে তোলেন। শুল্কমাসুল আটকে রাখে জার্মানির বৈষয়িক সামগ্রীকে, সেন্সর প্রথা আটকে রাখে আত্মিক সামগ্রীকে, অবিশ্বাস্যতম পাসপোর্ট-সংক্রান্ত নিয়মকানুন ব্যক্তিগত যোগাযোগকে ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনে। এমন কি জার্মানিতেও যা অনন্যসাধারণ, এমন এক সার্বভৌমপন্থী নিষ্ঠুর শাসনের হাতে দেশ আভ্যন্তরিকভাবে যেকোনো, এমন কি মৃদুতম, রাজনৈতিক

আন্দোলন থেকে সুরক্ষিত ছিল। এইভাবে, জার্মানির সমগ্র বুর্জোয়া-উদারপন্থী আন্দোলন থেকে অস্ট্রিয়া পুরোপুরি সংস্রবহীন হয়ে ছিল। ১৮৪৮ সাল নাগাদ আত্মিক বাধা, অন্তত অনেকখানি পরিমাণে, ছিন্ন হয়েছিল, কিন্তু সেই বছরের ঘটনাবলী ও তার ফলাফল অস্ট্রিয়াকে জার্মানির বাকি অংশের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে নি। বরং, অস্ট্রিয়া এক বৃহৎ শক্তি হিসেবে তার স্বাধীন অবস্থানের উপরে আরও বেশি জোর দিতে লাগল। তার ফলে এই ঘটল যে জার্মান কনফেডারেশনের দুর্গগুলিতে (২৫) অস্ট্রীয় সৈনিকদের সবাই পছন্দ করলেও এবং প্রুশীয়দের ঘৃণা ও উপহাস করলেও, এবং ক্যাথলিক-প্রধান দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের সর্বত্র অস্ট্রিয়া তখনও জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় থাকলেও অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্বে জার্মানির একীকরণের কথা কেউই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করত না, হয়তো ছোট ও মাঝারি জার্মান রাষ্ট্রগুলির সামান্য কয়েকজন ডিউক ছাড়া।

এর অন্যথা হওয়ার উপায় ছিল না। অস্ট্রিয়া নিজেই এর অন্যরকম কিছু চায় নি, যদিও সে সংগোপনে একটা সাম্রাজ্যের রোমাণ্টিক স্বপ্ন পোষণ করে চলছিল। কালক্রমে অস্ট্রিয়ার শুল্ক-সংক্রান্ত বেড়াই জার্মানির ভিতরে একমাত্র বৈষয়িক বিভাজন-রেখা হয়ে উঠেছিল, তাই তা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। স্বাধীন বৃহৎ শক্তিসুলভ নীতির কোনো অর্থই হয় না যদি তার দ্বারা বিশেষ করে অস্ট্রীয়, অর্থাৎ ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় প্রভৃতি স্বার্থের কাছে জার্মান স্বার্থের বলিদানই না-বোঝায়। বিপ্লবের আগেকার মতো, পরেও অস্ট্রিয়া থাকল জার্মানিতে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র, আধুনিক প্রবণতা অনুসরণে সবচেয়ে অনিচ্ছুক, এবং তাছাড়া একমাত্র অবশিষ্ট বিশেষভাবে ক্যাথলিক বৃহৎ শক্তি। মার্চ-পরবর্তী সরকার (২৬) যতই যাজক ও জেশুইটদের পুরনো ব্যবস্থাপনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগল, জনসমষ্টির এক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ যেখানে প্রটেস্ট্যাণ্ট সেই দেশের উপরে তার একাধিপত্য ততই অসম্ভব হয়ে উঠল। আর, সব শেষে, অস্ট্রিয়ার অধীনে জার্মানির একীকরণের পূর্বশর্ত ছিল প্রাশিয়াকে চূর্ণ করা। যদিও এমনিতে জার্মানির পক্ষে এই ঘটনা কোনো বিপর্যয়স্বরূপ হত না, তাহলেও অস্ট্রিয়ার হাতে প্রাশিয়ার চূর্ণ হওয়া, রাশিয়ার বিপ্লবের সমাসন্ন বিজয়ের আগে প্রাশিয়ার হাতে অস্ট্রিয়ার চূর্ণ হওয়ার মতোই সমান

ক্ষতিকর হত (তার পরে তা নিরর্থক হয়ে উঠত, কারণ তখন সেই নিষ্প্রয়োজনীয় অস্ট্রিয়া নিজেই ভেঙে পড়ত)।

সংক্ষেপে, অস্ট্রিয়ার পক্ষপুটে জার্মান ঐক্য ছিল রোমাণ্টিক স্বপ্ন এবং ছোট ও মাঝারি রাষ্ট্রগুলির জার্মান নৃপতিরা ১৮৬৩ সালে যখন অস্ট্রিয়ার ফ্রানজ্ জোসেফকে জার্মানির সম্রাট রূপে ঘোষণা করার জন্য ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইন-এ সমবেত হলেন, তখন প্রমাণিত হল তা স্বপ্নই। প্রাশিয়ার রাজা* হাজিরই হলেন না, আর সম্রাট তৈরির মিলনান্ত নাটকটি ব্যর্থ হয়ে গেল।

বাকি ছিল তৃতীয় পথটি: প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে একীকরণ। আর যেহেতু প্রকৃতপক্ষে এই পথই নেওয়া হয়েছিল, সেই হেতু মানসিক জল্পনা-কল্পনার ক্ষেত্র থেকে আমরা ব্যবহারিক 'রিয়্যাল পলিটিক'-এর (২৭) দৃঢ়তর, এমন কি রীতিমত নোংরা জমিতে আসতে পারি।

দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের সময় থেকে প্রাশিয়া জার্মানিকে এবং পোল্যান্ডকেও গণ্য করত দখল করার অঞ্চল বলে, সেখান থেকে যতটা পাওয়া যায় নিয়ে নিলেই হল, তবে অবশ্য এই কথা জেনে যে অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হবে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে, বিশেষ করে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানিকে ভাগাভাগি করে নেওয়া ১৭৪০ সাল থেকেই প্রাশিয়ার 'জার্মান ব্রত' ছিল। 'Je vais, je crois, jouer votre jeu; si les as me viennent, nous partagerons' (আমার মনে হয়, আপনাদের খেলা আমি খেলব; আমি যদি টেক্কাগুলো পাই, আমরা তাহলে সেগুলো ভাগাভাগি করে নেব)—প্রথম যুদ্ধে যাওয়ার সময় (২৮) ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছে এই ছিল ফ্রিডরিখের বিদায়কালীন উক্তি। এই 'জার্মান ব্রত' অনুযায়ী, বাসেল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময়ে, ১৭৯৫ সালে জার্মানির প্রতি প্রাশিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করল, ভূখণ্ড বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ফ্রান্সকে রাইনের বাম তীর ছেড়ে দিতে অগ্রিম সম্মত হল (৫ অগস্ট, ১৭৯৬-এর চুক্তিতে), এবং বাস্তবিকই রাশিয়া ও ফ্রান্সের নির্দেশে সাম্রাজ্যিক প্রতিনিধি সভার এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার দেশদ্রোহিতার পুরস্কার সংগ্রহ করল। ১৮০৫ সালে নেপোলিয়ন

* প্রথম ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

যখন তার সামনে হানোভারকে টোপ হিসেবে আবার তুলে ধরলেন, সে তার মিত্র রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল — এই টোপ সে সব সময়েই গিলতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু নিজের মূঢ় কৌশলে সে এমনভাবে জড়িয়ে গেল যে তাকে বস্তুতই নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হল এবং ইয়েনায় তার প্রাপ্য উপযুক্ত শাস্তি পেল (২৯)। এই আঘাতের কথা মনে রেখে, ১৮১৩ ও ১৮১৪ সালের বিজয়ের পরেও তৃতীয় ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম সমস্ত পশ্চিম জার্মান ঘাঁটি ছেড়ে দিতে, উত্তর-পূর্ব জার্মানি দখলের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে এবং অস্ট্রিয়ার মতো, জার্মানি থেকে যতখানি সম্ভব সরে আসতে ইচ্ছুক ছিলেন — তাতে সমগ্র পশ্চিম জার্মানি রুশ অথবা ফরাসী অভিভাবকত্বে এক নতুন রেনিশ কনফেডারেশনে রূপান্তরিত হত। পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হল: ওয়েস্টফালিয়া ও রেনিশ প্রদেশকে রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হল এবং সেগুলির সঙ্গে চাপানো হল এক নতুন 'জার্মান ব্রত'ও।

আপাতত, জমি দখলের পালা শেষ হল — ছোট ছোট জমির টুকরো কেনা ছাড়া। স্বদেশে পুরনো আমলাতান্ত্রিক যুঙ্কার প্রথার ক্রমে ক্রমে আবার বাড়বাড়ন্ত হতে শুরু করল; অতি দুঃসময়ে জনগণকে দেওয়া সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি নিয়তই ভাঙা হতে থাকল। তবু, এসব সত্ত্বেও, বুর্জোয়া শ্রেণীর উদয় আরও বেশি করে ঘটছিল প্রাশিয়াতেও, কারণ শিল্প ও বাণিজ্য ছাড়া গর্বিত প্রুশীয় রাষ্ট্রও এখন কিছুই নয়। ধীরে ধীরে, অনিচ্ছা সহকারে, হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় বুর্জোয়া শ্রেণীকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দিতেই হচ্ছিল। এক দিক দিয়ে, এই সব সুবিধাদান প্রাশিয়ার 'জার্মান ব্রতের' প্রতি সমর্থনের সম্ভাবনা তুলে ধরল: কারণ প্রাশিয়া তার দুটি অংশের মধ্যে বৈদেশিক শুল্কের বেড়া অপসারিত করার জন্য প্রতিবেশী জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে একটি শুল্ক ইউনিয়ন গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাল। এইভাবে সৃষ্টি হল শুল্ক ইউনিয়ন, ১৮৩০ সাল পর্যন্ত সেটি ছিল নিতান্তই ব্যর্থ আশা (তাতে যোগ দিয়েছিল শুধু হেসেন-ডার্মস্টাট), কিন্তু পরে, কিছুটা দ্রুততর হারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবিকাশের ফলে তা অধিকাংশ অন্তঃ-জার্মান প্রদেশকে অর্থনৈতিকভাবে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করল। অ-

প্রুশীয় তটবর্তী অঞ্চলগুলি ১৮৪৮ সালের পরেও এই ইউনিয়নের বাইরে ছিল।

শুল্ক ইউনিয়ন প্রাশিয়ার পক্ষে বড় একটা সাফল্য। এর অর্থ যে অস্ট্রিয়ার প্রভাবের উপরে জয়লাভ, সেই ঘটনাটি তার সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রধান বিষয়টি এই যে মাঝারি ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীকে তা প্রাশিয়ার পক্ষে টেনে এনেছিল। স্যাক্সনি ছাড়া, এমন কোনো জার্মান রাষ্ট্র ছিল না যার শিল্প এমন কি প্রাশিয়ার কাছাকাছি যাওয়ার মতো মাত্রায় বিকাশলাভ করেছে, এবং তার কারণ শুধু প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক পূর্বশর্তগুলিই নয়, বরং তার বৃহত্তর শুল্ক অঞ্চল ও আভ্যন্তরিক বাজারও। শুল্ক ইউনিয়ন যত প্রসার লাভ করতে লাগল, এবং তা যত বেশি করে ছোট ছোট রাষ্ট্রকে এই আভ্যন্তরিক বাজারে টেনে আনতে লাগল, এই সমস্ত রাষ্ট্রের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী তত বেশি করে প্রাশিয়াকে তার অর্থনৈতিক এবং পরে রাজনৈতিক নেতা বলেও গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। আর অধ্যাপকবৃন্দ বুর্জোয়া শ্রেণীর গানের তালে নাচতে লাগলেন। বার্লিনে হেগেলপন্থীরা যে কথা দার্শনিক দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন— যথা, প্রাশিয়ার দায়িত্ব জার্মানির নেতৃপদ বরণ করা— সে কথাই হাইডেলবের্গে শ্লোসারের শিষ্যরা, বিশেষ করে হাউসার ও গারভিনাস ঐতিহাসিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন। এতে স্বভাবতই পূর্বানুমিত ছিল যে প্রাশিয়া তার সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে, বুর্জোয়া শ্রেণীর তাত্ত্বিকদের চাহিদা সে পূরণ করবে।*

এ সবই যে ঘটেছে, তার কারণ অবশ্য এই নয় যে প্রুশীয় রাষ্ট্রের প্রতি কোনো বিশেষ পক্ষপাত ছিল, যেমনটি ঘটেছিল ইতালীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বেলায়— পিয়েমোঁ প্রকাশ্যভাবে জাতীয় ও সাংবিধানিক আন্দোলনের নেতৃত্বে

---

* ১৮৪২ সালের *Rheinische Zeitung* (৩০) এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রাশিয়ার প্রভুত্বের প্রশ্নটি আলোচনা করেছিল। অস্টেন্ডে-তে সেই ১৮৪৩ সালের গ্রীষ্মকালেই গারভিনাস আমাকে বলেন: প্রাশিয়াকে জার্মানির নেতৃত্ব করতেই হবে, তবে এখানে তিনটি শর্ত পূর্বানুমিত: প্রাশিয়াকে অবশ্যই একটি সংবিধান দিতে হবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে এবং আরও সুনির্দিষ্ট বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে হবে।

নিজেকে স্থাপিত করার পর ইতালীয় বুর্জোয়া শ্রেণী পিয়েমোঁকে মেনে নিয়েছিল নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র বলে। এখানে কিন্তু তা করা হয়েছিল অনিচ্ছাভরে; বুর্জোয়া শ্রেণী প্রাশিয়াকে গ্রহণ করেছিল অপেক্ষাকৃত কম মন্দ হিসেবে, কারণ অস্ট্রিয়া তার বাজারে তাদের প্রবেশাধিকার দেয় নি, এবং কারণ অস্ট্রিয়ার তুলনায় প্রাশিয়ার তখনও কিছুটা বুর্জোয়া চরিত্র ছিল, সেটা যদি শুধু আর্থিক বিষয়ে তার নীচতা হয় তাও। অন্যান্য বৃহৎ শক্তির তুলনায় প্রাশিয়ার দুটি সুবিধা ছিল: সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে নিয়োগ এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা। চরম প্রয়োজনের সময়ে সে এগুলি প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুদিনে সেগুলি অবহেলাভরে বলবৎ করে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে তাকে অন্তঃসারশূন্য করে তুলেই তুষ্ট ছিল— কোনো কোনো অবস্থায় এই অন্তঃসারটি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সেগুলির অস্তিত্ব কাগজে থেকেই গিয়েছিল এবং কোনোদিন জনসাধারণের সুপ্ত ক্ষমতাকে এমন এক মাত্রায় অনাবৃত করা যাবে, যা সমানভাবে বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট অন্য কোনো জায়গায় অর্জন করা যাবে না—এমন এক সম্ভাবনা প্রাশিয়া পেয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণী এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিল: ১৮৪০ সাল নাগাদ এক বছরের বাধ্যতামূলক সৈনিকদের পক্ষে, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের ছেলেদের পক্ষে, জাতীয় সেবা থেকে নিজেদের মুক্তি ক্রয় করা সহজ এবং অপেক্ষাকৃত শস্তা ছিল, বিশেষ করে এই জন্য যে খোদ সেনাবাহিনীই বণিক ও শিল্পমহল থেকে আসা ল্যান্ডভের (৩১) অফিসারদের উপরে খুব একটা গুরুত্ব আরোপ করত না। বাধ্যতামূলক শিক্ষার ফলে প্রাশিয়ায় তখনও পর্যন্ত নিঃসন্দেহে কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যায় যে পাওয়া যেত, সেটা বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী ছিল; বৃহদায়তন শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তা এমন কি অপ্রতুল হয়ে উঠল।*

* 'কুলটুরকাম্‌ফ'-এর (৩২) আমলেও রাইন তীরবর্তী শিল্পপতিরা আমার কাছে অনুযোগ করেছে যে অন্য দিক দিয়ে চমৎকার শ্রমিকদের তারা সুপারভাইজারের পদে উন্নীত করতে পারছে না, কারণ তাদের স্কুলে লব্ধ জ্ঞান যথেষ্ট নয়। ক্যাথলিক অঞ্চলগুলিতে একথাটা বিশেষভাবেই সত্য ছিল।

দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরাট খরচ,* যার ফলে প্রচণ্ড করভার বৃদ্ধি হচ্ছিল, সে বিষয়ে অভিযোগ করত প্রধানত পেটি বুর্জোয়ারা; ঊর্ধ্বগামী বুর্জোয়ারা হিসাব করে দেখেছিল যে বৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত বিরক্তিকর অথচ অনিবার্য ব্যয় অধিকতর মুনাফা দিয়ে ভালোভাবেই পুষিয়ে যাবে।

সংক্ষেপে, প্রুশীয় সদাশয়তা সম্পর্কে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর কোনো মোহ ছিল না। ১৮৪০ সাল থেকে তাদের কাছে প্রুশীয় প্রাধান্যের ধারণা যদি প্রিয় হয়ে থাকে, তবে তা একমাত্র এই জন্য এবং সেই পরিমাণেই যে-পরিমাণে প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তার দ্রুততর অর্থনৈতিক বিকাশের দরুন জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল, একমাত্র এই জন্য ও সেই পরিমাণেই, যে-পরিমাণে পুরনো-সাংবিধানিক দক্ষিণাঞ্চলের রটেক ও ভেলকাররা প্রুশীয় উত্তরাঞ্চলের কাম্প্‌হাউজেন, হান্‌জেমান ও মিলডেদের দ্বারা ছায়াবৃত হয়ে গিয়েছিল, এবং আইনজীবী ও অধ্যাপকরা ছায়াবৃত হয়েছিল বণিক ও শিল্পোৎপাদকদের দ্বারা। বস্তুতপক্ষে, ১৮৪৮-এর ঠিক পূর্ববর্তী বছরগুলিতে প্রুশীয় উদারপন্থীদের মধ্যে, বিশেষ করে রাইন অঞ্চলে, এমন এক বিপ্লবী প্রবণতা গড়ে উঠেছিল, সারগতভাবে যা দক্ষিণ জার্মানির অঞ্চল-মণ্ডূক উদারপন্থীদের (৩৩) চাইতে আলাদা। সেই সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৬শ শতাব্দীর পরবর্তীকালের দুটি শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক লোকগীতি: একটি গান বুর্গেরমেস্টার ৎশেখ সম্পর্কে এবং অন্যটি — ব্যারনেস ফন ড্রোস্টে-ফিশারিং সম্পর্কে (৩৪), যাঁদের উচ্ছৃঙ্খলতা এখনকার বয়স্ক ব্যক্তিদের আতঙ্কিত করে তোলে; এঁরা ১৮৪৬ সালে হালকা মেজাজে গাইতেন:

আমাদের বেচারা বুর্গেরমেস্টার ৎশেখ
তার মতো দুর্ভাগা আর কে বলো,
দু-হাত থেকে গুলি করল ফ্যাটির গায়ে
তবুও হায়, বুলেট তার ফসকে গেল!

---

* পৃষ্ঠার পাশে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: 'বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য মাধ্যমিক স্কুল'। — সম্পাঃ

কিন্তু শীঘ্রই এ সবের পরিবর্তন ঘটতে চলেছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরেই এল ভিয়েনায় মার্চের দিনগুলি এবং ১৮ মার্চের বার্লিন বিপ্লব (৩৫)। বুর্জোয়া শ্রেণী জয়যুক্ত হল, গুরুতর কোনো লড়াই তাদের করতে হল না, এমন কি তারা গুরুতর লড়াই চায়ও নি। যে বুর্জোয়া শ্রেণী অল্প কিছুকাল আগেও সে-কালের সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নিয়ে মাতামাতি করেছিল (বিশেষ করে রাইন অঞ্চলে), তারা হঠাৎ লক্ষ করল যে তারা এক-একজন শ্রমিককে লালিত করে নি, করেছে এক শ্রমিক **শ্রেণীকে**—এখনও পর্যন্ত অর্ধ-স্বপ্নালু কিন্তু ক্রমে ক্রমে জাগরণোন্মুখ এবং, তার আন্তর চরিত্রের দরুন, এক বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে। এই প্রলেতারিয়েত সর্বত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য বিজয় এনে দিয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই, বিশেষ করে ফ্রান্সে, এমন সব দাবি উপস্থিত করছিল যা সমগ্র বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গেই বেমানান; প্যারিসে দুটি শ্রেণীর মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচণ্ড সংগ্রাম হয় ২৩ জুন ১৮৪৮ তারিখে, এবং চার দিনের লড়াইয়ের পর প্রলেতারিয়েত পরাস্ত হয় (৩৬)। তখন থেকে সারা ইউরোপে সাধারণ বুর্জোয়া শ্রেণী প্রতিক্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেছে এবং শ্রমিকদের সাহায্য নিয়ে যাদের তারা সবে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল সেই সার্বভৌমপন্থী আমলা, সামন্ত ও যাজকদের সঙ্গেই জোট বেঁধেছে 'সমাজের শত্রু', সেই শ্রমিকদেরই বিরুদ্ধে।

প্রাশিয়ায় তা যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা এই: বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেরাই যাদের নির্বাচিত করেছিল সেই প্রতিনিধিদের অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করল, এবং গোপন অথবা অভিব্যক্ত উল্লাসে নভেম্বর ১৮৪৮-এ সরকারের হাতে তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে দেখল (৩৭)। একথা সত্যি, যে য়ুঙ্কার-আমলাতান্ত্রিক মন্ত্রিসভা প্রাশিয়ায় গোটা একটি দশকের জন্য নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিল, তাকে সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ীই শাসন করতে হয়েছিল, কিন্তু এই মন্ত্রিসভা এমন কি প্রাশিয়াতেও অভূতপূর্ব ছোটখাট হয়রানি আর ব্যাঘাতসৃষ্টির একটা ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করল, এতে বুর্জোয়া শ্রেণীর চাইতে বেশি কষ্টভোগ আর কেউ করে নি। কিন্তু শেষোক্তরা অনুতাপভরে খোলসের মধ্যে ঢুকে গেল আর তাদের উপরে বর্ষিত লাথি-ঘুষি বিনম্রভাবে মাথা পেতে নিল তাদের পূর্বতন বিপ্লবী কর্মপ্রয়াসের শাস্তি হিসেবে, এবং ক্রমে ক্রমে ভাবতে শিখল ও

পরবর্তীকালে উচ্চকণ্ঠে তা ব্যক্তও করল: হ্যাঁ, ঠিকই, আমরা সত্যিই কুত্তা!

তারপরে এল অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাজপ্রতিনিধির কার্যকাল (রিজেন্সি)। সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রমাণের জন্য মানটুফেল আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, বর্তমান সম্রাটকে* গুপ্তচর দিয়ে ঘিরে ফেললেন, পুটকামের এখন *Sozialdemokrat* পত্রিকার (৩৮) সম্পাদকীয় দপ্তরকে ঠিক যেমনটি করছেন। আইনসম্মত উত্তরাধিকারী যখন অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাজপদে অধিষ্ঠিত (রিজেণ্ট) হন, মানটুফেল সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত হন, শুরু হয় 'নবযুগ' (৩৯)। কিন্তু এ ছিল শুধু দৃশ্য পরিবর্তন। যুবরাজ রিজেণ্ট প্রসন্ন হয়ে বুর্জোয়াদের আবার উদার হওয়ার অনুমতি দিলেন। বুর্জোয়া শ্রেণী সানন্দে এই অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করল, কিন্তু তারা ভেবেছিল পরিস্থিতি এখন পুরোপুরি তাদেরই আয়ত্তে এবং প্রুশীয় রাষ্ট্রকে তাদেরই সুরের সঙ্গে নাচতে হবে। বশংবদ ভৃত্যসুলভ ভাষায় যাদের 'কর্তৃত্বপূর্ণ মহল' বলা হত, তাদের সেটা আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। 'নবযুগের' জন্য উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীকে যে মূল্য দিতে হল, তা হল সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস। প্রকৃতপক্ষে, সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সেনাদলে যোগদান ১৮১৬ সাল নাগাদ যতখানি কার্যকর হত, সরকার শুধু ততটুকুরই রূপায়ণ দাবি করেছিল। উদারপন্থী বিরোধীপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে, এর বিরুদ্ধে একেবারেই এমন কিছু বলার ছিল না যা একই সঙ্গে প্রাশিয়ার কর্তৃত্ব ও তার জার্মান ব্রত সম্পর্কে তাদের নিজেদেরই কথার বিপরীত হত না। কিন্তু উদারপন্থী বিরোধীপক্ষ তাদের সম্মতির একটি শর্ত হিসেবে দাবি করল যে কার্যকালের মেয়াদ আইনত দুই বছরে সীমাবদ্ধ করা হোক। এমনিতে দাবিটা রীতিমতো যুক্তিসংগত; কিন্তু প্রশ্ন হল তা অর্জন করা যেত কি না, উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণী শেষ পর্যন্ত এই শর্তের উপরে জোর দিতে প্রস্তুত ছিল কি না, তাদের সম্পত্তি ও জীবন বিপন্ন করার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল কি না। সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর করার ব্যাপারে অটল হয়ে রইল, প্রতিনিধি সভা (চেম্বার) জোর দিল দু-বছরের উপরে, ফলে বিরোধ দেখা দিল (৪০)। আর সামরিক প্রশ্ন নিয়ে বিরোধ দেখা দেওয়ায় বৈদেশিক নীতি আরেকবার আভ্যন্তরিক নীতির পক্ষেও নিয়ামক হয়ে উঠল।

* প্রথম ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

আমরা দেখেছি প্রাশিয়া কিভাবে ক্রিমিয়া ও ইতালির যুদ্ধে তার অবস্থানের দরুন তার শেষ যেটুকু মর্যাদা তখনও পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল তাও খুইয়েছে। সেই শোচনীয় নীতির যাথার্থ্য আংশিকভাবে প্রমাণ করা যায় তার সেনাবাহিনীর দুরবস্থা দিয়ে। ১৮৪৮ সালের আগেও যেহেতু তালুকগুলির (এস্টেট) সম্মতি ব্যতিরেকে নতুন কর প্রবর্তন করা যায় নি অথবা নতুন ঋণ ছাড়া যায় নি, এবং যেহেতু কেউই এই উদ্দেশ্যে এস্টেটগুলিকে সমবেত করতে ইচ্ছুক ছিল না, সেই জন্য সেনাবাহিনীর জন্য কখনই যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যায় নি, এই সীমাহীন কার্পণ্যের ফলে সেনাবাহিনীর সর্বনাশ ঘটে। বাকিটা করে তৃতীয় ফ্রিডরিখ ভিলহেল্মের অধীনে বিদ্যমান কুচকাওয়াজ ও সামরিক অনুশীলনের মনোভাব। ১৮৪৮ সালে ডেনমার্কের রণক্ষেত্রগুলিতে এই কুচকাওয়াজি সেনাবাহিনী কী অসহায়তার পরিচয় দিয়েছিল তা কাউণ্ট ভাল্ডারসির লেখায় পড়া যায়। ১৮৫০ সালের সৈন্যসমাবেশ পরিপূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় (৪১): প্রত্যেক জিনিসের অভাব ছিল, যা পাওয়া যাচ্ছিল তাও ছিল অকেজো। একথা সত্যি, এ ব্যাপারে প্রতিনিধি সভার মঞ্জুরীকৃত অর্থ সাহায্য করেছিল, সেনাবাহিনী ধাক্কা খেয়ে সংকীর্ণ নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে এল, অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুচকাওয়াজকে স্থানান্তরিত করত রণক্ষেত্রের তৎপরতা। কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়ে সেনাবাহিনী ১৮২০ সাল নাগাদ যে-অবস্থায় ছিল, তখনও ছিল সেই অবস্থাতেই, পক্ষান্তরে অন্য সমস্ত বৃহৎ শক্তি, বিশেষ করে এখন যে প্রধান বিপদস্বরূপ, সেই ফ্রান্সও, তাদের সশস্ত্র সৈন্যবল অনেকখানি বাড়িয়েছিল। অথচ প্রাশিয়ায় ছিল সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সেনাদলে যোগদানের নিয়ম, কাগজে প্রত্যেক প্রুশীয় ব্যক্তিই একজন সৈনিক, কিন্তু জনসংখ্যা যেখানে ১ কোটি ৫ লক্ষ (১৮১৭) থেকে বেড়ে হয়েছিল ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫০ হাজার (১৮৫৮), সেখানে সেনাবাহিনীর কাঠামো সেনাদলে কাজ করার যোগ্য সমস্ত পুরুষের এক-তৃতীয়াংশের বেশির স্থান-সংকুলান ও প্রশিক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সরকার এখন ১৮১৭ সালের পর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রায় যথাযথভাবে মিলে যায় সেইভাবে সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির দাবি জানাল। কিন্তু সেই উদারপন্থী প্রতিনিধিরা যাঁরা ক্রমাগত দাবি জানিয়ে আসছিলেন এই বলে যে সরকার জার্মানির নেতৃত্ব গ্রহণ করুক,

বিদেশে তার রাজনৈতিক প্রভাব সুরক্ষিত করুক এবং জাতিসমূহের মধ্যে জার্মানির মর্যাদা পুনরুদ্ধার করুক—সেই একই ব্যক্তিরা দর-কষাকষি করতে লাগলেন এবং কার্যকালের দু-বছর মেয়াদের ভিত্তিতে ছাড়া কোনো কিছু মঞ্জুর করতে অস্বীকার করলেন। তাঁদের যে ইচ্ছার উপরে তাঁরা এত একগুঁয়েভাবে জোর দিচ্ছিলেন, তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা কি তাঁদের ছিল? জনগণ কিংবা অন্তত বুর্জোয়া শ্রেণী কি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থেকে তাঁদের সমর্থন করেছিল?

বরং তার উল্টো। বুর্জোয়া শ্রেণী বিসমার্কের সঙ্গে পরমোল্লাসে বাক্‌যুদ্ধ চালিয়ে গেল এবং প্রকৃতপক্ষে এমন এক আন্দোলন সংগঠিত করল না, অচেতনভাবে হলেও, বস্তুতপক্ষে প্রুশীয় প্রতিনিধি সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতির বিরুদ্ধে চালিত। হল্‌স্টাইন সংবিধানের উপরে ডেনমার্কের হস্তক্ষেপ এবং শ্লেজভিগকে বলপূর্বক ডেনমার্কীয় করার চেষ্টায় জার্মান বুর্জোয়া ক্ষুব্ধ হল। বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেতে সে অভ্যস্ত; কিন্তু ক্ষুদ্র ডেনমার্ক তাকে লাথি মেরে যাবে এতে তার ক্রোধের উদ্রেক হল। গঠিত হল জাতীয় লীগ (৪২); ছোট ছোট রাষ্ট্রের বুর্জোয়া শ্রেণীই ছিল এর শক্তি। আর হাড়ে-মজ্জায় উদারপন্থী জাতীয় লীগ প্রথমত ও প্রধানত দাবি করল প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে জাতীয় একীকরণ, সম্ভব হলে এক উদারপন্থী প্রাশিয়া, মন্দপক্ষে প্রাশিয়া যেমন ছিল তেমন। পৃথিবীর বাজারে জার্মানরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেদের মতো যে জঘন্য স্থান অধিকার করে ছিল, অবশেষে তার অবসান ঘটানো, ডেনমার্ককে শাস্তি দেওয়া, শ্লেজভিগ-হল্‌স্টাইনে বৃহৎ শক্তিদের কাছে নিজেদের পরাক্রম দেখানো—এই ছিল জাতীয় লীগের প্রধান প্রধান দাবি। প্রুশীয় কর্তৃত্বের দাবি এখন ১৮৫০ সালের আগে তার উপরে আরোপিত অস্পষ্টতা ও মোহজাল থেকে মুক্ত। এ কথা এখন নিশ্চিতরূপেই জানা গেল যে এর অর্থ জার্মানি থেকে অস্ট্রিয়ার বহিষ্কার, ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্বের প্রকৃত বিলুপ্তি, এবং কোনোটিই গৃহযুদ্ধ এবং জার্মানির বিভাজন ছাড়া অর্জন করা যাবে না। কিন্তু গৃহযুদ্ধের কোনো আশঙ্কা আর ছিল না এবং বিভাজনটা অস্ট্রীয় শুল্ক-সংক্রান্ত বিধিনিষেধের অন্তফলের চাইতে বেশি কিছু নয়। জার্মানির শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশের এমন এক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল, পৃথিবীর বাজারকে বেষ্টন করে জার্মান

বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির জাল এত বিস্তীর্ণ ও ঘন হয়ে উঠেছিল যে স্বদেশে ছোট ছোট রাষ্ট্রের ব্যবস্থা আর বিদেশে অধিকার ও রক্ষণমূলক আশ্রয়ের অভাব অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আর, জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর এযাবৎকালের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন যখন বার্লিনের প্রতিনিধিদের প্রতি কার্যত অনাস্থাসূচক ভোট দিল, তখনও শেষোক্তরা কার্যকালের মেয়াদ নিয়ে দরাদরি করে চললেন!

বিসমার্ক যখন বৈদেশিক রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন এই ছিল অবস্থা।

লুই নেপোলিয়নকে হঠকারী ফরাসী সিংহাসনের দাবিদার থেকে প্রুশীয় গ্রামপ্রান্তীয় য়ুঙ্কার এবং জার্মান ছাত্র-সমিতির সদস্যে রূপান্তরিত করলে যা দাঁড়ায়, বিসমার্ক ঠিক তাই। ঠিক লুই নেপোলিয়নের মতো, বিসমার্ক বিরাট বাস্তব বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং উপায়-উদ্ভাবনদক্ষ ব্যক্তি, জন্মগত ও সুচতুর ব্যবসায়ী, ভিন্ন পরিস্থিতিতে যিনি নিউ ইয়র্কের শেয়ার-বাজারে ভ্যান্ডারবিল্ট আর জেই গুল্ডদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন; বস্তুতপক্ষে, সুযোগ মতো নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি মন্দ সাফল্য লাভ করেন নি। কিন্তু এই প্রখর বাস্তব বোধশক্তির সঙ্গে প্রায়শই থাকে তদনুরূপ সংকীর্ণমনস্কতা, আর এ ব্যাপারে বিসমার্ক তাঁর ফরাসী পূর্বসূরীকে ছাড়িয়ে গেছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁর ভবঘুরেবৃত্তির বছরগুলিতে নিজেই নিজের 'নেপোলিয়নীয় ধ্যানধারণা' (৪৩) তৈরি করেছিলেন—যার ছাপ সেগুলির উপরে আছে—কিন্তু আমরা দেখতে পাব, বিসমার্ক কখনোই তাঁর নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ইঙ্গিতটুকু পর্যন্ত লাভ করতে পারেন নি, সর্বদাই অপরের তৈরি ধ্যানধারণা নতুন করে গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, এই সংকীর্ণমনস্কতাই ছিল তাঁর সৌভাগ্য। তা না হলে পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসকে সুনির্দিষ্ট প্রুশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে তিনি কখনই সক্ষম হতেন না; আর এই স্বভাবসিদ্ধ প্রুশীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোথাও যদি এমন কোনো ফাটল থাকত যার মধ্যে দিয়ে দিবালোক প্রবেশ করতে পারে, তাহলে তিনি তাঁর সমগ্র কর্মব্রতে গোলমাল করে ফেলতেন এবং সেটাই হত তাঁর গৌরবহানির কারণ। বাইরে থেকে নির্দেশিত তাঁর বিশেষ ব্রত যখন তিনি তাঁর নিজস্ব কায়দায় উদ্‌যাপন

করেন, সত্যিই, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাঁর যুক্তিসংগত ধ্যানধারণার নিরতিশয় অভাব ও তাঁর নিজের সৃষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুধাবনে তাঁর অক্ষমতার দরুন তাঁকে বাধ্য হয়ে কোন তুর্কি-নাচন নাচতে হয়েছিল, তা আমরা দেখতে পাব।

লুই নেপোলিয়নের অতীত যেমন তাঁকে শিখিয়েছিল পদ্ধতি-বাছাইয়ের বিন্দুমাত্র বিচার-বিবেচনা না-করতে, বিসমার্ক শিক্ষা নিয়েছিলেন প্রুশীয় নীতি থেকে, বিশেষ করে তথাকথিত মহান নির্বাচকের* এবং দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের নীতি থেকে—আরও বেশি অবিবেকী হতে এবং তবুও পিতৃভূমির ঐতিহ্যের প্রতি সৎ থাকার মহৎ ভাব অর্জনে সক্ষম হতে। তাঁর ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁকে শিখিয়েছিল প্রয়োজন হলে তাঁর য়ুঙ্কার প্রবৃত্তি দমন করতে; যখন আর প্রয়োজন নেই তখনই সেগুলি আবার প্রচণ্ডভাবে প্রকট হয়ে উঠত; এটা নিঃসন্দেহে ছিল তাঁর পতনের একটা লক্ষণ। তাঁর রাজনৈতিক পদ্ধতি ছিল ছাত্র-সংঘের একজন সদস্যের মতো, পানশালায় ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তৈরি ছাত্রদের বীয়ার পানের সংকেতবাক্যের মজাদার আক্ষরিক ব্যাখ্যার মতো—এবং তিনি তা অশোভনভাবে প্রতিনিধি সভায় ব্যবহার করেছিলেন প্রুশীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে; কূটনীতিতে নতুন যা কিছু তিনি প্রবর্তন করেছেন, সবই ছাত্রাবস্থা থেকে ধার করা। লুই নেপোলিয়ন প্রায়শই চূড়ান্ত মুহূর্তে ইতস্তত করতেন, যেমন ১৮৫১ সালে কু দে'তা-র সময়ে, যখন মর্নিকে রীতিমতো জোর করে তাঁকে দিয়ে তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করাতে হয়েছিল; কিংবা ১৮৭০-এর যুদ্ধের প্রাক্কালে, যখন তাঁর দ্বিধা তাঁর গোটা অবস্থানকেই বিনষ্ট করে দিয়েছিল, কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বিসমার্কের ক্ষেত্রে তা কখনও ঘটে নি। তাঁর ইচ্ছাশক্তি কখনও তাঁকে পরিত্যাগ করে নি, অচিরেই তা রূপান্তরিত হয়েছে প্রকাশ্য পাশবিকতায়। আর অন্য সব কিছুর তুলনায়, এটাই ছিল তাঁর সাফল্যের গোপন রহস্য। জার্মানির সমস্ত শাসক শ্রেণী, য়ুঙ্কার ও বুর্জোয়ারা এমনভাবে তাদের কর্মোদ্যমের অবশেষতম অংশটুকুও হারিয়েছিল, 'শিক্ষিত' জার্মানিতে ইচ্ছা না-থাকাটাই এমন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে তাদের

---

* ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

মধ্যে একমাত্র যে-মানুষটির তখনও ইচ্ছাশক্তি ছিল তিনিই তার দরুন তাদের মধ্যে হয়ে উঠলেন মহত্তম ব্যক্তি এবং তাদের সকলের যদৃচ্ছ শাসক, তাদের কথায় তারা তাদের সুবুদ্ধি ও বিবেকের বিরুদ্ধে যেকোনো কাজ করতে রাজী। একথা সত্যি যে 'অশিক্ষিত' জার্মানিতে অবস্থা এখনও এই জায়গায় এসে দাঁড়ায় নি; শ্রমজীবী জনগণ দেখিয়েছে যে তারা এমন এক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, যার বিরুদ্ধে বিসমার্কের প্রবল ইচ্ছাশক্তিও জয়ী হতে অপারগ।

আমাদের এই ব্রাণ্ডেন্‌বুর্গ য়ুঙ্কারের সামনে এক উজ্জ্বল কর্মজীবন পড়ে ছিল, শুধু যদি তাঁর সাহস থাকত এবং থাকত নিজেকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার বোধ। লুই নেপোলিয়ন কি বুর্জোয়া শ্রেণীর উপাস্য হয়ে ওঠেন নি ঠিক এই কারণেই যে তাদের মুনাফা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি তাদের পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়েছিলেন? আর জাল নেপোলিয়নের মধ্যে যে প্রতিভাকে বুর্জোয়ারা এত শ্রদ্ধা করত, বিসমার্কের কি সেই ব্যবসায়িক প্রতিভা ছিল না? লুই নেপোলিয়ন তাঁর ফুল্দের প্রতি যতটা আসক্ত ছিলেন, তিনি কি তাঁর ব্লাইখরোডারের প্রতি ততটাই আসক্ত ছিলেন না? প্রতিনিধি সভায় যারা কার্পণ্যবশত সামরিক কার্যকালের মেয়াদ কমাবার চেষ্টা করেছিলেন সেই বুর্জোয়া প্রতিনিধিবৃন্দ আর যারা যেকোনো মূল্যে জাতীয় কর্মতৎপরতা, যার জন্য একটি সেনাবাহিনী একান্ত আবশ্যক এমন কর্মতৎপরতা দাবি করেছিল, জাতীয় লীগে সেই বাইরের বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ১৮৬৪ সালে জার্মানিতে কি একটা বিরোধ ছিল না? ১৮৫১ সালে ফ্রান্সে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতাকে যারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল, প্রতিনিধি সভার ভিতরকার সেই বুর্জোয়ারা এবং যারা যেকোনো মূল্যে নিরুপদ্রব ও শক্তিশালী এক সরকার চেয়েছিল সেই বাইরের বুর্জোয়াদের মধ্যে বিদ্যমান যে বিরোধের মীমাংসা লুই নেপোলিয়ন করেছিলেন পার্লামেণ্টে বিতণ্ডাকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে এবং বুর্জোয়াদের চরম শান্তি দিয়ে, এই বিরোধ কি তারই অনুরূপ ছিল না? জার্মানির পরিস্থিতি কি এক দুঃসাহসিক অভ্যুত্থানের পক্ষে আরও উপযুক্ত ছিল না? সৈন্যবাহিনীর পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা কি বুর্জোয়া শ্রেণী তৈরি-অবস্থায় সরবরাহ করে নি, এবং তারা কি উচ্চকণ্ঠে এমন একজন উৎসাহী প্রুশীয় রাষ্ট্রনায়কের জন্য আহ্বান জানায় নি, যিনি তাদের পরিকল্পনা রূপায়িত করবেন, অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত করবেন,

এবং প্রাশিয়ার কর্তৃত্বে ছোট ছোট জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবেন? আর এর জন্য যদি প্রুশীয় সংবিধানের উপরে একটু কঠোর আচরণ করা দরকার হত, যদি প্রতিনিধি সভার ভিতরে ও বাইরের তত্ত্বাগীশদের যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী ঠেলে সরিয়ে দেওয়া দরকার হত, তাহলে সর্বজনীন ভোটাধিকারের উপরে নির্ভর করা কি সম্ভব ছিল না, লুই বোনাপার্ট যেমনটি করেছিলেন? সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের চাইতে বেশি গণতান্ত্রিক আর কী হতে পারত? লুই নেপোলিয়ন কি প্রমাণ করে দেন নি যে তা পুরোপুরি নিরাপদ—যদি ঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়? আর সেই সর্বজনীন ভোটাধিকারই কি ব্যাপক জনসাধারণের কাছে আবেদন সৃষ্টি করার, বুর্জোয়া শ্রেণী যদি অবাধ্য হয়ে পড়ে তাহলে উদ্ভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে একটু মাখামাখি করার উপায় তৈরি করে দেয় না?

বিসমার্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লুই নেপোলিয়নের কু দে'তা-র পুনরাবৃত্তি করা, জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে শক্তিসমূহের প্রকৃত সম্পর্ক স্পষ্ট করে দেখানো, জোর করে তাদের উদারপন্থী আত্ম-প্রবঞ্চনা কাটিয়ে দেওয়া, অথচ তাদের জাতীয় দাবিগুলি—প্রাশিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যা মিলে যায়— কার্যকর করা। শ্লেজভিগ-হল্‌স্টাইনই প্রথম এই ব্যবস্থার অজুহাত তৈরি করে দিল। বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। ১৮৬৩ সালে পোল্যান্ডের জল্লাদ (৪৪) হিসেবে বিসমার্ক যে-সেবা করেছিলেন তার ফলে রুশ জারকে* বিসমার্কের পক্ষে টেনে আনা গিয়েছিল; লুই নেপোলিয়নও মার খেয়েছিলেন, তাঁর প্রিয় 'জাতিসত্তাসংক্রান্ত নীতি' দিয়ে তিনি বিসমার্কের পরিকল্পনার প্রতি নীরব সাহায্য না-হোক, উদাসীনতার সাফাই গাইতে পারতেন; পামারস্টোন ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু তিনি ক্ষুদ্রচেতা লর্ড জন রাসেলকে বৈদেশিক দপ্তরে বসিয়েছিলেন একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে তিনি নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলবেন। কিন্তু জার্মানিতে প্রভুত্বের জন্য অস্ট্রিয়া ছিল প্রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আর ঠিক এই ব্যাপারেই প্রাশিয়া তাকে ছাপিয়ে যাবে, সে তা হতে দিতে পারে না, বিশেষ করে এই জন্য যে ১৮৫০ ও ১৮৫১ সালে সে শ্লেজভিগ-

---

* দ্বিতীয় আলেক্সান্দর। — সম্পাঃ

হল্স্টাইনে সম্রাট নিকোলাইয়ের আরক্ষী হিসেবে প্রাশিয়ার চাইতেও বেশি নীচতার পরিচয় দিয়েছিল। পরিস্থিতি অতএব অত্যন্ত অনুকূল ছিল। অস্ট্রিয়াকে বিসমার্ক যতই ঘৃণা করুন না কেন, প্রাশিয়ার উপরে আরেকবার প্রতিশোধ নিতে পারলে অস্ট্রিয়া যতই খুশী হোক না কেন, ডেনমার্কের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া ডেনমার্কের সপ্তম ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর তাদের আর কিছু করার ছিল না—রাশিয়া ও ফ্রান্সের নীরব সম্মতি নিয়ে। যতক্ষণ ইউরোপ নিরপেক্ষ থাকে, সাফল্য আগে থাকতেই সুনিশ্চিত; ইউরোপ নিরপেক্ষ রইল, ডিউকদের জমিদারিগুলি অধিকৃত হল এবং শান্তি চুক্তি অনুযায়ী অপরের হাতে চলে গেল (৪৫)।

এই যুদ্ধে, প্রাশিয়ার আর একটি অতিরিক্ত উদ্দেশ্য ছিল, সেটি হল—১৮৫০ সাল থেকে নতুন নীতি অনুযায়ী সে যে-সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছিল এবং ১৮৬০ সালে যাকে সে পুনর্বিন্যস্ত ও শক্তিশালী করেছিল, সেই সেনাবাহিনীকে শত্রুর বিরুদ্ধে পরীক্ষা করে দেখা। ফলাফল সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং সেটাও সমস্ত সামরিক পরিস্থিতিতে। জুট্ল্যাণ্ডের কাছে লিঙবির যুদ্ধে প্রমাণিত হল যে গাদা-বন্দুকের চাইতে নীডল-বন্দুক অনেক বেশি উন্নত এবং প্রুশীয়রা তা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে জানে, কারণ ঝোপের আড়াল থেকে ৮০ জন প্রুশীয়র দ্রুত গুলিবর্ষণে তিনগুণ অধিকসংখ্যক ড্যানিশ রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। সেই সঙ্গে এও লক্ষ করা গিয়েছিল যে ইতালির যুদ্ধ এবং ফরাসী যুদ্ধের কৌশল থেকে অস্ট্রীয়রা একটিই শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, তা হল: গুলি করে কোনো কাজ হয় না, প্রকৃত সৈনিককে শত্রু প্রতিহত করতে হবে তার সঙীন দিয়ে; একথা মনে রাখা হয়েছিল, কারণ কামান-বন্দুকের নলের বিরুদ্ধে শত্রু পক্ষের এর চাইতে ভালো রণকৌশল আর কিছু কামনা করা যায় না। অস্ট্রীয়দের যথাশীঘ্র সম্ভব কার্যক্ষেত্রে এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়ার সুযোগ দেবার জন্য শান্তি চুক্তিতে ডাচিগুলিকে তুলে দেওয়া হল অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুক্ত সার্বভৌমত্বের হাতে, তার দ্বারা সৃষ্টি করা হল পুরোপুরি সাময়িক এক পরিস্থিতি যার ফলে একের পর এক বিরোধ সৃষ্টি হতে বাধ্য এবং এই পরিস্থিতি এইভাবে পুরোপুরি বিসমার্কের উপরেই ছেড়ে দিল কখন তিনি অস্ট্রিয়ার উপরে তাঁর বিরাট আঘাত হানার জন্য এরূপ বিরোধকে ব্যবহার

করতে চাইবেন তা স্থির করার ভার। যেহেতু অনুকূল পরিস্থিতিকে, হের ফন সিবেলের ভাষায়, 'নির্মমভাবে চরমসীমা পর্যন্ত' ব্যবহার করা প্রুশীয় রাজনৈতিক ঐতিহ্য, সেই জন্য একথা স্বতঃসিদ্ধ যে ড্যানিশ নিপীড়নের হাত থেকে জার্মানদের মুক্ত করার অজুহাতে উত্তর শ্লেজভিগের প্রায় ২লক্ষ ড্যানিশকে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করা হল। যিনি কিছুই পেলেন না, তিনি হলেন শ্লেজভিগ-হল্‌স্টাইন সিংহাসনের জন্য ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির ও জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রার্থী ডিউক ফন অগস্টেনবার্গ।

বিসমার্ক এইভাবেই ডিউকদের জমিদারিগুলিতে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর ইচ্ছা কার্যকর করেছিলেন, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ড্যানিশদের তিনি বহিষ্কৃত করেছিলেন এবং বাইরের দেশগুলিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন, কিন্তু শেষোক্তরা কিছুই ব্যবস্থা নেয় নি। কিন্তু মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই ডাচিগুলির সঙ্গে অধিকৃত অঞ্চলের মতো আচরণ করা হতে লাগল, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কে তাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করা হল না, সোজাসুজি অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে সাময়িকভাবে ভাগাভাগি করে দেওয়া হল। প্রাশিয়া আরেকবার এক বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠেছিল, সে আর ইউরোপীয় রথের পঞ্চম চক্র ছিল না, বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ব্যাপারে ভালো অগ্রগতি হচ্ছিল, কিন্তু যে পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল সেটা বুর্জোয়া শ্রেণীর উদারপন্থী পথ নয়। তাই প্রাশিয়ার সামরিক বিরোধ চলতে থাকল, এমন কি আরও বেশি মীমাংসার অযোগ্য হয়ে উঠল। এবারে বিসমার্কের প্রধান রাষ্ট্রীয় তৎপরতার দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু করা দরকার।

* * *

ডেনমার্কের যুদ্ধে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার আংশিক পূরণ হয়েছিল। শ্লেজভিগ-হল্‌স্টাইন 'মুক্ত' হয়েছিল, ওয়ার্‌শ ও লন্ডন প্রটোকল — ডেনমার্কের হাতে জার্মানির অপমানের ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিগুলি যে প্রটোকলে অনুমোদনের ছাপ মেরে দিয়েছিল (৪৬), সেটি টুকরো-টুকরো করে তাদের পায়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা একটি শব্দও করে নি। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া আবার একজোট, তাদের সেনাবাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজয়ী হয়েছে, কোনো নৃপতিই আর জার্মান ভূখণ্ডে হস্তক্ষেপের কথা চিন্তা করেন

না। রাইনের প্রতি লুই নেপোলিয়নের লোভ পরিতৃপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ আর ছিল না, এযাবৎ তা অন্যান্য বিষয়ের দরুন পিছনে চলে গেছে, যেমন— ইতালীয় বিপ্লব, পোলিশ বিদ্রোহ, ডেনমার্কের জটিলতা, এবং সব শেষে মেক্সিকো অভিযান (৪৭)। একজন রক্ষণশীল প্রুশীয় রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে, বৈদেশিক নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব পরিস্থিতিতে আর কিছু কাম্য ছিল না। কিন্তু ১৮৭১ সাল পর্যন্ত বিসমার্ক কোনো কালেই রক্ষণশীল ছিলেন না, এখন তো আরও কম, এবং জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী কোনোক্রমেই সন্তুষ্ট ছিল না।

জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী তখনও পুরনো বিরোধে বিড়ম্বিত। এক দিকে, তারা দাবি করছিল স্বতন্ত্রভোগ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের জন্য, অর্থাৎ প্রতিনিধি সভার উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে থেকে নির্বাচিত এক মন্ত্রিসভা; এবং এই মন্ত্রিসভাকে রাজশক্তিস্বরূপ পুরনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দশ-বছরের যুদ্ধ চালাতে হত, তার পরে তার নতুন ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হত; তার অর্থ, দশ বছর ধরে আভ্যন্তরিক দুর্বলতা চলবে। অন্য দিকে, তারা দাবি করছিল জার্মানির বৈপ্লবিক পুনর্বিন্যাস, তা কার্যকর করা যেত একমাত্র বলপ্রয়োগ করেই, অর্থাৎ বাস্তুবিকপক্ষে একনায়কতন্ত্র দিয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে, ১৮৪৮ সাল থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী বারবার, প্রতিটি চরম মুহূর্তে দেখিয়েছে যে দুটি দাবির কথা দূরে থাক, এর একটি দাবিও অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মশক্তির লেশমাত্র তাদের নেই। রাজনীতিতে মাত্র দুটি নিয়ামক ক্ষমতা আছে: সংগঠিত রাষ্ট্রক্ষমতা, সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণের অসংগঠিত, মৌল ক্ষমতা। ১৮৪৮ সাল থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে ভুলে গেছে; তারা সার্বভৌমক্ষমতাকে যতটা ভয় পেত তার চাইতে বেশি ভয় করত জনসাধারণকে। বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে সেনাবাহিনী কোনোমতেই ছিল না, কিন্তু বিসমার্কের ছিল।

সংবিধান নিয়ে চলমান বিরোধে বিসমার্ক বুর্জোয়া শ্রেণীর সংসদীয় দাবিগুলির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করলেন। কিন্তু তাদের জাতীয় দাবিগুলি পূরণের বাসনায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন, কারণ প্রুশীয় নীতির গোপনতম অভিলাষের সঙ্গে তা মিলে যায়। এখন যদি তিনি আরেকবার বুর্জোয়া শ্রেণীর ইচ্ছা কার্যকর করেন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে,

বুর্জোয়া শ্রেণীর সূত্রায়িত উপায়ে যদি জার্মানির একীকরণ বাস্তবায়িত করেন, বিরোধ তাহলে স্বতই মীমাংসিত হবে, আর বিসমার্ক হয়ে উঠবেন বুর্জোয়া শ্রেণীর পরমপ্রিয় উপাস্য, যেমন তাঁর আদিরূপ লুই নেপোলিয়ন হয়েছিলেন।

বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁকে উদ্দেশ্য যোগাল, লুই নেপোলিয়ন দিলেন উদ্দেশ্যসিদ্ধির পদ্ধতি; শুধু রূপায়ণের ভার রইল বিসমার্কের উপর।

প্রাশিয়াকে জার্মানির নেতৃস্থানে স্থাপন করতে হলে শুধু অস্ট্রিয়াকে বলপূর্বক জার্মান কনফেডারেশন (৪৮) থেকে বহিষ্কারই নয়, ছোট ছোট জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে পদানত করাও দরকার ছিল। প্রুশীয় রাজনীতিতে জার্মানদের বিরুদ্ধে জার্মানদের এই রকম 'নবশক্তিদায়ক আনন্দময় যুদ্ধ' (৪৯) সর্বদাই অঞ্চল বৃদ্ধির প্রধান উপায় ছিল, কোনো নির্ভীক প্রুশীয়ই তাতে ভয় পেত না। সেই রকমই কম সংশয়ের কারণ ছিল অপর প্রধান উপায়টি: জার্মানদের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশের সঙ্গে মৈত্রী। রাশিয়ার ভাবপ্রবণ আলেক্সান্দরের সর্বাত্মক সমর্থন সুনিশ্চিত ছিল। লুই নেপোলিয়ন কখনোই জার্মানিতে প্রাশিয়ার পিয়েমোঁ ব্রতকে অস্বীকার করেন নি এবং বিসমার্কের সঙ্গে রফায় আসতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি যা চাইতেন সেটা যদি তিনি শান্তিপূর্ণভাবে, ক্ষতিপূরণের ধরনে পেতে পারেন, তাহলে তো খুবই ভালো। তাছাড়া, রাইনের গোটা বাম তীর একসঙ্গে তাঁর পাওয়ার দরকার ছিল না, তিনি যদি তা দফায় দফায়, প্রাশিয়ার প্রতিটি নতুন উদ্যোগের সঙ্গে এক-এক টুকরো করে পান, তাহলে সেটা চোখে পড়বে কম, অথচ একই লক্ষ্য পূরণ হবে। ফরাসী জাত্যভিমানীদের চোখে, রাইন নদীতীরের এক বর্গ মাইল জমির দাম গোটা স্যাভয় আর নীসের সমান। অতএব, লুই নেপোলিয়নের সঙ্গে আলোচনা হল, প্রাশিয়ার অঞ্চলবৃদ্ধি এবং একটি উত্তর জার্মান কনফেডারেশন (৫০) প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অনুমতি পাওয়া গেল। তাঁকে যে প্রতিদানে রাইন নদীর তীরে এক টুকরো জার্মান জমি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই*; গভোনের সঙ্গে আলোচনায় বিসমার্ক

* এঙ্গেলস এখানে পৃষ্ঠার পাশে পেনসিলে লিখেছিলেন: 'বিভাজন — মাইন নদীর রেখা' (এই খণ্ডের ৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) — সম্পাঃ

রেনিশ ব্যাভেরিয়া ও রেনিশ হেসেনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। পরে তিনি একথা অস্বীকার করেন। কিন্তু, যে-সীমার মধ্যে সত্যের উপরে সামান্য কিছুটা বলাৎকার করা চলে, এবং করতে হয়ও, সে-সম্পর্কে একজন কূটনীতিজ্ঞের, বিশেষ করে প্রুশীয় কূটনীতিজ্ঞের নিজস্ব মতামত আছে। আর যাই হোক, সত্য নারী তো, সুতরাং, য়ুঙ্কার ধ্যানধারণা অনুযায়ী, সে তা পছন্দই করে। প্রাশিয়ার তরফ থেকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি ছাড়া প্রুশীয় অঞ্চলবৃদ্ধি করতে দেওয়ার মতো মূর্খ লুই নেপোলিয়ন ছিলেন না; ব্লাইখরোডারও তাহলে অচিরেই সুদ ছাড়াই টাকা ধার দিতেন। কিন্তু প্রুশীয়দের তিনি ভালো করে চেনেন নি, শেষ পর্যন্ত তাই তিনি প্রতারিত হলেন। সংক্ষেপে, তাঁকে কুক্ষিগত করার পর, ইতালির সঙ্গে মৈত্রীজোট গঠন করা হল 'হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করার জন্য'।

এই অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন দেশের অর্বাচীনরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু নিতান্তই ভুল করে। À la guerre comme à la guerre* এই অভিব্যক্তি একমাত্র এ-কথাই প্রমাণ করে যে ১৮৬৬-র জার্মান গৃহযুদ্ধকে (৫১) বিসমার্ক স্বীকার করেছিলেন তার প্রকৃত স্বরূপে, অর্থাৎ এক **বিপ্লব** বলে, এবং সেই বিপ্লব তিনি সম্পন্ন করতে প্রস্তুত ছিলেন বিপ্লবী পদ্ধতিতে। এবং তা তিনি করেছিলেন। ফেডারেল ডায়েটের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল বৈপ্লবিক। ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সংবিধানসম্মত সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার পরিবর্তে তিনি তাদের বিরুদ্ধে ফেডারেল চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ করলেন — পুরোপুরি অজুহাত মাত্র! — সর্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত এক রাইখস্টাগের সংস্থান করে এক নতুন সংবিধান ঘোষণা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইন থেকে ফেডারেল ডায়েটকে বহিষ্কৃত করলেন (৫২)। ঊর্ধ্ব সাইলেসিয়ায় তিনি বিপ্লবী জেনারেল ক্লাপকা ও অন্যান্য বিপ্লবী অফিসারদের অধীনে এক হাঙ্গেরীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন, এই বাহিনীর সৈন্যরা ছিল হাঙ্গেরীয় সেনাদলত্যাগী ও যুদ্ধবন্দী, এদের এখন লড়তে হবে নিজেদেরই বৈধ সর্বাধিনায়কের বিরুদ্ধে।** বোহেমিয়া জয়ের পর বিসমার্ক 'গৌরবময়

---

* যুদ্ধের মতো যুদ্ধে। — সম্পাঃ

** এখানে পৃষ্ঠার পাশে এঙ্গেলস পেনসিলে লিখেছিলেন: 'শপথ!' — সম্পাঃ

বোহেমিয়া রাজ্যের জনসাধারণের উদ্দেশে' এক ঘোষণাবাণী প্রচার করেন, তার বিষয়বস্তুতেও উত্তরাধিকারসূত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সিংহাসনপ্রাপ্তির পরম্পরা সম্পর্কে আপত্তি তোলা হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর একটি মুক্ত নগরী এবং তিনজন বৈধ শাসক— জার্মান কনফেডারেশনের সদস্যদের* সমস্ত সম্পত্তি প্রাশিয়ার হয়ে তিনি অধিকার করে নিলেন, তাঁর খ্রীষ্টান ও উত্তরাধিকারবাদী বিবেক এই জন্য বিন্দুমাত্র দংশন করল না যে প্রাশিয়ার রাজার চাইতে কোনো কম অংশে এরা 'ঈশ্বরের কৃপায়' শাসক ছিলেন না। সংক্ষেপে, তা ছিল পরিপূর্ণ বিপ্লব, বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত। স্বভাবতই, এর জন্য আমরা তাঁকে কিছুতেই ভর্ৎসনা করতে পারি না। বরং, যে জন্য আমরা তাঁকে তিরস্কার করি তা হল—তিনি যথেষ্ট বিপ্লবী ছিলেন না, উপর থেকে আসা প্রুশীয় বিপ্লবীর অতিরিক্ত কিছু তিনি ছিলেন, একটা গোটা বিপ্লব তিনি শুরু করেছিলেন এমন অবস্থায় যেখানে তিনি শুধু অর্ধেক বিপ্লব সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, রাজ্য-দখলের পথে যাত্রা শুরু করে চারটি দুর্দশাগ্রস্ত ছোট ছোট রাষ্ট্র নিয়েই তিনি তুষ্ট হয়েছিলেন।

তারপর, যখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, তখন ক্ষুদে নেপোলিয়ন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে তাঁর পুরস্কার দাবি করলেন। যুদ্ধ চলাকালীন রাইন নদীতীরস্থ সব কিছুই তাঁর চাহিদা মতো তিনি নিয়ে নিতে পারতেন, কারণ শুধু জমি নয়, দুর্গগুলিও ছিল অরক্ষিত। তিনি ইতস্তত করছিলেন; আশা করছিলেন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের, যাতে উভয় পক্ষ নিস্তেজ হয়ে পড়বে; তার পরিবর্তে, পর পর কতকগুলি দ্রুত আঘাত এল, অস্ট্রিয়া চূর্ণ হল আট দিনের মধ্যে। জেনারেল গভোনের কাছে সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিসমার্ক যে জায়গাগুলির নাম করেছিলেন—মাইনৎস সহ রেনিশ ব্যাভেরিয়া ও রেনিশ হেসেন—প্রথমে তিনি তা দাবি করলেন। কিন্তু এখন বিসমার্ক তা দিতে পারেন না, এমন কি যদি তা দিতে চাইতেন তাও নয়। যুদ্ধের বিপুল সাফল্য তাঁর উপরে নতুন দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। প্রাশিয়া যে সময়ে

---

* হানোভার রাজ্য, হেসেন-কাসেল ইলেক্টোরেট, নাসাউ ডাচি ও ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইন মুক্ত নগরী। — সম্পাঃ

জার্মানির রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেকে খাড়া করেছে সেই সময়ে মধ্য রাইন অঞ্চলের চাবিকাঠি মাইনৎসকে সে বাইরের একটি দেশের কাছে বিক্রি করতে পারে না। বিসমার্ক তাই রাজী হলেন না। লুই নেপোলিয়ন দর-কষাকষি করতে ইচ্ছুক ছিলেন; এবার তিনি দাবি করলেন শুধু লুক্সেমবুর্গ, লান্ডাউ, সারলুই এবং সারব্রুকের কয়লাসমৃদ্ধ অববাহিকা অঞ্চল। কিন্তু বিসমার্ক তাও আর ছেড়ে দিতে পারেন না, অধিকন্তু এই কারণে যে প্রুশীয় ভূখণ্ডও দাবি করা হয়েছে। উপযুক্ত সময়ে, প্রুশীয়রা যখন বোহেমিয়ায় আটকে ছিল তখন লুই নেপোলিয়ন নিজেই তা দখল করে নেন নি কেন? সংক্ষেপে, ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে কিছুই হল না। বিসমার্ক জানতেন, এর অর্থ — ভবিষ্যতে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ, কিন্তু ঠিক তাই তিনি চেয়েছিলেন।

শান্তি চুক্তিতে এবারে প্রাশিয়া অনুকূল পরিস্থিতিকে ততটা নির্মমভাবে ব্যবহার করে নি, যতটা সে সাধারণত সাফল্যের মুহূর্তে করত। তার উপযুক্ত কারণও ছিল। স্যাক্সনি আর হেসেন-ডার্মস্টাটকে টেনে আনা হয়েছিল নতুন উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের মধ্যে, এবং অন্তত সেই কারণে হলেও, তারা অব্যাহতি পেয়ে গেল। ব্যাভেরিয়া, ভ্যুর্টেমবের্গ ও বাডেন-এর সঙ্গে প্রশ্রয়সূচক আচরণ করতে হল, কারণ তাদের সঙ্গে গোপন আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করা বিসমার্কের দরকার ছিল। আর অস্ট্রিয়া — যে পরম্পরাগত বন্ধনে সে জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল, তা চূর্ণ করে বিসমার্ক কি তার উপকার করেন নি? শেষ পর্যন্ত তিনি কি তার জন্য এক স্বাধীন বৃহৎ শক্তির বাঞ্ছিত অবস্থান এনে দেন নি? বোহেমিয়ায় তিনি যখন অস্ট্রিয়াকে পরাস্ত করেছিলেন তখন কি প্রকৃতপক্ষে তিনিই অস্ট্রিয়ার চাইতে ভালো জানতেন না কোনটা তার পক্ষে মঙ্গল? ঠিকমতো চালালে, অস্ট্রিয়াকে কি একথা উপলব্ধি করতে হবে না যে দু-দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, পরস্পরজড়িত সম্পর্ক প্রাশিয়া-কর্তৃক ঐক্যবদ্ধ জার্মানিকে তার একান্ত ও স্বাভাবিক মিত্র করে তুলেছে?

এইভাবে, ঘটনাটা দাঁড়াল এই যে, প্রাশিয়া তার অস্তিত্বকালে এই সর্বপ্রথম নিজের চারপাশে বদান্য ঔদার্যের একটা জ্যোতির্বলয় তৈরি করল এবং তার কারণ, রুই-কাতলা জালে ফেলার জন্য সে পুঁটি-মাছ ফেলে দিয়েছিল।

বোহেমিয়ার রণক্ষেত্রে শুধু অস্ট্রিয়াই মার খায় নি — জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীও মার খেয়েছিল। বিসমার্ক তাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তাদের পক্ষে কোনটা ভালো, তাদের চাইতে তিনিই তা বেশি জানেন। প্রতিনিধি সভার দিক থেকে বিরোধ চালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। বুর্জোয়া শ্রেণীর উদারপন্থী ছল আগামী বহুকালের জন্য কবরস্থ, কিন্তু তাদের জাতীয় দাবিগুলি প্রতিদিন পূর্ণতর মাত্রায় পরিতৃপ্তি লাভ করছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে বিস্ময়কর দ্রুততা ও যথাযথতায় বিসমার্ক তাদের জাতীয় কর্মসূচি রূপায়িত করলেন এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে in corpore vili — তাদেরই দূষিত নোংরা দেহের উপরে — তাদের মাংসল শিথিলতা ও অবসন্নতা, নিজেদের কর্মসূচি রূপায়ণে পরিপূর্ণ অক্ষমতা প্রমাণ করে তিনিও তাদের প্রতি মহানুভবতার ভঙ্গি করলেন এবং বিরোধের সময়ে সংবিধানবিরোধী শাসনের জন্য শাস্তি এড়ানোর ব্যবস্থা সরকারের ক্ষেত্রে রদ করার জন্য বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে নিরস্ত্র প্রতিনিধি সভার কাছে আবেদন করলেন। অশ্রুবর্ষণোন্মুখ, অভিভূত প্রতিনিধি সভা বর্তমানে নির্দোষ এই পদক্ষেপে সম্মত হল (৫৩)।

তা সত্ত্বেও, বুর্জোয়া শ্রেণীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে কনিগ্‌গ্রাৎস-এ তারাও পরাভূত হয়েছে (৫৪)। উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান (৫৫) বিরোধের সময়ে প্রামাণ্যভাবে ব্যাখ্যাত প্রুশীয় সংবিধানের ছক অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছিল। করদানে অস্বীকৃতি নিষিদ্ধ হল। ফেডারেল চ্যান্সেলর ও তাঁর মন্ত্রীদের নিযুক্ত করতেন প্রাশিয়ার রাজা, কোনোরূপে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা-নিরপেক্ষ ভাবে। বিরোধের ফলে সেনাবাহিনী সংসদ থেকে যে স্বতন্ত্রতা আদায় করে নিয়েছিল, রাইখস্টাগের ক্ষেত্রেও তা প্রতিষ্ঠিত হল। প্রতিদানে, রাইখস্টাগের সদস্যরা এই আত্মপ্রসাদমূলক মহৎ চৈতন্য লাভ করলেন যে তাঁরা সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত। তাঁদের মধ্যে দুজন সোশ্যালিস্ট* বসে আছেন, এই দৃশ্যও তাঁদের এই কথাটা অত্যন্ত অপ্রিয়ভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। একটি

---

* আগস্ট বেবেল ও ভিলহেল্ম লিব্‌ক্নেখ্‌ট। — সম্পাঃ

সংসদীয় সংস্থায় এই সর্বপ্রথম প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি, সমাজতন্ত্রী ডেপুটি আত্মপ্রকাশ করলেন। এ লক্ষণ অশুভ।

প্রথমে এ সবেরই কোনো গুরুত্ব ছিল না। এখন কাজটা ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে সাম্রাজ্যের, অন্তত উত্তরাঞ্চলের নতুন ঐক্য বিকশিত করে তোলা এবং তার দ্বারা দক্ষিণ-জার্মান বুর্জোয়াদের প্রলুব্ধ করে নতুন ফেডারেশনের মধ্যে টেনে আনা। ফেডারেশনের সংবিধানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিষয়টি একক একেকটি রাষ্ট্রের আইনসভার ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিয়ে ফেডারেশনের কাছে হস্তান্তরিত করা হল: সমগ্র ফেডারেশন জুড়ে অভিন্ন নাগরিক অধিকার ও তার অভ্যন্তরে গতিবিধির স্বাধীনতা, বসবাসের অধিকার, হস্তশিল্প, বাণিজ্য, শুল্ক, নৌচলাচল, মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপ, রেলপথ, জলপথ, ডাক ও তার, পেটেন্ট, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আইন, সমগ্র বৈদেশিক নীতি, কনসুলেট, বিদেশে বাণিজ্যের জন্য রক্ষণমূলক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা-সংক্রান্ত পুলিস, ফৌজদারি দণ্ডবিধি, আইন-আদালত প্রভৃতি। এই সব প্রশ্নের অধিকাংশই এখন আইনত দ্রুত, এবং সাধারণত উদারভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। এবং তারপরে — অবশেষে দীর্ঘকাল পরে! — বিলুপ্ত করা হল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রথার কুৎসিততম বিকৃতিগুলি, যেগুলি এক দিকে পুঁজিবাদী বিকাশের পথে সর্বাধিক বাধা দিচ্ছিল এবং অন্য দিকে প্রুশীয় ক্ষমতার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করছিল। বর্তমানে জাত্যভিমানী হয়ে-ওঠা বুর্জোয়া শ্রেণী যেমনটি ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছিল তেমন কোনো বিশ্ব-ঐতিহাসিক কৃতিত্ব তা ছিল না, বরং সত্তর বছর আগেই ফরাসী বিপ্লব যা করেছিল, এবং সমস্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ যা বহুকাল আগেই প্রবর্তন করেছিল তারই বহু, বহু কাল আগে করণীয় ও ত্রুটিপূর্ণ অনুকৃতি মাত্র। বড়াই করার বদলে এ জন্য লজ্জিত বোধ করাই যথার্থ হত যে 'অত্যন্ত আলোকপ্রাপ্ত' জার্মানি একাজ করল সবচেয়ে শেষে।

উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের এই সমগ্র কালপর্বে বিসমার্ক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইচ্ছুকভাবেই জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে বাধিত করেছেন, এবং, এমন কি সংসদের ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রশ্নেও লৌহমুষ্টি দেখিয়েছেন মখমলের দস্তানার আবরণে। এই কালপর্বটি ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাল; কখনও কখনও তাঁর সবিশেষ প্রুশীয় সংকীর্ণমনস্কতা সম্পর্কে, পৃথিবীর ইতিহাসে

সেনাবাহিনী ছাড়াও এবং তাদের উপরে নির্ভর করে কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়াও অন্যান্য এবং আরও ক্ষমতাশালী শক্তি যে আছে সে কথা উপলব্ধি করতে তাঁর অক্ষমতা সম্পর্কেও সন্দেহ হতে পারত।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তির মধ্যে নিহিত আছে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা—একথা বিসমার্ক শুধু যে জানতেন তাই নয়, তিনি তা চাইতেনও। জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁর কাছে যে প্রুশো-জার্মান সাম্রাজ্য দাবি করছিল, সেই সাম্রাজ্য সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ করার উপায় যোগাবে এই যুদ্ধ।* কাস্টমস পার্লামেণ্টকে (৫৭) ক্রমে ক্রমে একটি রাইখস্টাগে রূপান্তরিত করে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে একটু একটু করে উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা বানচাল হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ জার্মান সদস্যদের উচ্চকণ্ঠ দাবিতে: ক্ষমতা বাড়ানো চলবে না! লড়াইয়ের ময়দানে সদ্য-পরাজিত সরকারগুলির মেজাজও আর অনুকূল ছিল না। প্রুশীয়রা যে শুধু এই সরকারগুলির চাইতে অনেক বেশি পরাক্রমশালী তাই নয়, তাদের রক্ষা করার মতোও যথেষ্ট ক্ষমতাবান শুধু এই রকম একটা নতুন, জাজ্বল্যমান প্রমাণ, অর্থাৎ এক নতুন সারা-জার্মান যুদ্ধই আত্মসমর্পণের মুহূর্তটিকে দ্রুত নিকটতর করতে পারে। তাছাড়া, বিজয়ের পর মনে হতে লাগল যেন বিসমার্ক ও লুই নেপোলিয়ন পূর্বাহ্ণেই গোপনে মাইন নদীর উপরে যে বিভাজন রেখাটি (৫৮) সম্পর্কে একমত হয়েছিলেন, সেই রেখাটি শেষোক্ত ব্যক্তি প্রুশীয়দের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন; সে ক্ষেত্রে, দক্ষিণ জার্মানির সঙ্গে

---

* অস্ট্রীয় যুদ্ধের আগেই, মধ্য-জার্মানির একটি রাষ্ট্র থেকে একজন মন্ত্রী যখন বিসমার্কের বাগাড়ম্বরপূর্ণ জার্মান নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে বিতর্কে বাধা দেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে সমস্ত কথাবার্তা সত্ত্বেও, তিনি অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বহিষ্কার করবেন এবং জার্মান কনফেডারেশন ভেঙে দেবেন।—'আর মধ্যাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো, আপনি কি মনে করেন তারা নীরবে তা দেখেই যাবে?'—'আপনারা, মধ্যাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো, আপনারা কিছুই করবেন না।' — 'আর জার্মানদের তাহলে কী হবে?' — 'আমি তখন তাদের প্যারিসে নিয়ে যাব এবং সেখানে গিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ করব।' (মধ্যাঞ্চলের রাষ্ট্রের উপরোক্ত মন্ত্রী কর্তৃক প্যারিসে অস্ট্রীয় যুদ্ধের আগে কথিত এবং সেই যুদ্ধের সময়ে *Manchester Guardian* পত্রিকায় [৫৬] তার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা মিসেস ক্রফোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত।)

মিলনে জার্মানিকে টুকরো টুকরো করার ব্যাপারে ফরাসীদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তার ফলে ন্যায়সংগতভাবেই যুদ্ধের প্রয়োজন ঘটে।

ইতিমধ্যে লুই নেপোলিয়নকে জার্মান সীমান্তের কাছাকাছি কোথাও এক টুকরো জমির সন্ধান করতে হচ্ছিল, যে জমি তিনি সাদোভার (৫৯) জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আত্মসাৎ করতে পারেন। নতুন উত্তর জার্মান কনফেডারেশন যখন গঠিত হয়, তাতে লুক্সেমবুর্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, এই রাষ্ট্রটি এখন ব্যক্তিগতভাবে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু অন্যথায় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তাছাড়া, সে অ্যালসেসের মতোই ফরাসী-প্রভাবান্বিত এবং প্রাশিয়ার চাইতে ফ্রান্সের প্রতি আকর্ষণ তার অনেক বেশি ছিল, প্রাশিয়াকে সে রীতিমতো ঘৃণাই করত।

মধ্য যুগের পর থেকে জার্মানির রাজনৈতিক দুর্দশা জার্মান-ফরাসী সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির কী দশা করেছিল, লুক্সেমবুর্গ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, আরও জাজ্বল্যমান এই কারণে যে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত লুক্সেমবুর্গ নামতঃ জার্মানিরই ছিল। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত একটি ফরাসী ও একটি জার্মান অংশ নিয়ে তা গঠিত ছিল, কিন্তু জার্মান অংশটি এই গোড়ার দিকেই উন্নততর ফরাসী সংস্কৃতিকে সুযোগ দিয়েছে তাকে বাতিল করে এগিয়ে যেতে। লুক্সেমবুর্গের জার্মান কাইজাররা ভাষা ও শিক্ষা দুদিক দিয়েই ফরাসী ছিলেন। বার্গান্ডি অঞ্চলে তার অন্তর্ভুক্তির পর থেকে (১৪৪০ সাল) লুক্সেমবুর্গ, অন্য সমস্ত নিম্নাঞ্চলীয় দেশের মতোই জার্মানির সঙ্গে পুরোপুরি নামতঃ এক সম্মিলনীতে ছিল; ১৮১৫ সালে জার্মান কনফেডারেশনে তার অন্তর্ভুক্তিতেও কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। ১৮৩০ সালের পর, ফরাসী অংশ এবং জার্মান অংশের বেশ বড় একটা ভাগ বেলজিয়মের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু, বাকি জার্মান লুক্সেমবুর্গে সব কিছু চলতে থাকে ফরাসী প্রথা অনুযায়ী: আদালত, কর্তৃপক্ষ, প্রতিনিধি সভা, সমস্ত কাজকর্ম হত ফরাসীতে; সমস্ত সরকারী ও ব্যক্তিগত দলিল, সমস্ত ব্যবসায়িক হিসাব রাখা হত ফরাসীতে; মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষাদান করা হত ফরাসীতে, ফরাসী ছিল এবং থাকল শিক্ষিতসমাজের ভাষা — অবশ্য স্বভাবতই যে ফরাসী ভাষা দক্ষিণ জার্মান ব্যঞ্জনবর্ণাধিক্যে পীড়িত। সংক্ষেপে,

লুক্সেমবুর্গে দুটি ভাষায় কথা বলা হত: রাইন-ফ্র্যাঙ্কিশ এক জনপ্রিয় স্থানিক ভাষা এবং ফরাসী, আর দক্ষিণ জার্মানি প্রভাবিত জার্মান ভাষা ছিল বিদেশী ভাষা। রাজধানীতে অবস্থিত প্রুশীয় গ্যারিসন অবস্থা ভালোর চাইতে বরং আরও খারাপ করেছিল। জার্মানির পক্ষে তা লজ্জাজনক হতে পারে, কিন্তু তা সত্য। আর লুক্সেমবুর্গের এই স্বতঃপ্রণোদিত ফরাসীকরণ অ্যালসেস ও জার্মান লোরেনে অনুরূপ প্রক্রিয়াকে যথার্থ আলোকে প্রতিভাত করেছিল।

হল্যান্ডের রাজা*, লুক্সেমবুর্গের সার্বভৌম ডিউক নগদ মুদ্রা ব্যবহার করতে জানতেন, তিনি লুই নেপোলিয়নকে ডাচি বিক্রি করতে ইচ্ছুক ছিলেন। লুক্সেমবুর্গের জনগণ তাদের ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে অনুমোদন করত — তার প্রমাণ হল ১৮৭০-এর যুদ্ধে তাদের মনোভাব। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাশিয়া আপত্তি করতে পারত না, যেহেতু সে নিজেই জার্মানি থেকে লুক্সেমবুর্গের বহিষ্কার ঘটিয়েছে। তার ফৌজ মোতায়েন ছিল রাজধানীতে, ফেডারেল জার্মান দুর্গের ফেডারেল বাহিনী হিসেবে; লুক্সেমবুর্গ যখনই আর ফেডারেল দুর্গ থাকল না, তখনই তাদেরও আর সেখানে কোনো অধিকার ছিল না। তারা স্বগৃহে চলে যায় নি কেন, লুক্সেমবুর্গের অন্যত্র অন্তর্ভুক্তিতে বিসমার্ক রাজী হতে পারলেন না কেন?

কারণ যে-বিরোধে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন তা এখন প্রকট হয়ে উঠছিল। প্রাশিয়ার কথা বলতে গেলে, ১৮৬৬-র **আগে** জার্মানি ছিল শুধু দখল করার মতো ভূখন্ড, বাইরের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তা ভাগাভাগি করে নিতে হত। ১৮৬৬-র **পরে** জার্মানি পরিণত হল প্রাশিয়ার **আশ্রিত রাজ্যে,** বিদেশী নখদন্তের বিরুদ্ধে তাকে রক্ষা করা দরকার। একথা সত্যি, প্রাশিয়ার স্বার্থে নব প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত জার্মানি থেকে গোটা এক-একটি অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার সমগ্র অঞ্চলের উপরে জার্মান জাতির অধিকার এখন প্রুশীয় রাজ-সিংহাসনের উপরে কর্তব্যভার চাপিয়ে দিল — যাতে প্রাক্তন ফেডারেল ভূখন্ডের এই অংশগুলি বিদেশী রাষ্ট্রগুলির অন্তর্ভুক্ত হতে না-পারে, যাতে নতুন প্রুশীয়-জার্মান রাষ্ট্রে ভবিষ্যৎ আনশ্লুসের জন্য দরজা খোলা রাখা যায়। এই কারণেই ইতালি টিরোলিয়ান সীমান্তে এসে থেমে গিয়েছিল (৬০), এবং লুক্সেমবুর্গকে লুই নেপোলিয়নের হাতে চলে যেতে

* তৃতীয় ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

দেওয়া চলত না। সত্যিকার একটি বিপ্লবী সরকার একথা খোলাখুলি ঘোষণা করত। রাজকীয়-প্রুশীয় বিপ্লবী তা করেন নি, শেষ পর্যন্ত তিনি জার্মানিকে মেটেরনিখের অর্থে এক 'ভৌগোলিক ধারণায়' (৬১) রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন অন্যায় অবস্থানে, আর এই অসুবিধা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় ছিল তাঁর প্রিয় 'কর্পস' বীয়ার-পানশালাসুলভ আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা।

সেটা করতে গিয়ে তিনি যে নিদারুণ ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠেন নি, তার একমাত্র কারণ, ১৮৬৭-র বসন্তকালে লুই নেপোলিয়ন বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। লন্ডন সম্মেলনে মতৈক্য হল। প্রুশীয়রা লুক্সেমবুর্গ ছেড়ে চলে গেল, দুর্গ ভেঙে ফেলা হল, ডাচিটি নিরপেক্ষ বলে ঘোষিত হল (৬২)। যুদ্ধ আবার স্থগিত রাখা হল।

লুই নেপোলিয়ন এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। প্রাশিয়ার অঞ্চলবৃদ্ধি তিনি সহ্য করতে রাজী ছিলেন একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, যদি তিনি রাইন অঞ্চলে অনুরূপ ক্ষতিপূরণ পেতেন। তিনি অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন, এমন কি সেই অল্পকে ন্যূনতম মাত্রায়ও হয়তো নামিয়ে আনতেন, কিন্তু তিনি কিছুই পান নি, সব কিছু থেকেই তাঁকে প্রবঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সে এক বোনাপার্টীয় সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারে একমাত্র তখনই, সে যদি তার সীমান্ত ক্রমে ক্রমে রাইনের দিকে সরিয়ে আনে এবং যদি ফ্রান্স — বস্তুতপক্ষে কিংবা অন্তত কল্পনায় — ইউরোপের সালিস হিসেবে থাকে। সীমান্ত সরিয়ে আনার কাজ সফল হয় নি, সালিস হিসেবে ফ্রান্সের অবস্থান ইতিমধ্যেই বিপন্ন, বোনাপার্টপন্থী সংবাদপত্র তারস্বরে সাদোভার জন্য প্রতিশোধ দাবি করছিল — লুই নেপোলিয়ন তাঁর সিংহাসন রাখতে চাইলে তাঁকে তাঁর ভূমিকার প্রতি যোগ্য মর্যাদা দিতে হত এবং যা তিনি সকল সেবা সত্ত্বেও, আপোসে আদায় করতে পারেন নি তা বাহুবলে আদায় করতে হত।

সুতরাং, উভয় পক্ষ থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি — কূটনৈতিক ও সামরিক উভয়ত — শুরু করা হল। এমন সময়ে ঘটল নিম্নলিখিত কূটনৈতিক ঘটনাটি।

স্পেন তার সিংহাসনের জন্য একজন প্রার্থীর সন্ধান করছিল। মার্চ মাসে (১৮৬৯) বার্লিনস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূত বেনেদেত্তি এই মর্মে গুজব শুনতে পান যে হয়েনৎসলার্ন-এর প্রিন্স লেওপোল্ড সিংহাসনের জন্য দাবি উপস্থিত করেছেন; প্যারিস থেকে তাঁকে এবিষয়ে অনুসন্ধান করতে বলা হয়। পররাষ্ট্র দপ্তরের উপসচিব ফন টিলে আত্মসম্মানের দোহাই পেড়ে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে প্রুশীয় সরকার এবিষয়ে কিছু জানেন না। প্যারিসে একবার সফর করার সময়ে বেনেদেত্তি সম্রাটের অভিমত জানতে পারেন: 'এই প্রার্থীপদ নিতান্তই জাতিবিরোধী, দেশ এতে রাজী হবে না, এ ঠেকাতেই হবে।'

ঘটনাক্রমে, লুই নেপোলিয়ন এর দ্বারা দেখালেন যে তাঁর অবস্থানের প্রচণ্ড অবনতি হচ্ছে। বস্তুতই, স্পেনের সিংহাসনে একজন প্রুশীয় যুবরাজ, তার ফলস্বরূপ অনিবার্য উৎপাত, স্পেনের উপদলগুলির মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার জড়িত হয়ে পড়া, এমন কি হয়তো একটা যুদ্ধ, বামনসদৃশ প্রুশীয় নৌবাহিনীর পরাজয়, আর কিছু না হোক অন্তত ইউরোপের চোখে এক কিম্ভূতমূর্তি প্রাশিয়া — এর চাইতে ভালো 'সাদোভার প্রতিশোধ' আর কী হতে পারত? কিন্তু এই দৃশ্য দেখাবার মতো অবস্থা লুই বোনাপার্টের আর ছিল না। তাঁর আস্থা এমন নাড়া খেয়েছিল যে তিনি এক চিরাচরিত দৃষ্টিকোণ আঁকড়ে রইলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী স্পেনের সিংহাসনে একজন জার্মান রাজা বসলে ফ্রান্স দু-দিক থেকে বিপদের মধ্যে পড়বে, অতএব তা বরদাস্ত করা যায় না — ১৮৩০ সালের পর নিতান্তই শিশুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি।

আরও খবরাখবর পাওয়ার জন্য এবং ফ্রান্সের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য বেনেদেত্তি বিসমার্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (১১ মে, ১৮৬৯)। বিসমার্কের কাছ থেকে তিনি চূড়ান্ত কোনো কিছু জানতে পারলেন না। বিসমার্ক কিন্তু যা জানতে চেয়েছিলেন বেনেদেত্তির কাছ থেকে তা জেনে গেলেন। তিনি বুঝলেন যে প্রার্থী হিসেবে লেওপোল্ডের মনোনয়নের অর্থ অবিলম্বে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ। এর ফলে, তাঁর সুবিধামতো যুদ্ধ বাধতে দেওয়ার সম্ভাবনা বিসমার্ক পেয়ে গেলেন।

বস্তুতই, লেওপোল্ডের প্রার্থীপদ আবার জুলাই ১৮৭০-এ সামনে এল এবং ফলে, সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ বেধে গেল, লুই নেপোলিয়ন তা যতই প্রতিরোধ

করুন না কেন। তিনি শুধু যে দেখতে পেলেন তিনি ফাঁদে পা-দিয়েছেন, তাই নয়, তিনি এও জানতেন যে তাঁর সম্রাটত্ব বিপন্ন; তাঁর বোনাপার্টপন্থী যে বদমাশের দল (৬৩) তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল যে সৈনিকদের পায়ের পটির শেষ বোতামটি পর্যন্ত সব কিছু একেবারে পরিপাটি করে তৈরি, তাদের বিশ্বস্ততায় তাঁর আস্থা ছিল সামান্যই, এবং ততোধিক কম আস্থা ছিল তাদের সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতায়। কিন্তু তাঁর নিজেরই অতীতের যুক্তিসংগত পরিণতি তাঁকে নিয়ে গেল বিনাশের দিকে, এমন কি তাঁর দ্বিধা তাঁর সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করল।

অন্য দিকে, বিসমার্ক যে সামরিক দিক দিয়ে যুদ্ধের জন্য শুধুমাত্র রীতিমত তৈরি ছিলেন তাই নয়, এবারে প্রকৃতই তিনি জনগণের সমর্থনপুষ্ট ছিলেন; জনগণ উভয় পক্ষের ছড়ানো কূটনৈতিক মিথ্যার পিছনে শুধু একটি জিনিসই দেখতে পেয়েছিল: যথা, এ যুদ্ধ শুধু রাইনের জন্যই নয়, জাতীয় অস্তিত্বের জন্যও। ১৮১৩ সালের পর এই সর্বপ্রথম সংরক্ষিত যোদ্ধারা এবং ল্যান্ডভের আবার একজোট হল, তারা লড়াই করার জন্য আগ্রহী ও উন্মুখ। কী করে সব কিছু ঘটল সেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, দু-হাজার বছরের পুরনো জাতীয় উত্তরাধিকারের কতখানি বিসমার্ক নিজ দায়িত্বে লুই নেপোলিয়নকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি দেন নি, তাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না: আসল কথা হল, বাইরের দেশগুলিকে চিরকালের জন্য শিক্ষা দেওয়া দরকার যে জার্মানদের আভ্যন্তরিক বিষয়ে তারা যেন হস্তক্ষেপ না-করে এবং জার্মান অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে লুই নেপোলিয়নের নড়বড়ে সিংহাসনকে মদত দেওয়া জার্মানির ব্রত নয়। এই জাতীয় অভ্যুত্থানের সামনে সমস্ত শ্রেণী-পার্থক্য অদৃশ্য হল, দক্ষিণ জার্মান রাজসভাগুলির এক রেনিশ কনফেডারেশনের জন্য সমস্ত প্রয়াস, বহিষ্কৃত নৃপতিদের পুনরুদ্ধারের সমস্ত চেষ্টা মিলিয়ে গেল।

উভয় পক্ষই মিত্রের সন্ধান করতে লাগল। অস্ট্রিয়া ও ডেনমার্ক সম্পর্কে, এবং কিছু পরিমাণে ইতালি সম্পর্কে লুই নেপোলিয়ন সুনিশ্চিত ছিলেন। বিসমার্কের পক্ষে ছিল রাশিয়া। কিন্তু অস্ট্রিয়া, চিরকালের মতোই, প্রস্তুত ছিল না এবং ২ সেপ্টেম্বরের আগে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারল না — আর ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লুই নেপোলিয়ন জার্মানদের হাতে যুদ্ধবন্দী

হলেন; আর রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে জানিয়ে দিল যে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়াকে আক্রমণ করার পর মুহূর্তেই সে অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করবে। ইতালিতে অবশ্য লুই নেপোলিয়নের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনসিদ্ধির নীতিই তাঁর উপরে প্রতিশোধ নিল: তিনি চেয়েছিলেন জাতীয় ঐক্য চালু করতে, কিন্তু একই সঙ্গে, সেই জাতীয় ঐক্যেরই বিরুদ্ধে পোপকে রক্ষা করতে; যে সৈন্য তাঁর এখন স্বদেশেই দরকার ছিল, তাদের দিয়ে তিনি রোম দখলে রাখলেন, ইতালিকে দিয়ে রোম ও পোপের সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দিতে বাধ্য না-করে তিনি সৈন্যাপসারণ করতে পারেন না; এ জন্য আবার ইতালি তাঁকে সমর্থন করতে পারল না। ডেনমার্ক শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার কাছ থেকে উপযুক্ত আচরণ করার নির্দেশ পেল।

স্পিখার্ন ও ভোর্থ থেকে সেদান (৬৪) পর্যন্ত জার্মান সেনাবাহিনীর দ্রুত আঘাত যুদ্ধকে স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে সমস্ত কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার চাইতে বেশি নিয়ামক হয়েছিল। লুই নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী প্রতিটি লড়াইতে পরাজিত হল এবং শেষ পর্যন্ত তার তিন-চতুর্থাংশ জার্মানিতে চলে গেল যুদ্ধবন্দী হিসেবে। সৈনিকদের দোষে এটা হয় নি, তারা যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল; দোষ ছিল নেতাদের এবং প্রশাসনের। কিন্তু, লুই নেপোলিয়নের মতো, কেউ যদি একদল বদমাশের সাহায্যে একটা সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে থাকত, যদি সেই দলের শোষণের হাতে ফ্রান্সকে ছেড়ে দিয়ে আঠারো বছর ধরে তার উপরে শাসন বজায় রাখা হত, যদি রাষ্ট্রের সমস্ত নিয়ামক গুরুত্বসম্পন্ন পদ সেই দলের লোকজন দিয়ে ভর্তি করা হত এবং সমস্ত অধীনস্থ পদ ভর্তি করা হত তাদের অনুচরদের দিয়ে, তাহলে জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, হলে নিঃসহায় হয়ে পড়ার সমূহ বিপদ থাকবেই। বহু বছর ধরে ইউরোপীয় অর্বাচীনদের বিমুগ্ধ প্রশংসার বস্তু এই সাম্রাজ্যের গোটা ইমারত ভেঙে পড়ল পাঁচ সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে; ৪ সেপ্টেম্বরের বিপ্লব (৬৫) শুধু জঞ্জালের স্তূপ সাফ করেছিল, আর যে-বিসমার্ক যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন একটি ক্ষুদ্র জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করার জন্য, তিনি সহসা এক শুভ প্রভাতে আবিষ্কার করলেন তিনি একটি ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে গেছেন।

বিসমার্কের নিজের ঘোষণা অনুযায়ী, ফরাসী জনগণের বিরুদ্ধে নয়, শুধু লুই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ চালানো হয়েছিল। তাঁর পতনে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো কারণ নেই। ৪ সেপ্টেম্বরের সরকার, অন্যান্য বিষয়ে তত সরল না হলেও, তাই ভেবেছিল; কিন্তু বিসমার্ক যখন হঠাৎ তাঁর প্রুশীয় য়ুঙ্কারের (৬৬) রূপ প্রকাশ করলেন, তারা অত্যন্ত হতচকিত হয়ে গেল।

প্রুশীয় য়ুঙ্কাররা ফরাসীদের যত ঘৃণা করে ততটা পৃথিবীতে আর কেউ করে না। কারণ, এর আগে-পর্যন্ত কর-মুক্ত য়ুঙ্কাররা ফরাসীদের হাতে শাস্তিলাভের সময়ে (১৮০৬ থেকে ১৮১৩) প্রচন্ড কষ্টভোগ করেছিল, যদিও সে শাস্তি তারা পেয়েছিল তাদেরই ঔদ্ধত্যের দরুন; শুধু তাই নয়, তার চাইতেও যা খারাপ, ঈশ্বরহীন ফরাসীরা তাদের সাংঘাতিক বিপ্লবে জনসাধারণকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করেছিল যে য়ুঙ্কারদের প্রাচীন গরিমা এমন কি পুরনো প্রাশিয়াতেও অনেকাংশে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে, তার সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু রক্ষা করার জন্য বছরের পর বছর বেচারা য়ুঙ্কারদের কঠোর সংগ্রাম চালাতে হয়েছে, এবং তাদের অনেকেই হীন পরাশ্রয়ী অভিজাততন্ত্রের স্তরে অধঃপতিত হয়েছে। এই জন্য ফ্রান্সের উপরে প্রতিশোধ নেওয়া দরকার ছিল, এবং বিসমার্কের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর য়ুঙ্কার অফিসাররা সে বিষয়ে যত্নবান হল। প্রাশিয়ার কাছ থেকে ফ্রান্স যে যুদ্ধবাবদ অর্থ আদায় করেছিল তার তালিকা তৈরি করা হল এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন শহর ও বিভাগের উপরে চাপানো যুদ্ধবাবদ চাঁদার পরিমাণ তদনুযায়ী হিসাব করা হল, স্বভাবতই এই হিসাব করার সময়ে ফ্রান্সের অধিকতর সম্পদের কথা গণ্য করা হয়েছিল। খাদ্যসামগ্রী, ঘোড়া ও গবাদি পশুর খাদ্য, বস্ত্র, জুতো প্রভৃতি আদায় করে নেওয়া হল দর্শনীয় নির্মমতায়। আর্দেন্ অঞ্চলে একজন মেয়র বলেছিলেন যে এসব জিনিস সরবরাহ করতে তিনি অক্ষম, অধিক বাক্য ব্যয় না-করে তাঁকে পঁচিশ-ঘা বেত মারা হয়েছিল — প্যারিস সরকার সরকারীভাবে তা প্রমাণ করে ফ্রাঁ-তিরো-রা (৬৭) ১৮১৩ সালের প্রুশীয় 'লান্ডস্টার্ম সংবিধি' (৬৮) এমনভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে কাজ করেছিল, যেন তারা সেটি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছে; তাদের নির্দয়ভাবে গুলি করে মারা হয়। ঘড়ি স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কাহিনীও

সত্য, এমন কি *Kölnische Zeitung* (৬৯) পত্রিকাও সে খবর দিয়েছিল। তবে, প্রুশীয় অভিমত অনুযায়ী, ঘড়িগুলো চুরি করা হয় নি, ওগুলোর কোনো মালিক ছিল না, পাওয়া গিয়েছিল প্যারিসের কাছে পরিত্যক্ত বাসভবনগুলিতে এবং সেগুলি দেশে প্রিয়জনদের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এইভাবে, বিসমার্কের নেতৃত্বে য়ুঙ্কাররা এবিষয়ে যত্নবান ছিল যাতে সাধারণ সৈনিক ও বহু অফিসারের অনিন্দনীয় আচরণ সত্ত্বেও, যুদ্ধের সবিশেষ প্রুশীয় চরিত্র বজায় থাকে, এবং য়ুঙ্কারদের হীন অসূয়ার জন্য যারা সমগ্র সেনাবাহিনীকেই দায়ী করেছিল সেই ফরাসীদের মাথায় তা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

তা সত্ত্বেও, এই য়ুঙ্কারদেরই ভাগ্যে পড়েছিল ফরাসী জাতিকে ইতিহাসে অতুলনীয় এক সম্মান দেওয়ার ভার। প্যারিসের অবরোধ মুক্ত করতে শত্রুকে বাধ্য করার সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, সবকটি ফরাসী সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত, জার্মান যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরে বুরবাকির শেষ বড় প্রতি-আক্রমণ নিষ্ফল হল যখন ইউরোপের সমস্ত কূটনীতি বিন্দুমাত্র অঙ্গুলিহেলন না-করে ফ্রান্সকে ছেড়ে দিল তার নিয়তির হাতে, অনাহারক্লিষ্ট প্যারিসকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হল। য়ুঙ্কাররা যখন অবশেষে ঈশ্বরহীন আবাসে বিজয়গর্বে প্রবেশ করে প্যারিসের ঘোরতর বিদ্রোহীদের উপরে পরিপূর্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে পেরেছিল তখন তাদের হৃদ্‌স্পন্দন হয়ে উঠেছিল দ্রুততর; — এই পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিতে ১৮১৪ সালে রাশিয়ার সম্রাট আলেক্সান্দর এবং ১৮১৫ সালে ওয়েলিংটন নিষেধ করেছিলেন; এখন তারা বিপ্লবের জন্মভূমিকে প্রাণ ভরে শাস্তি দিতে পারল।

প্যারিস আত্মসমর্পণ করল, খেসারত দিল ২০ কোটি মুদ্রা, দুর্গগুলি তুলে দেওয়া হল প্রুশীয়দের হাতে; বিজেতাদের সামনে সৈন্যবাহিনী তাদের অস্ত্রত্যাগ করল এবং হাল্কা কামানগুলিকে তুলে দিল তাদের হাতে; প্যারিসের চারপাশের প্রাচীরে রাখা কামানগুলিকে কামানবাহী শকট থেকে খুলে নেওয়া হল; রাষ্ট্রের হাতে প্রতিরোধের যে-সমস্ত উপায়-উপকরণ ছিল সে সবই একটু একটু করে হস্তান্তরিত করা হল। কিন্তু প্যারিসের যারা প্রকৃত রক্ষক, সেই জাতীয় রক্ষিবাহিনী, প্যারিসের সশস্ত্র জনগণের গায়ে হাত

দেওয়া হয় নি, কারণ কেউই আশা করে নি যে তারা অস্ত্র পরিত্যাগ করবে — রাইফেলও না, কামানও* নয়; সুতরাং সারা পৃথিবীর একথা জানা থাকবে যে বিজয়ী জার্মান সেনাবাহিনী প্যারিসের সশস্ত্র জনগণের সামনে এসে সসম্ভ্রমে থেমে গিয়েছিল, বিজয়ীরা প্যারিসে প্রবেশ করে নি, শুধু তিন দিনের জন্য প্যারিসবাসীর প্রহরীদের দ্বারা সুরক্ষিত, প্রহরাধীন ও চতুর্দিকে বেষ্টিত অবস্থায় একটি সরকারী পার্ক — শাঁজেলিজে দখল করতে পেরেই সন্তুষ্ট ছিল! কোনো জার্মান সৈনিকই প্যারিসের সিটি হল-এ পা দেয় নি অথবা প্রশস্ত বীথিগুলির উপরে পদচার করে নি এবং অল্প যে কয়েকজনকে ল্যুভর-এ সেখানকার শিল্পসম্পদ দেখার জন্য ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল, তাদেরও অনুমতি চাইতে হয়েছিল, অন্যথায় সেটা হত আত্মসমর্পণের শর্ত লঙ্ঘন করা। ফ্রান্স পরাস্ত হয়েছিল, প্যারিস ছিল অনাহারে, কিন্তু প্যারিসের জনগণ তাদের গৌরবময় অতীতের সাহায্যে নিজেদের জন্য **এমন** সম্মান আদায় করে নিয়েছিল, যার ফলে কোনো বিজেতা তাদের নিরস্ত্রীকরণ দাবি করার দুঃসাহস দেখায় নি, একটি বাড়ি তল্লাসী করার কিংবা অনেক বিপ্লবের রণক্ষেত্র সেই রাস্তাগুলিকে বিজয়োৎসবের শোভাযাত্রায় অপবিত্র করার সাহসও কারও ছিল না। যেন ভুঁইফোড় জার্মান সম্রাট** প্যারিসের জীবিত বিপ্লবীদের সামনে মাথার টুপি খুলে দাঁড়িয়েছিলেন, একদা যেমন তাঁর ভাই*** দাঁড়িয়েছিলেন বার্লিনের মৃত মার্চ-সংগ্রামীদের (৭০) সামনে; এবং যেন গোটা জার্মান সেনাবাহিনী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিল সম্মান দেখানোর ভঙ্গিতে অস্ত্রধারণ করে।

কিন্তু বিসমার্ককে শুধু এই আত্মত্যাগটুকুই করতে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে এমন কোনো সরকার ফ্রান্সে নেই —

---

* এই কামানগুলি ছিল জাতীয় রক্ষিবাহিনীর, রাষ্ট্রের নয়, তাই সেগুলো প্রুশীয়দের হাতে অর্পণ করা হয় নি, ১৮ মার্চ ১৮৭১ তারিখে তিয়ের প্যারিসবাসীদের কাছ থেকে এই কামানগুলিই **চুরি করার** নির্দেশ দিয়ে বিদ্রোহের কারণস্বরূপ হয়েছিলেন, যার ফলে উদ্ভব ঘটেছিল কমিউনের।

** প্রথম ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

*** চতুর্থ ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

কথাটা ৪ সেপ্টেম্বর ও ২৮ জানুয়ারি, দুদিনই যেমন সত্য ছিল তেমনি মিথ্যাও ছিল — এই অজুহাতে তিনি তাঁর সাফল্যগুলিকে নির্ভেজাল প্রুশীয় ভঙ্গিতে, একেবারে শেষ বিন্দু পর্যন্ত ব্যবহার করলেন, এবং ঘোষণা করলেন যে ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হওয়ার পরেই তিনি শান্তি স্থাপন করতে প্রস্তুত। শান্তি চুক্তিতেও, আরও একবার সুপ্রাচীন প্রুশীয় রীতি অনুযায়ী, তিনি 'অনুকূল পরিস্থিতি নির্মমভাবে সদ্ব্যবহার করলেন'। যুদ্ধের খেসারত হিসেবে শুধু যে অশ্রুতপূর্ব পরিমাণ একটা অংক —৫০০ কোটি — আদায় করা হল তাই নয়, দুটি প্রদেশ অ্যালসেস ও জার্মান লোরেন, তৎসহ মেৎস ও স্ট্রাসবুর্গও ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করা হল। এই রাজ্য-সংযোজন করে বিসমার্ক সর্বপ্রথম কাজ করলেন একজন স্বাধীন রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে, যিনি আর বাইরে থেকে নির্দেশিত কোনো কর্মসূচি নিজস্ব উপায়ে রূপায়িত করছেন না, বরং কাজে রূপায়িত করছেন তাঁর নিজের মস্তিষ্কজাত চিন্তাকে — এবং সেইখানে তিনি করলেন তাঁর প্রথম বিরাট ভুল।

ত্রিশ বছরের যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সই প্রধানত অ্যালসেস অধিকার করেছিল। রিশল্যু তার দ্বারা চতুর্থ হেনরির সুযুক্তিপূর্ণ নীতিটি পরিত্যাগ করেছিলেন:

> 'স্প্যানিশ ভাষা স্প্যানিয়ার্ডদের থাক, জার্মান ভাষা থাক জার্মানদের, কিন্তু ফরাসী ভাষা যেখানে বলা হয়, তার মালিক আমি।'

এক্ষেত্রে, রিশল্যু অগ্রসর হয়েছিলেন রাইন অঞ্চলের স্বাভাবিক সীমান্ত, পুরনো গল-এর ঐতিহাসিক সীমান্তের নীতি থেকে। তা ছিল মূর্খতা; কিন্তু যে জার্মান সাম্রাজ্য লোরেন ও বেলজিয়ামের ফরাসীভাষী অঞ্চলগুলিকে, এমন কি ফ্রান্শ-কংতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল, জার্মানভাষী অঞ্চল দখলের জন্য ফ্রান্সকে তিরস্কার করার কোনো অধিকার তার ছিল না। এমন কি যদি ১৬৮১ সালে, শান্তির সময়ে, চতুর্দশ লুই ফরাসীদের সমর্থক একটি দলের সাহায্যে স্ট্রাসবুর্গ দখল করেও থাকেন (৭১), তা নিয়ে প্রাশিয়ার ক্ষুব্ধ হওয়া সমীচীন নয়, যেহেতু সে ১৭৯৬ সালে একই কায়দায় মুক্ত

রাজকীয় ন্যুরেম্‌বার্গ শহরকে লুণ্ঠন করেছিল, যদিও একথা ঠিক কোনো প্রুশীয় দল তাকে আহ্বান জানায় নি, এবং সে সফলও হয় নি।*

ভিয়েনার শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ১৭৩৫ সালে অস্ট্রিয়া বিনিময়সূচক লেনদেনে লোরেনকে তুলে দেয় ফ্রান্সের হাতে, এবং ১৭৬৬ সালে সে শেষ পর্যন্ত একটি ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলে পরিণত হয়। বহু শতাব্দী ধরে সে জার্মান সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল শুধু নামেই, তার নৃপতিরা সর্বদিক দিয়েই ছিলেন ফরাসী এবং প্রায় সর্বদাই ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে ছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের আগে ভোজ অঞ্চলে এমন বহু ছোট ছোট রাজ্য ছিল যারা জার্মানির সঙ্গে আচরণ করত শুধু রাজকীয় সরকারের অধীন অঞ্চলের মতো, কিন্তু স্বীকার করত ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব। এই উভলিঙ্গ অবস্থার সুযোগ

---

* যেসব জার্মান অঞ্চল তাঁর ছিল না সেইখানে শান্তির সময়ে তাঁর 'পুনর্মিলন কক্ষ'-কে (৭২) লেলিয়ে দেওয়ার জন্য চতুর্দশ লুই তিরস্কৃত হয়ে থাকেন। প্রুশীয়দের সম্পর্কে যাদের সবচেয়ে বিদ্বেষপূর্ণ ঈর্ষা ছিল, এমন কি তারাও প্রুশীয়দের সম্পর্কে এ কথা বলতে পারতেন না। বরং তার বিপরীত। সাম্রাজ্যিক সংবিধান প্রত্যক্ষভাবে লঙ্ঘন করে ১৭৯৫ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে এক পৃথক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এবং প্রথম উত্তর জার্মান কনফেডারেশনে তাদের চারপাশের সীমারেখার পিছনে সমান অবিশ্বস্ত ছোট ছোট প্রতিবেশীকে সমবেত করার পর, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জোট বেঁধে একা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ফলে দক্ষিণ জার্মান রাজকীয় সরকারগুলি যে প্রচন্ড চাপের সম্মুখীন হয়েছিল, তাকে তারা কাজে লাগিয়েছিল ফ্রাঙ্কনিয়ার ভূখন্ড দখলের চেষ্টায়। আনস্‌বাখ ও বেরুথে (এগুলি তখন প্রুশীয় ছিল) লুইয়ের ধাঁচে 'পুনর্মিলন কক্ষ' তৈরি করে তারা অনেকগুলি প্রতিবেশী এলাকার উপরে দাবি জানাল, যার তুলনায় লুইয়ের আইনগত দাবিগুলি ছিল পুরোপুরি বিশ্বাসজনক; এবং জার্মানরা যখন মার খেয়ে পশ্চাদপসরণ করল এবং ফরাসীরা ফ্রাঙ্কনিয়ায় ঢুকে পড়ল, তখন প্রুশীয় রক্ষাকর্তারা নগর প্রাচীর পর্যন্ত উপকণ্ঠ সহ ন্যুরেম্‌বার্গ অঞ্চল দখল করে নিল এবং ভয়ে কম্পিত ন্যুরেম্‌বার্গ কূপমন্ডূকদের দিয়ে কৌশলে এমন চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিল (২ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৬), যার ফলে শহরটি চলে গেল প্রুশীয় শাসনাধীনে, এই শর্তে যে নগর প্রাচীরের ভিতরে ইহুদিদের কখনও ঢুকতে দেওয়া হবে না। তার অব্যবহিত পরেই, আর্চডিউক কার্ল আবার আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৬ তারিখে ভুরৎসবুর্গে ফরাসীদের পরাস্ত করেন, এবং ন্যুরেম্‌বার্গ শহরবাসীর মাথায় প্রাশিয়ার জার্মান ব্রতের ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা এইভাবে বিলীন হয়ে যায়।

তারা ভোগ করত, আর জার্মান সাম্রাজ্য যদি এই শাসকদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে তা সহ্য করে থাকে, তাহলে ফ্রান্স যখন তার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে এই অঞ্চলগুলির জনগণকে বহিষ্কৃত নৃপতিদের বিরুদ্ধে আশ্রয় দিয়েছিল তখন তার অভিযোগ করার কিছু ছিল না।

মোটের উপরে, বিপ্লবের আগে, এই জার্মান অঞ্চলটি কার্যত মোটেই ফরাসী-প্রভাবিত ছিল না। জার্মান ভাষা ছিল স্কুলের এবং সরকারী কাজের ভাষা, অন্তত অ্যালসেসে। ফরাসী সরকার জার্মান প্রদেশগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করত; এই প্রদেশগুলি বহু বছরের যুদ্ধজনিত ধ্বংসের পর এখন, ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে তাদের জমিতে আর শত্রুদের দেখতে পায় নি। নিরন্তর আভ্যন্তরিক যুদ্ধে দীর্ণ জার্মান সাম্রাজ্য সত্যিই অ্যালসেসীয়দের আকৃষ্ট করে মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়ে আনার মতো অবস্থায় ছিল না; অন্তত, তারা এখন স্বস্তি আর শান্তি পেয়েছিল, অবস্থাটা কী বুঝত এবং যারা মেজাজটা বেঁধে দেয় সেই অর্বাচীনরা পরমেশ্বরের অজ্ঞেয় লীলা স্বীকার করে নিয়েছিল; অধিকন্তু এই জন্য যে তাদের ভাগ্য অভূতপূর্ব নয়: হল্‌স্টাইনের জনগণও ছিল বিদেশী, ড্যানিশ শাসনের অধীনে।

এমন সময়ে এল ফরাসী বিপ্লব। অ্যালসেস ও লোরেন জার্মানির কাছ থেকে যা পাওয়ার দুরাশাও কখনো করে নি, ফ্রান্স তাদের তা দিল উপহার হিসেবে। সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল চূর্ণ হল। ভূমিদাস, সামন্ততান্ত্রিক কৃষক হল মুক্ত মানুষ, বহু ক্ষেত্রে তার খামার ও খেতের মুক্ত মালিক। শহরে অভিজাত সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক শাসন এবং গিল্‌ডের বিশেষ সুবিধা দূর হল। উচ্চবংশজাত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় বহিষ্কৃত হল। ছোট ছোট নৃপতি ও প্রভুদের জমিতে কৃষকরা তাদের প্রতিবেশীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল এবং সার্বভৌম কর্তা, সরকারী কক্ষগুলির সদস্য ও সম্ভ্রান্তবংশীয়দের বহিষ্কৃত করে নিজেদের ঘোষণা করল স্বাধীন ফরাসী নাগরিক বলে। ফ্রান্সের অন্য কোনো অংশেই জনগণ জার্মানভাষী অংশের মতো এত উৎসাহ নিয়ে বিপ্লবে যোগ দেয় নি। আর এখন যখন জার্মান সাম্রাজ্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, জার্মানরা শুধু যে বশংবদভাবে তাদের শৃঙ্খল বহন করে চলছিল তাই নয়, তারা যখন ফরাসীদের উপরে জোর করে পুরনো দাসত্ব চাপিয়ে দেওয়ার কাজে এবং অ্যালসেসীয় কৃষকদের উপরে তাদের সদ্য-

বহিষ্কৃত সামন্ত প্রভুদের আবার চাপিয়ে দেওয়ার কাজে নিজেদের আরও একবার ব্যবহৃত হতেও দিল, তখন অ্যালসেস ও লোরেনের জনগণের জার্মানপ্রীতি একেবারেই শেষ হয়ে গেল, তখনই তারা জার্মানদের ঘৃণা ও অপছন্দ করতে শিখল; তখনই স্ট্রাসবুর্গে লেখা হল 'মার্সেইয়েজ' (৭৩), তাতে সুর দেওয়া হল আর সর্বপ্রথমে তা গাইল অ্যালসেসীয়রা, এবং জার্মান ফরাসীরা তাদের ভাষা ও অতীত সত্ত্বেও বিপ্লবের সপক্ষে সংগ্রামে শত শত রণক্ষেত্রে ফরাসীদের সঙ্গে লীন হয়ে একটি মাত্র জাতিতে পরিণত হল।

এই মহাবিপ্লব কি ডানকার্কের ফ্লেমিঙ, ব্রিতানির কেল্ট, কর্সিকার ইতালীয়দের ক্ষেত্রেও একই বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটায় নি? আর আমরা যদি অনুযোগ করি যে জার্মানদের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিল, তাহলে তা কি এটাই দেখায় না যে, আমাদের সমগ্র ইতিহাস আমরা বিস্মৃত হয়েছি, যে-ইতিহাসই এ-কাজকে সম্ভব করে তুলেছিল? আমরা কি ভুলে গিয়েছি যে রাইনের গোটা বাম তীর বিপ্লবে শুধু একটা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, কিন্তু ১৮১৪ সালে জার্মানরা যখন ঢুকে পড়ল, তখনও তা ফরাসীদের প্রতি অনুগত ছিল এবং ফরাসীদের প্রতিই অনুগত থেকে গিয়েছিল ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত, যখন বিপ্লবই রাইনের জনগণের চোখে জার্মানদের পুনর্বাসন ঘটিয়েছিল? আমরা কি ভুলে গিয়েছি যে ফরাসীদের সপক্ষে হাইনে-র উৎসাহ, এমন কি তাঁর বোনাপার্টপন্থাও রাইনের বাম তীরের জনসাধারণের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি মাত্র?

১৮১৪ সালে মিত্রপক্ষীয়রা যখন ঢুকল, তখন অ্যালসেস ও জার্মান লোরেনেই তারা সবচেয়ে দৃঢ়পণ বৈরি-তৎপরতার, একেবারে জনগণেরই তরফে কঠোরতম প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল; কারণ এখানে আবার জার্মান হবার বিপদটা অনুভূত হয়েছিল। অথচ সেই সময়ে, বলতে গেলে একমাত্র জার্মান ভাষাই সেখানে বলা হত। কিন্তু ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিপদ যখন কেটে গেল, জার্মান রোমান্টিক জাত্যভিমানীদের রাজ্যগ্রাস-লালসার যখন অবসান ঘটানো হল, তখন এই সচেতনতা বাড়ল যে ফ্রান্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর মিশ্রণ ভাষার ব্যাপারেও দরকার, এবং তখনই স্কুলগুলির ফরাসীকরণ প্রবর্তন করা হল, লুক্সেমবুর্গবাসীরা তাদের দেশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যা প্রবর্তন করেছিল তারই অনুরূপ। তা হলেও, রূপান্তরণ চলেছিল

অতি ধীরে; বুর্জোয়া শ্রেণীর একমাত্র বর্তমান প্রজন্ম সত্যিই ফরাসী-ধারালালিত, অথচ কৃষক ও শ্রমিকরা জার্মান ভাষায় কথা বলে। অবস্থাটা প্রায় লুক্সেমবুর্গেরই মতো: ফরাসী ভাষা সাহিত্যিক জার্মান ভাষাকে স্থানচ্যুত করেছে (অংশত ধর্মপ্রচারবেদী ছাড়া), কিন্তু জার্মান লোক-ভাষা স্থানচ্যুত হয়েছে একমাত্র ভাষাগত সীমান্তে এবং জার্মানির অধিকাংশ স্থানের তুলনায় তা অনেক বেশি মাত্রায় লৌকিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জাত্যভিমানসূচক রোমাণ্টিকতার পুনরুজ্জীবনে — মনে হয় সমস্ত জার্মান সমস্যার সঙ্গে এই রোমাণ্টিকতা অচ্ছেদ্য — মদত পাওয়া বিসমার্ক ও প্রুশীয় যুঙ্কাররা এই রকম একটি দেশকেই আবার জার্মান করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। 'মার্সেইয়েজের' জন্মভূমি স্ত্রাসবুর্গকে জার্মান করার ইচ্ছা গ্যারিবল্ডির স্বদেশভূমি নীস্‌কে ফরাসী করার মতোই অবাস্তব। কিন্তু নীসে, লুই নেপোলিয়ন অন্তত শোভনতা দেখিয়েছিলেন এবং অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি ভোটে দিয়েছিলেন — আর সেই চাল সফল হয়েছিল। প্রুশীয়রা এরূপ বৈপ্লবিক ব্যবস্থা যে উপযুক্ত কারণেই অপছন্দ করে তা উল্লেখ না করলেও চলে — কোথাও কখনও এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় নি যেখানে জনসাধারণ প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছে — কিন্তু একথা ভালো করেই জানা ছিল যে এখানেই সমগ্র জনসমষ্টি খাশ ফ্রান্সে জাত ফরাসীদের চাইতেও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে ফ্রান্সের সঙ্গে সংসক্ত ছিল। আর তাই এই যথেচ্ছ কাজটি সম্পন্ন করা হল পাশব বলপ্রয়োগে। তা ছিল ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কাজ: বিপ্লবেরই ফলে ফ্রান্সের সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়া অন্যতম একটি অঙ্গকে ছিঁড়ে নেওয়া হল।

একথা সত্যি যে সামরিক দিক দিয়ে এই অঞ্চল দখলের পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। মেৎস ও স্ত্রাসবুর্গ জার্মানিকে অত্যন্ত প্রবল এক প্রতিরক্ষা ব্যূহ যুগিয়েছিল। বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ড যতদিন নিরপেক্ষ থাকবে, ততদিন বিপুল আকারে এক ফরাসী আক্রমণাভিযান শুরু হতে পারে একমাত্র মেৎস ও ভোজ-এর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ভূখণ্ডে; আর তাছাড়া কবলেনৎস, মেৎস, স্ত্রাসবুর্গ ও মাইনৎস একসঙ্গে মিলে পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও বড় দুর্গ-চতুর্ভুজ। কিন্তু এই দুর্গ-চতুর্ভুজের অর্ধেকটা,

লম্বার্দিতে অস্ট্রীয় দুর্গগুলির মতোই*, রয়েছে শত্রু অঞ্চলে এবং সেখানে তা জনসমষ্টিকে বশে রাখার জন্য নগরদুর্গ হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, চতুর্ভুজটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য দরকার ছিল জার্মানভাষী সীমান্ত পেরিয়ে এলাকা দখল করা এবং সেই সঙ্গে উপরি-পাওনা হিসেবে আড়াই লাখের মতো দেশীয় ফরাসীকেও অধিকার করা।

এইভাবে, বিরাট রণনৈতিক সুবিধাই একমাত্র কারণ, যার দ্বারা এই রাজ্যদখলের যাথার্থ্য প্রমাণ করা যায়। কিন্তু, যে ক্ষতি তা করেছিল তার সঙ্গে এই লাভের কি কোনো মতে তুলনা করা চলে?

পশুবলই তার নির্দেশক নীতি — প্রকাশ্যে ও অকপটে এই কথা ঘোষণা করে তরুণ জার্মান সাম্রাজ্য নিজেকে যে বিরাট নৈতিক অসুবিধায় ফেলেছিল, প্রুশীয় য়ুঙ্কাররা তা গণ্য করতেই রাজী হয় নি। বরং বলপ্রয়োগে সংযত করে রাখা অবাধ্য প্রজা য়ুঙ্কারদের পক্ষে অত্যাবশ্যক; তারা প্রুশীয় পরাক্রমবৃদ্ধির প্রমাণ; এবং সারগতভাবে, য়ুঙ্কাররা কখনও অন্য কোনো ধরনের প্রজা পায়ও নি। কিন্তু রাজ্যদখলের রাজনৈতিক পরিণতি তারা গণ্য করতে বাধ্য হয়েছিল। এবং তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান ছিল। রাজ্যদখল কার্যকর হওয়ার আগেই মার্কস আন্তর্জাতিকের ভাষণে উচ্চকণ্ঠে এই দিকে পৃথিবীর মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিলেন: **'অ্যালসেস ও লোরেন দখল রাশিয়াকে ইউরোপের সালিস করে তোলে'**।** এবং রাইখস্টাগের মঞ্চ থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা বহুবার একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বিসমার্কও এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করেন তাঁর ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮ তারিখের রাইখস্টাগের বক্তৃতায়, যুদ্ধ ও শান্তির নিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান জারের সামনে তাঁর ফোঁপানির মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে, পরিস্থিতি ছিল দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ফ্রান্সের কাছ থেকে তার দুটি গোঁড়া দেশপ্রেমিক প্রদেশকে ছিন্ন করে নেওয়ার অর্থ, তাকে এমন কারো হাতে ঠেলে দেওয়া, যে সেগুলি ফিরিয়ে আনার আশা দিতে

---

* ভেরোনা, লেনাগো, মান্তুয়া ও পেসকেরা। — সম্পাঃ

** কার্ল মার্কস, 'ফ্রান্স-প্রাশিয়া যুদ্ধ প্রসঙ্গে মেহনতি মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় ভাষণ' (এই সংস্করণের ৭ম খণ্ডের ২৯-৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। — **সম্পাঃ**

পারবে, এবং তাকে চিরশত্রু করে তোলা। বিসমার্ক এ ব্যাপারে জার্মান কূপমণ্ডূকদের যোগ্য ও বিবেকী প্রতিনিধি, তিনি দাবি করলেন যে ফরাসীদের শুধু সংবিধানগতভাবেই নয়, নৈতিকভাবেও অ্যালসেস ও লোরেন পরিত্যাগ করতে হবে, এবং অধিকন্তু, বিপ্লবী ফ্রান্সের এই দুটি অংশ যে 'পুরনো পিতৃভূমির কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে' সে জন্য তিনি চাইলেন তারাও খুশী হোক, যদিও অবশ্য তারা এ কথায় কর্ণপাতই করতে চায় নি। দুর্ভাগ্যবশত, নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময়ে রাইনের বাম তীর জার্মানরা যেমন নৈতিকভাবে পরিত্যাগ করে নি, যদিও সেই অঞ্চলটির তাদের কাছে ফিরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনাও ছিল না, তেমনি ফরাসীরাও তা করছে না। যতদিন পর্যন্ত অ্যালসেস ও লোরেনের জনগণ ফ্রান্সের কাছে ফিরে যেতে চায়, ততদিন তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য সে অতি অবশ্যই প্রয়াস চালাবে এবং তা অর্জনের জন্য উপায় এবং সেই হেতু মিত্রেরও সন্ধান করবে। আর রাশিয়া হল জার্মানির বিরুদ্ধে তার স্বাভাবিক মিত্র।

পশ্চিম মহাদেশের বৃহত্তম ও সবচেয়ে পরাক্রান্ত জাতিগুলি যদি তাদের হানাহানিতে পরস্পরকে অক্রিয় করে দেয়, এমন কি যদি তাদের মধ্যে এমন এক চিরন্তন কলহের হেতু থাকে যা তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্ররোচনা দেয়, তাহলে সুবিধাটা শুধু রাশিয়ারই, কারণ তার হাত অনেক বেশি মুক্ত; রাশিয়া তার রাজ্যজয়ের প্রয়াসে জার্মানির কাছ থেকে তত কম বিঘ্নিত, যত বেশি করে সে ফ্রান্সের কাছ থেকে নিঃশর্ত সমর্থন আশা করতে পারে। আর বিসমার্কই কি ফ্রান্সকে সেই অবস্থায় এনে ফেলেন নি যেখানে তাকে রাশিয়ার মৈত্রী প্রার্থনা করতে হয়, রাশিয়া যদি ফ্রান্সের হৃত প্রদেশগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে ইচ্ছুকভাবেই রাশিয়ার কাছে কনস্টানটিনোপ্‌ল্‌কে ছেড়ে দিতে হয়? আর এসব সত্ত্বেও যদি সতেরো বছর ধরে শান্তি রক্ষিত হয়ে থাকে, তাহলে এছাড়া তার কি অন্য কারণ আছে যে ফ্রান্স ও রাশিয়ায় প্রবর্তিত আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণসংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বয়ঃগোষ্ঠীর লোক যোগাতে অন্তত ষোল বছর, এবং সাম্প্রতিক জার্মান উন্নতিবিধানের পর এমন কি পঁচিশ বছর দরকার? আর এখন যখন সতেরো বছর ধরে এই রাজ্যদখল সমস্ত ইউরোপীয় রাজনীতিতেই প্রাধান্য সম্পন্ন বিষয়, তখন সেটাই কি যে-সংকট মহাদেশকে যুদ্ধের বিপদে

বিপন্ন করে তুলছে তার প্রধান কারণ নয়? এই একটিমাত্র বিষয়কে অপসারিত করে দেখুন, শান্তি সুনিশ্চিত!

যে অ্যালসেসীয় বুর্জোয়া দক্ষিণ জার্মান বাচনভঙ্গিতে ফরাসী বলে, যে দো-আঁশলা অলীকবাবু ফ্রান্সের দেশীয় ফরাসীর মতো তার ফরাসী আদবকায়দা জাহির করে বেড়ায়, যে গ্যেটেকে হেয়জ্ঞান করে কিন্তু রাসিন সম্পর্কে অত্যুৎসাহী, জার্মান কুলোদ্ভব হওয়ার জন্য যে এখনও তার গোপন বিবেকদংশন কাটিয়ে উঠতে পারে নি এবং ঠিক সেই কারণেই যাকে জার্মান সব কিছুকেই তাচ্ছিল্য করতে হয়, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকাও যাকে মানায় না, সেই অ্যালসেসীয় বুর্জোয়া সত্যিই এক ঘৃণ্য জীব, তা সে মুলহাউজেনের শিল্পপতি, অথবা প্যারিসের সাংবাদিক যাই হোক না-কেন। কিন্তু জার্মানির গত তিনশো বছরের ইতিহাসই কি তাকে সে যা তাই করে তোলে নি? আর অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্তও কি বিদেশে প্রায় সমস্ত জার্মান, বিশেষ করে বণিকরা, খাঁটি অ্যালসেসীয়রা তাদের জার্মান বংশপরিচয় অস্বীকার করে নি, তাদের নতুন বাসভূমিতে পরের জাতিসত্তা গ্রহণ করার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস করে নি এবং এইভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের অ্যালসেসীয়দের চাইতে কি কোনো অংশে কম হাস্যাস্পদ করেছে? অ্যালসেসীয়রা অন্তত পরিস্থিতির দরুন তা করতে অল্পবিস্তর বাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডে, ১৮১৫ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে দেশত্যাগ করে আসা সমস্ত জার্মান ব্যবসায়ীই ইংরেজদের রীতিনীতি আত্মস্থ করে তাদের অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল, নিজেদের মধ্যে প্রায় একান্তভাবেই ইংরেজিতে কথাবার্তা বলত, এবং এমন কি আজও, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ম্যাঞ্চেস্টার স্টক এক্সচেঞ্জে কিছু বৃদ্ধ জার্মান অর্বাচীন ঘোরাফেরা করে যারা খাঁটি ইংরেজ হিসেবে পরিগণিত হলে তাদের অর্ধেক সম্পদ দিয়ে দিতে রাজী। কিন্তু ১৮৪৮ সালের পরে একটা পরিবর্তন শুরু হয়, এবং ১৮৭০ সাল থেকে, যখন এমন কি সংরক্ষিত বাহিনীর লেফটেনান্টরাও ইংলন্ডে আসে এবং বার্লিন সেখানে তার ছোট বাহিনীগুলিকে পাঠায়, তখন পূর্বতন বশংবদতাকে স্থানচ্যুত করছে প্রুশীয় ঔদ্ধত্য, বিদেশে সেটাও আমাদের কম হাস্যাস্পদ করে তোলে না।

হয়তো ১৮৭১ সালের পর থেকে জার্মানির সঙ্গে মিলন

অ্যালসেসীয়দের কাছে বেশি আকর্ষক হয়ে উঠেছে? বরং, তার বিপরীত। তাদের রাখা হয়েছে একনায়কতন্ত্রের অধীনে, অথচ বাড়ির পাশেই, ফ্রান্সে ছিল প্রজাতন্ত্র। বিচারবুদ্ধিহীন ও অন্যায়ভাবে চাপানো এক প্রুশীয় ল্যান্ডরয়াট-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, যার তুলনায় কঠোর আইনে নিয়ন্ত্রিত, কুখ্যাত ফরাসী প্রিফেক্ট প্রথার হস্তক্ষেপ তো আশীর্বাদ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সমিতির স্বাধীনতার শেষ যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তারও দ্রুত অবসান ঘটানো হয়েছে, বিদ্রোহী নগর-পরিষদগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং জার্মান আমলাদের মেয়র নিযুক্ত করা হয়েছে। অন্য দিকে কিন্তু, 'উল্লেখযোগ্যদের' অর্থাৎ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফরাসী-হয়ে-যাওয়া উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বুর্জোয়াদের তোষামোদ চলেছে, এবং কৃষক ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে তাদের শোষক-স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে; অথচ এই কৃষক ও শ্রমিকরা জার্মানি সম্পর্কে খুব একটা ভালো মনোভাব পোষণ না-করলেও অন্তত জার্মানভাষী ছিল, এবং তারাই ছিল একমাত্র শক্তি যাদের সঙ্গে মিলনের চেষ্টা করা সম্ভব ছিল। এর ফল হয়েছে কী? ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭তে, সারা জার্মানি যখন নিজেকে ভীতিবিহ্বল হতে দিয়েছে এবং রাইখস্টাগে বিসমার্ক কার্টেল-এর (৭৪) সংখ্যাগরিষ্ঠতা করে দিয়েছে, তখন অ্যালসেস আর লোরেন নির্বাচিত করেছে শুধু একনিষ্ঠ ফরাসীদের এবং জার্মানদের প্রতি যাদের সামান্যতম সহানুভূতি আছে বলে সন্দেহ করা যায় এমন প্রত্যেককেই বাতিল করেছে।

কিন্তু, অ্যালসেসীয়রা আজ যে-অবস্থায় এসেছে, তা নিয়ে আমাদের ক্রুদ্ধ হওয়ার কি অধিকার আছে? আদৌ না। অন্তর্ভুক্তির প্রতি তাদের বিরোধিতা ঐতিহাসিক সত্য, যার নিন্দা না করে ব্যাখ্যা করা উচিত। এবং আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করার সময় এসেছে: অ্যালসেসে এরূপ মনোভাব সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারার আগে কত অসংখ্য, কত বিরাট অন্যায়-অপরাধই না জার্মানি করেছে? এবং, পুনঃ-জার্মানীকরণ প্রচেষ্টার সতেরো বছর পর অ্যালসেসীয়রা যদি একবাক্যে বলে: এ থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দাও, তাহলে বাইরে থেকে আমাদের নতুন জার্মান সাম্রাজ্যের চেহারা কিরকম দেখাবে? আমাদের কি এ কথা কল্পনা করার অধিকার আছে যে দুটি সৌভাগ্যপূর্ণ অভিযান আর বিসমার্কের সতেরো বছরের একনায়কতন্ত্র তিনশো বছরের কলঙ্ককর ইতিহাসের ফলাফল দূর করার পক্ষে যথেষ্ট?

বিসমার্ক তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন। ভার্সাইতে চতুর্দশ লুইয়ের জমকালো রাষ্ট্রীয় কক্ষে তাঁর নতুন প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্য সাধারণ্যে ঘোষিত হয়েছে (৭৫)। অসহায় ফ্রান্স তাঁর পদতলে শায়িত; যাকে তিনি নিজে স্পর্শ করার দুঃসাহস করেন নি সেই অবাধ্য প্যারিসকে তিয়েরে প্ররোচিত করেছেন কমিউন অভ্যুত্থানে এবং তারপর বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা প্রাক্তন রাজকীয় সেনাবাহিনীর সৈনিকরা তাকে দমন করেছে। সমস্ত ইউরোপীয় অর্বাচীনরা পঞ্চাশের দশকে বিসমার্কের আদিরূপ লুই নেপোলিয়নকে যেমন ভক্তি করত, তেমন ভক্তি করতে লাগল বিসমার্ককে। রাশিয়ার সাহায্যে জার্মানি হয়ে উঠল ইউরোপের প্রথম শক্তি, আর জার্মানির সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল একনায়ক বিসমার্কের হাতে। সেই ক্ষমতা দিয়ে তিনি কী করতে পারেন, সব কিছু এখন নির্ভর করছিল তার উপরে। এতদিন তিনি যদি বুর্জোয়া শ্রেণীর একীকরণের পরিকল্পনা বুর্জোয়া পদ্ধতিতে না-হোক, বোনাপার্টীয় পদ্ধতিতেও রূপায়িত করে থাকেন, তাহলে সে কাজ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এখন তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা করা দরকার, দেখানো দরকার তাঁর মাথা থেকে কী চিন্তা বেরোতে পারে, এবং স্পষ্টতই নতুন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক গঠনে তার অভিব্যক্তি থাকা দরকার।

জার্মান সমাজ বৃহৎ ভূস্বামী, কৃষক, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত; এদের আবার তিনটি প্রধান প্রধান শ্রেণীতে গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়।

বৃহৎ ভূসম্পত্তির মালিক হল সামান্য কয়েকজন ধনপতি (বিশেষ করে সাইলেসিয়ায়) এবং এক বৃহৎ সংখ্যক মাঝারি ভূস্বামী, বেশির ভাগই এল্‌ব্‌-এর পূর্বদিকের পুরনো প্রুশীয় প্রদেশগুলিতে। এই সব প্রুশীয় য়ুঙকাররাই সমগ্র শ্রেণীর উপরে অল্পবিস্তর আধিপত্য করে। এরা নিজেরা জোতদার-চাষী, এই জন্য যে তাদের অনেকেই তাদের জোতজমির চাষের ভার ন্যস্ত করে ম্যানেজারদের উপরে এবং এ ছাড়াও তারা প্রায়শই ব্র্যান্ডি ডিস্টিলারি ও বীট-চিনি শোধনাগারের মালিক। যেখানেই সম্ভব, তাদের ভূসম্পত্তি পরিবারে বর্তায় জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারলাভের বিধি অনুযায়ী। কনিষ্ঠতর পুত্ররা সেনাবাহিনী অথবা উচ্চপদের অসামরিক সরকারী কাজে যোগ দেয়, যার ফলে অফিসার ও উচ্চপদস্থ অসামরিক রাজকর্মচারীদের

নিয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত কম সম্পদশালী এক ক্ষুদে অভিজাততন্ত্র এই ছোট ভূম্যধিকারী ভদ্রসমাজের সঙ্গে সংসক্ত থাকে এবং তদুপরি বুর্জোয়া বংশোদ্ভূত উচ্চপদস্থ অফিসার ও রাজকর্মচারীদের মধ্য থেকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যাপক পদোন্নতির মধ্য দিয়ে তা পরিপুষ্ট হয়। স্বভাবতই সম্ভ্রান্তজনদের এই সমস্ত চক্রের নিচের প্রান্তে এক সংখ্যাবহুল পরাশ্রিত সম্ভ্রান্তসমাজ, এই সম্ভ্রান্ত ছন্নছাড়া প্রলেতারিয়েত (লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত) আত্মপ্রকাশ করে, তা বেঁচে থাকে ঋণ, সন্দেহজনক জুয়াখেলা, নাছোড়বান্দা ভিক্ষাবৃত্তি এবং রাজনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তির উপরে। এই সমাজের সামগ্রিকতাই হল প্রুশীয় যুঙ্কারতন্ত্র এবং পুরনো প্রুশীয় রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। অবশ্য, যুঙ্কারতন্ত্রের ভূম্যধিকারী মূলকেন্দ্রটিরই ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। তার মানমর্যাদার উপযুক্ত রূপে বেঁচে থাকার কর্তব্য প্রতিদিন আরও বেশি ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে; লেফটেন্যান্ট ও অ্যাসেসর পর্যায়ে কনিষ্ঠতর পুত্রসন্তানদের ব্যয়নির্বাহ, মেয়েদের বিয়ে দেওয়া — এ সবেতেই অর্থ প্রয়োজন; এবং যেহেতু এসবই এমন কর্তব্য, অন্য সমস্ত বিবেচনাকে যা পিছনে সরিয়ে দেয়, সেই জন্য এতে অবাক হবার কিছু নেই যে আয় অপ্রতুল হয়ে যায়, প্রত্যর্থী পত্র স্বাক্ষর করতে হয়, কিংবা বন্ধক দেওয়া পর্যন্ত দরকার হয়। সংক্ষেপে, সমগ্র যুঙ্কারতন্ত্র সবসময়েই দাঁড়িয়ে আছে এক অতল গহ্বরের কিনারায়; প্রতিটি দুর্ঘটনা — যুদ্ধই হোক, মন্দ ফসলই হোক অথবা বাণিজ্য সংকটই হোক — তাকে সেই কিনারা থেকে ঠেলে ফেলার বিপদের সম্মুখীন করে; সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে শতাধিক বছর ধরে সে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে একমাত্র সবধরনের রাষ্ট্রীয় সহায়তায় এবং, বস্তুতপক্ষে, এখনও টিকে আছে একমাত্র সেই সহায়তারই কল্যাণে। কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত এই শ্রেণীটির বিলুপ্তি অনিবার্য, কোনো রাষ্ট্রীয় সহায়তাই আর বেশি দিন এর অস্তিত্ব টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু তার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাবে পুরনো প্রুশীয় রাষ্ট্রও।

কৃষক এমন এক শক্তি যে রাজনৈতিকভাবে সামান্যই সক্রিয়। যেখানে সে নিজেই একজন মালিক, ছোট কৃষকদের প্রতিকূল উৎপাদনের অবস্থার দরুন সে তত বেশি করে ধ্বংসের দিকে চলেছে; পুরনো মার্ক অথবা সম্প্রদায়গত চারণভূমি থেকে বঞ্চিত হয়ে কৃষকরা পশুপালন-প্রজননে ব্যাপৃত

হতে পারে না। প্রজা হিসেবে তার অবস্থা আরও খারাপ। ছোট কৃষকদের উৎপাদনব্যবস্থায় প্রধানত স্বাভাবিক অর্থনীতির প্রাধান্যই পূর্বানুমিত, মুদ্রা অর্থনীতি তার সর্বনাশ করে। তাই, ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততা, বন্ধকের দরুন ব্যাপক দখলচ্যুতি, গার্হস্থ্য-শিল্পের আশ্রয় গ্রহণ, যাতে তার ভিটাজমি থেকে উচ্ছেদ হতে না-হয়। রাজনৈতিকভাবে কৃষকসমাজ প্রধানত উদাসীন অথবা প্রতিক্রিয়াশীল: রাইন অঞ্চলে প্রুশীয়দের প্রতি পুরনো ঘৃণার দরুন তারা পোপের অপ্রতিহত ক্ষমতায় বিশ্বাসী; অন্যান্য অঞ্চলে তারা বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি একান্ত অনুগত অথবা প্রটেস্ট্যান্ট-রক্ষণশীল। এখনও ধর্মীয় মনোভাব এই শ্রেণীর সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বার্থের অভিব্যক্তি হিসেবে কাজ করে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর কথা আমরা আগেই বলেছি। ১৮৪৮ সাল থেকে তারা অভূতপূর্ব হারে অর্থনৈতিক অগ্রগতি করেছে। ১৮৪৭-এর বাণিজ্য সংকটের পর শিল্পের বিপুল সম্প্রসারণে জার্মানি ক্রমেই বেশি করে অংশগ্রহণ করেছে, এই সম্প্রসারণ ঘটেছিল সেই সময়ে সমুদ্রপথে বাষ্পীয় জাহাজ-চলাচল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দরুন, রেলপথের বিরাট বিস্তৃতি এবং কালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় সোনা আবিষ্কারের দরুন। ছোট ছোট রাষ্ট্রের প্রথা থাকার ফলে বাণিজ্যের পক্ষে যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য এবং পৃথিবীর বাজারে বিদেশী প্রতিযোগীদের সমান অবস্থান পাওয়ার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐকান্তিক প্রয়াসই বিসমার্কের বিপ্লবে প্রেরণা যুগিয়েছিল। এখন যখন লক্ষ লক্ষ ফরাসী মুদ্রা জার্মানিকে ছেয়ে ফেলছিল, বুর্জোয়া শ্রেণীর সামনে উন্মুক্ত হল প্রচণ্ড উদ্যোগের এক কালপর্ব, এই কালপর্বে জার্মানি — জাতীয় জার্মান স্তরে এক বিরাট সংকটের মধ্য দিয়ে (৭৬) — সর্বপ্রথম প্রমাণ করল যে সে এক বৃহৎ শিল্পোন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণী তখনও ছিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জনসমষ্টির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী শ্রেণী, তার অর্থনৈতিক স্বার্থ রাষ্ট্রকে মেনে চলতে হত; ১৮৪৮ সালের বিপ্লব রাষ্ট্রকে দিয়েছিল বাহ্যিকভাবে সাংবিধানিক রূপ, যার কাঠামোর মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিকভাবেও শাসন করতে পারত এবং তার আধিপত্য বাড়াতে পারত। অথচ প্রকৃত রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে তখনও তারা ছিল বহুদূর। বিরোধে তারা বিসমার্কের

বিরুদ্ধে জয়ী হয় নি; উপর থেকে জার্মানির বৈপ্লবিকীকরণের মধ্য দিয়ে বিরোধের মীমাংসা তাদের এই শিক্ষাও দিয়েছিল যে, আপাতত, কার্যনির্বাহী ক্ষমতা তার উপরে নির্ভর করে বড়জোর অতি পরোক্ষ রূপে, তারা মন্ত্রীদের নিযুক্তও করতে পারবে না, বরখাস্তও না, কিংবা সেনাবাহিনীকেও বাদ দিতে পারবে না। তদুপরি, প্রবলভাবে সক্রিয় এক কার্যনির্বাহী ক্ষমতার সামনে তারা ছিল ভীরু ও দুর্বল; কিন্তু য়ুঙ্কাররাও তাই ছিল, যদিও বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা অধিকতর মার্জনাযোগ্য, কারণ তারা ছিল বিপ্লবী শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক বিরোধিতায়। এবিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ ছিল না যে তাদের ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিকভাবে য়ুঙ্কারদের ধ্বংস করতেই হবে, এবং তারাই একমাত্র সম্পত্তিবান শ্রেণী যারা তখনও কিছুটা ভবিষ্যতের দাবি করতে পারত।

পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীতে ছিল প্রথমত, মধ্যযুগীয় কারিগরদের অবশিষ্টাংশ, পশ্চিম ইউরোপের বাকি অংশের তুলনায় পশ্চাৎপদ জার্মানিতে যাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অনেক বেশি মাত্রায়; দ্বিতীয়ত, সহায়সম্বলহীন বুর্জোয়া; এবং তৃতীয়ত, অ-সম্পত্তিবান জনসমষ্টির মধ্যে যারা ছোট বণিক-ব্যবসায়ীর স্তরে উঠেছে। বৃহদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের সঙ্গে সমগ্র পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব স্থিতিশীলতার শেষ চিহ্নটুকুও হারাল; বৃত্তি পরিবর্তন এবং পর্যায়ক্রমিক দেউলিয়াপনা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল। আগে যে শ্রেণী এত স্থিতিশীল ছিল, যে শ্রেণী ছিল জার্মান কূপমণ্ডূক পণ্ডিতম্মন্যদের প্রাণকেন্দ্র, সেই শ্রেণী তার পরিতৃপ্তি, বশংবদতা, ধর্মনিষ্ঠা ও ভদ্রতা থেকে পতিত হল প্রচণ্ড অবক্ষয় আর তার ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ভাগ্যলিপি সম্বন্ধে অসন্তোষের মধ্যে। হস্তশিল্প-কারিগরদের অবশিষ্টাংশ উচ্চকণ্ঠে গিল্‌ডের বিশেষ সুবিধা পুনঃপ্রবর্তন দাবি করল, কেউ বা মৃদু গণতান্ত্রিক প্রগতিবাদী (৭৭) হয়ে গেল, এমন কি কেউ কেউ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের শরণাপন্ন হল এবং এখানে-ওখানে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে যোগ দিল।

সবশেষে, শ্রমিক। কৃষি শ্রমিকরা, অন্তত পূর্বাঞ্চলের, তখনও বাস করছিল আধা-ভূমিদাস অবস্থায়, সুতরাং তাদের গণ্য করা যেত না। অন্য দিকে, শহুরে শ্রমিকদের মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বিরাট অগ্রগতি হয়েছিল এবং বৃহদায়তন শিল্প জনসাধারণকে যেমন প্রলেতারীয় করে তুলছিল এবং

পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ তীব্র করছিল, সোশ্যাল ডেমোক্রাসির বৃদ্ধি হচ্ছিল তারই সমান মাত্রায়। যদিও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিকরা তখনকার মতো পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামরত দুটি পার্টিতে (৭৮) বিভক্ত ছিল, তবুও, মার্কসের 'পুঁজি' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে, তাদের মধ্যেকার মৌলিক মতপার্থক্য প্রায় দূরই হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। গোঁড়া লাসালবাদ সেই সঙ্গে 'রাষ্ট্র কর্তৃক সাহায্য-প্রদত্ত উৎপাদক সমিতির' জন্য তার দাবি ক্রমে ক্রমে ম্রিয়মাণ হয়ে আসছিল এবং দেখা গেল তা একটি বোনাপার্টপন্থী রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির প্রাণকেন্দ্র গঠনে নিতান্তই অপারগ। এ ব্যাপারে এক-একজন নেতা যে ক্ষতি করেছিলেন, জনসাধারণের কান্ডজ্ঞানই তা সংশোধন করে দিয়েছে। দুটি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রবণতার যে-মিলন প্রায় একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ধরনের প্রশ্নের দরুন বিলম্বিত হয়েছিল, নিকট ভবিষ্যতে সেই মিলন অবশ্যই ঘটতে চলেছিল। কিন্তু এমন কি এই ভাগাভাগির সময়ে এবং তা সত্ত্বেও, শিল্প-বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি এবং সরকারের বিরুদ্ধে — সরকার তখনও বুর্জোয়াদের থেকে স্বতন্ত্র — সংগ্রামে তাদের পঙ্গু করে দেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এই আন্দোলন; এবং ১৮৪৮ সালের পর জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী আর কখনোই লাল জুজুর ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

পার্লামেণ্টে ও ল্যান্ডটাগগুলিতে পার্টিগত কাঠামোর মূলে নিহিত ছিল শ্রেণীগত কাঠামো। বৃহৎ ভূসম্পত্তি ও কৃষকসমাজের একাংশকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল রক্ষণশীলদের গোষ্ঠী; শিল্পভিত্তিক বুর্জোয়া শ্রেণী দিয়েছিল বুর্জোয়া উদারপন্থীদের দক্ষিণপন্থী অংশ — জাতীয় উদারপন্থীদের, আর বামপন্থী অংশটি ছিল দুর্বল গণতান্ত্রিক বা তথাকথিত প্রগতিশীল পার্টি, যার মধ্যে ছিল বুর্জোয়াদের ও শ্রমিকদের একাংশের সমর্থিত পেটি বুর্জোয়ারা। শেষ পর্যন্ত, শ্রমিকরা নিজেদের স্বতন্ত্র পার্টি পেল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে, এর মধ্যে কিছু পেটি বুর্জোয়াও ছিল।

বিসমার্কের মতো অবস্থায় এবং বিসমার্কের মতো অতীতের অধিকারী, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা বোধসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তিই এই বিষয়টি উপলব্ধি না করে পারতেন না যে তখনকার য়ুংকাররা টিকে থাকার

ক্ষমতাবিশিষ্ট শ্রেণী নয়, সমস্ত সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে একমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীই ভবিষ্যৎ দাবি করতে পারে (শ্রমিক শ্রেণীর কথা বাদ দিলাম, কারণ তার ঐতিহাসিক ব্রত সম্পর্কে বোধ তাঁর কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না), সুতরাং, তাঁর নতুন সাম্রাজ্যের একটি আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রে ক্রমান্বিত উত্তরণের প্রস্তুতিতে তিনি যত বেশি সফল হতেন, তাঁর নতুন সাম্রাজ্য তত স্থিতিশীল হতে পারত। সেই পরিস্থিতিতে যা অসম্ভব ছিল তা যেন আমরা তাঁর কাছে প্রত্যাশা না-করি। অবিলম্বে এক পার্লামেণ্টারি সরকারে উত্তরণ, যেখানে নিয়ামক ক্ষমতা রাইখস্টাগে ন্যস্ত (ব্রিটিশ কমন্স সভার মতো), তা সেই মুহূর্তে সম্ভাব্যও ছিল না, যুক্তিযুক্তও ছিল না; পার্লামেণ্টারি ধরনে বিসমার্কের একনায়কতন্ত্র নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আপাতত তখনও প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল; তখনকার মতো তা থাকতে দিয়েছেন বলে আমরা তাঁকে বিন্দুমাত্র দোষ দিই না; আমরা শুধু জিজ্ঞাসা করি, কোন উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করার কথা ছিল। এবিষয়ে বড় একটা সন্দেহ থাকতে পারে না যে ব্রিটিশ সংবিধানের অনুরূপ এক ব্যবস্থার জন্য পথ প্রস্তুত করাই ছিল একমাত্র উপায় যা নতুন সাম্রাজ্যের এবং নির্ঝঞ্ঝাট আভ্যন্তরিক বিকাশের দৃঢ় ভিত্তি যোগাতে পারত। য়ুঙ্কারদের পরিত্রাণের কোনোই উপায় ছিল না, তাদের বৃহত্তর অংশটিকে অনিবার্য বিনাশের হাতে ছেড়ে দিয়ে, যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তার সঙ্গে নতুন উপাদান যোগ করে স্বতন্ত্র বৃহৎ ভূস্বামীদের একটি শ্রেণীতে পরিণত করা তখনও হয়তো সম্ভব ছিল; এরা হত বুর্জোয়া শ্রেণীর অলঙ্কারস্বরূপ উপর-মহল; এই শ্রেণীকে, বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতার তুঙ্গে থাকলেও সরকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্ব দিতে হত এবং তার সঙ্গে দিতে হত সবচেয়ে মোটা মাইনের পদগুলি এবং প্রভূত প্রভাব। বুর্জোয়া শ্রেণীকে কিছু রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দিয়ে — কোনোমতেই বেশি দিন তা ঠেকিয়ে রাখা যেত না (অন্তত, সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিটা এরকমই হওয়া উচিত), তাদের এই সুবিধাগুলি ক্রমে ক্রমে, এমন কি ছোট ছোট ও দুর্লভ মাত্রায় দিয়ে নতুন সাম্রাজ্য এমন পথে চালিত হত যার ফলে সে অন্যান্য, রাজনৈতিকভাবে অনেক অগ্রসর পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে ধরে ফেলতে সক্ষম হত, আমলাতন্ত্রের উপরে তখনও যার কব্জা ছিল সেই কূপমণ্ডূক ঐতিহ্য এবং সামন্ততন্ত্রের

সর্বশেষ জের ঝেড়ে ফেলতে পারত, এবং সর্বোপরি, বর্তমানে যৌবনকালোত্তীর্ণ তার নেতারা এই জীবন ত্যাগ করে চলে যাওয়ার মধ্যেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হত।

এ কাজ দুরূহও ছিল না। য়ুঙ্কার বা বুর্জোয়া শ্রেণী কারোই এমন কি সাধারণ, গড়পড়তা কর্মশক্তি ছিল না। য়ুঙ্কাররা তা প্রমাণ করেছে গত ষাট বছরে, এই সময়ে এই ডন্ কুইক্সোটদের (৭৯) বিরোধিতা সত্ত্বেও রাষ্ট্র তাদের জন্য যা সবচেয়ে ভালো ক্রমাগত তা করেছে। দীর্ঘ প্রাক-ইতিহাস যাকে কিছুটা নমনীয় করেছে সেই বুর্জোয়া শ্রেণী তখনও বিরোধজনিত ক্ষতগুলি লেহন করছিল; তখন থেকে বিসমার্কের সাফল্য তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও ভেঙে দিয়েছিল, আর বাকিটা করেছিল ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে-ওঠা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ভীতি। এমতাবস্থায়, যে ব্যক্তি বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করেছিলেন তাঁর পক্ষে তাদের রাজনৈতিক দাবিগুলি রূপায়ণের কাজে তাঁর ইচ্ছামতো গতি বজায় রাখা কঠিন হত না, দাবিগুলি মোটের উপরে ছিল সামান্য। তাঁর পক্ষে দরকার ছিল শুধু লক্ষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছদৃষ্টি থাকা।

সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ছিল একমাত্র যুক্তিযুক্ত পথ। শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে একথা সুস্পষ্ট ছিল যে স্থায়ী বুর্জোয়া

শাসন কায়েম করার পক্ষে ইতিমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে
বৃহদায়তন শিল্প এবং তার সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণী ও
হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন প্রলেতারিয়েত প্রায় ব
সঙ্গেই স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে প্র
অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী একান্ত অথবা প্রাধান্যপূর্ণ
অধিকার করার আগেই যখন দুটি শ্রেণীর সংগ্রাম শ
বুর্জোয়া শ্রেণীর নিরুপদ্রব ও দৃঢ় শাসনের সময় যদি
হয়ে গিয়েও থাকে, তাহলেও সাধারণভাবে সম্পত্তিবান
১৮৭০ সালে শ্রেষ্ঠ নীতি ছিল এই বুর্জোয়া শাস
অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্রের আমলের যে-অজস্র জের আইনে
বহালতবিয়তে টিকে ছিল, একমাত্র এভাবেই সেগুলি
ছিল; একমাত্র এভাবেই সম্ভব ছিল ফরাসী মহাবিপ্ল

গেছে। জার্মানিতে
প্রলেতারিয়েত তৈরি
র্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে
বেশ করতে পারত,
রাজনৈতিক ক্ষমতা
রু হয়েছিল। কিন্তু
জার্মানিতে উত্তীর্ণ
শ্রেণীগুলির স্বার্থে,
নর দিকেই যাওয়া।
ও প্রশাসনে তখনও
উচ্ছেদ করা সম্ভব
বর সমস্ত সুকৃতিকে

ক্রমে ক্রমে জার্মানিতে প্রতিরোপণ করা, সংক্ষেপে, তার অতিরিক্ত লম্বা পুরনো কায়দার বেণী কেটে ফেলে আধুনিক বিকাশের পথে সুপরিকল্পিতভাবে ও অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থাপন করা, তার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তার শিল্পবিকাশের অনুষঙ্গী করে তোলা। শেষ পর্যন্ত যখন বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে অনিবার্য লড়াই বাধবে, তখন তা অন্তত স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অগ্রসর হবে, তাতে সবাই উপলব্ধি করবে বিষয়টা কী, ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে আমরা যেমন দেখেছিলাম সেই রকম বিশৃঙখলা, অস্পষ্টতা, পরস্পরবিরোধী স্বার্থ আর কিংকর্তব্যবিহ্বলতার অবস্থায় তা এগোবে না। একমাত্র পার্থক্য থাকবে এই যে এবারে কিংকর্তব্যবিহ্বলতা থাকবে একান্তভাবেই সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির তরফে; শ্রমিক শ্রেণী জানে সে কী চায়।

১৮৭১ সালে জার্মানিতে যে অবস্থা ছিল, বিসমার্কের মতো ব্যক্তি বস্তুতই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সুকৌশলে চলার নীতির উপরে নির্ভরশীল ছিলেন। এবং এ পর্যন্ত তিনি নিন্দনীয় নন। শুধু প্রশ্ন হল, সেই নীতি কোন লক্ষ্য অনুসরণ করেছিল। তার গতি যাই হোক না-কেন যদি তার সচেতন ও দৃঢ়পণ অভীষ্ট শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন হয়ে থাকে, তাহলে তা ছিল ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ততদূর পর্যন্তই যতদূর সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির অবস্থান থেকে সাধারণভাবে সম্ভব ছিল। তার লক্ষ্য যদি শুধু পুরনো প্রুশীয় রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা, ক্রমে ক্রমে জার্মানিকে প্রুশীয় করে ফেলা হয়ে থাকে, তাহলে তা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কিন্তু তার লক্ষ্য যদি শুধু বিসমার্কের শাসন বজায় রাখা হয়ে থাকে, তাহলে তা ছিল বোনাপার্টপন্থী এবং সব বোনাপার্টপন্থার যা পরিণতি, তারও সেই পরিণতি অবধারিত ছিল।

* * *

আশু কাজ ছিল সাম্রাজ্যিক সংবিধান। লভ্য উপকরণের মধ্যে ছিল, এক দিকে, উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান এবং অন্য দিকে দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তিসমূহ (৮০)। সাম্রাজ্যিক সংবিধান প্রণয়নে বিসমার্ককে সাহায্য করার মতো বিষয়গুলি ছিল, এক দিকে. ফেডারেল

পরিষদে (বুন্ডেসরাট) প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত রাজবংশগুলি, এবং অন্য দিকে, রাইখস্টাগে প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত জনগণ। উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান ও চুক্তিগুলি রাজবংশগুলির দাবিকে সীমিত করেছিল। অন্য দিকে, নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ অনেকখানি বৃদ্ধি জনগণের প্রাপ্য ছিল। তারা রণক্ষেত্রে বিদেশী হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীনতা এবং একীকরণ — যতদূর একীকরণের কথা বলতে পারে — অর্জন করেছিল; সর্বোপরি তাদেরই উপরে পড়েছিল এই স্বাধীনতাকে কোন কাজে লাগানো হবে, এই একীকরণ বিশদভাবে কী করে রূপায়িত করা হবে এবং কীভাবে তা ব্যবহার করা হবে তা স্থির করার ভার। এবং উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান ও চুক্তিগুলির অন্তর্নিহিত আইনগত যুক্তিগুলি জনগণ স্বীকার করলেও, পুরনো সংবিধানের তুলনায় নতুন সংবিধানে তাদের অধিকতর ক্ষমতার ভাগ পাওয়া থেকে তা তাদের কোনোমতেই প্রতিনিবৃত্ত করে নি। রাইখস্টাগই ছিল একমাত্র সংস্থা যা বাস্তবিকই এই নতুন 'ঐক্যের' প্রতিভূ ছিল। রাইখস্টাগের বক্তব্যের ক্ষমতা যত বেশি হত এবং এক-একটি প্রদেশের সংবিধানের তুলনায় সাম্রাজ্যিক সংবিধান যত মুক্ত হত, নতুন রাইখকে তত বেশি সংহত হতে হত, ব্যাভেরীয়, স্যাক্সন ও প্রুশীয় তত বেশি করে জার্মান-এ মিশে যেত।

নিজের নাসাগ্র ছাড়িয়েও যিনি দেখতে পান এমন যেকোনো ব্যক্তির কাছেই একথা স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিসমার্ক ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি বরং যুদ্ধের পরের দেশপ্রেমিক উন্মাদনাকে ব্যবহার করলেন যাতে রাইখস্টাগে সংখ্যাগরিষ্ঠরা জনগণের অধিকার প্রসারের কথাই শুধু বর্জন নয়, সেই অধিকারের সুস্পষ্ট সংজ্ঞাও পরিত্যাগ করতে রাজী হন এবং উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান ও চুক্তিগুলির অন্তর্নিহিত আইনগত ভিত্তি সাম্রাজ্যিক সংবিধানে শুধু পুনরুদ্ধৃত করার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে রাজী হন। তাতে জনগণের অধিকার ব্যক্ত করার জন্য ছোট পার্টিগুলির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল, এমন কি প্রুশীয় সংবিধানের যেসব ধারায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সমিতির অধিকার এবং গীর্জার স্বাধীনতার নিশ্চিতি দেওয়া আছে, সংবিধানে সেই ধারাগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ক্যাথলিক কেন্দ্রের প্রস্তাবও ব্যর্থ হল। সাম্রাজ্যিক

সংবিধানের চাইতে প্রুশীয় সংবিধান, দু-তিন বার কাটছাঁট করা হলেও, অনেক বেশি উদার ছিল। করের বিষয়টি ভোটে পাস করা হল বাৎসরিকভাবে নয়, 'আইনত' চিরতরে, যার ফলে রাইখস্টাগের পক্ষে কর বাতিল করা অসম্ভব হয়ে গেল। এইভাবে জার্মানিতে প্রযুক্ত হল প্রুশীয় তত্ত্ব, অ-জার্মান সাংবিধানিক পৃথিবীতে যা অকল্পনীয়, যে-তত্ত্ব অনুযায়ী জনগণের প্রতিনিধিদের ব্যয় নামঞ্জুর করার অধিকার ছিল কাগজে, অন্য দিকে, সরকার রাজস্ব আত্মসাৎ করল নগদ মুদ্রায়। এইভাবে রাইখস্টাগকে ক্ষমতার সবচেয়ে কার্যকর উপায় থেকে বঞ্চিত করা হল এবং ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সালের সংবিধান সংশোধনে, মানটুফেলবাদ, বিরোধ এবং সাদোভার হাতে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার পর প্রুশীয় প্রতিনিধি সভার যে দীন দশা হয়েছিল, রাইখস্টাগকে সেই জায়গায় এনে ফেলা হল, অথচ পুরনো ফেডারেল ডায়েট (বুন্ডেস্টাগ) নামেমাত্র যে-ক্ষমতা ভোগ করত, ফেডারেল পরিষদ পুরোপুরি সে-ক্ষমতা ভোগ করে প্রকৃতপক্ষেই, কারণ ফেডারেল ডায়েটকে যা পঙ্গু করে রেখেছিল সেই নিগড় থেকে সে মুক্ত। ফেডারেল পরিষদের, রাইখস্টাগের পাশাপাশি, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শুধু যে নিয়ামক ক্ষমতা আছে তাই নয়, সে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থাও বটে, যেহেতু সে সাম্রাজ্যিক আইনকানুন রূপায়ণ সম্পর্কে নির্দেশ দেয় এবং অধিকন্তু, 'সাম্রাজ্যিক আইন রূপায়ণের সময়ে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়' অর্থাৎ যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি অন্যান্য সভ্য দেশে শুধু নতুন আইন করেই দূর করা যায় সেই সব ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (ধারা ৭, অনুচ্ছেদ ৩, চতুর ছলনার সঙ্গে এর অনেকখানি মিল আছে)।

এইভাবে, বিসমার্ক তাঁর প্রধান সমর্থন পেতে চেয়েছেন জাতীয় মিলনের প্রতিভূ রাইখস্টাগের মধ্যে নয়, বরং বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়পন্থী বিচ্ছেদের প্রতিভূ সেই ফেডারেল পরিষদের মধ্যে। যিনি জাতীয় ধ্যানধারণার রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি জাতির অথবা তার প্রতিনিধিদের পুরোভাগে নিজেকে স্থাপন করার সাহসের অভাব দেখালেন; গণতন্ত্র তাঁর সেবা করত, তাঁকে গণতন্ত্রের সেবা করতে হত না; জনগণের উপরে নির্ভর না-করে তিনি নির্ভর করলেন পর্দার আড়ালে অশুভ গোপন বন্দোবস্তের উপরে, কূটনীতির সাহায্যে, লোভ এবং ভয় দেখিয়ে ফেডারেল পরিষদে, এমন কি

অবাধ্য হলেও, একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোগাড় করার ক্ষমতার উপরে। এতে তাঁর ধ্যানধারণার যে অকিঞ্চিৎকরতা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির যে নীচতা প্রকাশ পায় তা সেই ব্যক্তিটির চরিত্রানুগ — এ পর্যন্ত তাঁকে আমরা যতদূর চিনেছি। তবুও, বিস্ময়ের বিষয়, তাঁর বিরাট বিরাট সাফল্য তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে অতিক্রম করাতে পারে নি।

যাই হোক, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দরকার ছিল সমগ্র সাম্রাজ্যিক সংবিধানের জন্য একটিমাত্র মূলকেন্দ্র, অর্থাৎ সাম্রাজ্যিক চ্যান্সেলর। ফেডারেল পরিষদকে এমন একটা অবস্থায় আনা দরকার ছিল যেখানে সাম্রাজ্যিক চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্বশীল কার্যনির্বাহক ক্ষমতা থাকতে না পারে এবং যা দায়িত্বশীল সাম্রাজ্যিক মন্ত্রীদের নিয়োগ অসম্ভব করে তুলবে। বস্তুতপক্ষে, একটি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা তৈরি করে সাম্রাজ্যিক প্রশাসনকে স্বাভাবিক করার প্রতিটি প্রচেষ্টাকে ফেডারেল পরিষদের অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করা হল এবং তা দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। অচিরেই অবশ্য আবিষ্কৃত হল যে সংবিধানটি 'বিসমার্কের মাপে কাটা'। তা ছিল রাইখস্টাগে বিভিন্ন পার্টির এবং ফেডারেল পরিষদে বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়পন্থী রাষ্ট্রগুলির ভারসাম্য রক্ষা করে তাঁর অবিভক্ত ব্যক্তিগত শাসনের পথে আরেকটি পদক্ষেপ — বোনাপার্টবাদের পথে আরেকটি পদক্ষেপ।

প্রসঙ্গত, একথা বলা চলে না যে নতুন সাম্রাজ্যিক সংবিধান — ব্যাভেরিয়া ও ভ্যুর্টেমবের্গকে আলাদা-আলাদা কিছু সুবিধা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া — প্রত্যক্ষভাবে পিছন দিকে পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে ভালো এই কথাটুকুই তার সম্বন্ধে বলা যায়। বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক চাহিদা মোটামুটি পূরণ হয়েছিল, তাদের রাজনৈতিক দাবি — যতদূর তারা তখনও করেছিল — বিরোধের সময়কার মতোই সমান বাধার সম্মুখীন হয়েছিল।

যতদূর তারা তখনও রাজনৈতিক দাবি করেছিল! কারণ, একথা অস্বীকার করা যায় না যে জাতীয় উদারপন্থীদের সঙ্গে সঙ্গে এই সব দাবিও সংকুচিত হয়ে খুবই সামান্য আকৃতি নিয়েছে এবং প্রতিদিন তা আরও সংকুচিত হয়ে চলেছে। বিসমার্কের উচিত তাঁর নিজের সঙ্গে সহযোগিতা সহজতর করা — এই দাবি না-করে এই ভদ্রলোকেরা অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন

যেখানেই সম্ভব, এবং প্রায়শই যেখানে অসম্ভব, কিংবা অসম্ভব হওয়া উচিত ছিল সেখানেও, তাঁর ইচ্ছা পূরণের কাজে। বিসমার্ক তাদের ঘৃণা করতেন এবং সে জন্য কেউই তাঁকে দোষ দিতে পারে না — কিন্তু তাঁর যুঙ্কাররা কি এর চাইতে বিন্দুমাত্র ভালো কিংবা আরও সাহসী ছিল?

এর পরের যে ক্ষেত্রটিতে সারা সাম্রাজ্য-জুড়ে ঐক্য প্রবর্তিত করা দরকার ছিল সেটি হল মুদ্রা-ব্যবস্থা — তা স্বাভাবিক করা হল ১৮৭৩ ও ১৮৭৫ সালের মধ্যে পাস-করা মুদ্রা ও ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত আইনের সাহায্যে। স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন ছিল যথেষ্ট বড় অগ্রগতি; কিন্তু তা প্রবর্তন করা হয়েছিল দ্বিধা-দোদুল্যমানতার সঙ্গে এবং আজও পর্যন্ত তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয় নি। গৃহীত মুদ্রা-ব্যবস্থা — 'মার্ক' নামে এক টেলারের এক-তৃতীয়াংশ, দশমিক বিভাগবিশিষ্ট একটি একক — ত্রিশের দশকের শেষে তার প্রস্তাব করেছিলেন ফন স্যোটবের; প্রকৃত একক ছিল সোনার কুড়ি-মার্কের মুদ্রা। প্রায় চোখে না-পড়ার মতো মূল্য পরিবর্তন করলে তাকে ব্রিটিশ সভরিন, সোনার পঁচিশ ফ্রাঁ মুদ্রা অথবা সোনার মার্কিন পাঁচ-ডলার মুদ্রার একেবারে সমান করা যেত, এবং পৃথিবীর বাজারে তিনটি বৃহৎ মুদ্রা-ব্যবস্থার একটির সঙ্গে তাকে যুক্ত করা যেত। পছন্দ করা হল এক পৃথক অর্থ-ব্যবস্থা, তার দ্বারা বাণিজ্য ও বিনিময়ের হিসাবনিকাশ অনাবশ্যকভাবে জটিল করা হল। সাম্রাজ্যিক ট্রেজারি নোট ও ব্যাঙ্ক বিষয়ক আইনগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্র ও তাদের ব্যাঙ্কের নিদর্শনপত্র নিয়ে প্রতারণাপূর্ণ লেনদেন সীমিত করেছিল, এবং ইতিমধ্যে সংঘটিত বিরাট সংকটের কথা বিবেচনা করে বলা যায় যে সেই লেনদেনে সুনিশ্চিত ভীরুতার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল — সেটা এক্ষেত্রে তখনও অনভিজ্ঞ জার্মানির পক্ষে প্রশংসনীয়। কিন্তু এখানেও, বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ মোটের উপরে যথোপযুক্তভাবেই রক্ষা করা হয়েছিল।

সবশেষে, সমরূপ আইন সম্পর্কে মতৈক্য দরকার ছিল। বৈষয়িক নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার বিস্তৃতির বিরুদ্ধে মধ্য জার্মান রাষ্ট্রগুলির প্রতিরোধ জয় করা হল, কিন্তু দেওয়ানি বিধি এখনও তৈরি হচ্ছে, আর দন্ডবিধি, ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যপ্রণালী-সংক্রান্ত আইন, বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইন, দেউলিয়াপনা-সংক্রান্ত নিয়ম ও বিচার-ব্যবস্থা সর্বত্র

এক করা হয়েছে। ছোট ছোট রাষ্ট্রে বলবৎ বহুবিধ আনুষ্ঠানিক ও বৈষয়িক আইনগত মানের বিলুপ্তিই প্রগতিশীল বুর্জোয়া বিকাশের এক জরুরী চাহিদা ছিল, এবং এই বিলুপ্তিই নতুন আইনের প্রধান গুণ — তাদের অন্তর্বস্তুর চাইতে অনেক বড় গুণ।

ইংরেজ আইনবিদ নির্ভর করে আইনের ইতিহাসের উপরে, যা মধ্য যুগের পরেও পুরনো জার্মান অধিকারগুলির একটা বড় অংশকে বজায় রেখেছে, ১৭শ শতাব্দীর দুটি বিপ্লবে অংকুরেই বিনষ্ট পুলিস রাষ্ট্রের কথা, দু শতাব্দী ধরে নাগরিক অধিকারের অব্যাহত বিকাশের পর যে তার উচ্চতম বিন্দু অর্জন করেছে সেই পুলিস রাষ্ট্রের কথা এই ইতিহাসের অজানা। ফরাসী আইনবিদ নির্ভর করে মহাবিপ্লবের উপরে, যে-বিপ্লব সামন্ততন্ত্র ও সার্বভৌমপন্থী পুলিসি স্বৈরাচার পুরোপুরি ধ্বংস করার পর নবসৃষ্ট আধুনিক সমাজে জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থাকে রূপায়িত করেছিল নেপোলিয়ন-ঘোষিত ধ্রুপদী আইনবিধির আইনগত মানের ভাষায়। সে তুলনায় আমাদের জার্মান আইনবিদরা কোন আইনগত ভিত্তির উপরে নির্ভর করে? মধ্যযুগীয় অবশেষগুলির ভাঙনের কয়েক শতাব্দীব্যাপী প্রক্রিয়া, এক নিষ্ক্রিয় ও প্রধানত বাইরের আঘাতে চালিত প্রক্রিয়া, এখনও যা সম্পূর্ণ হয় নি; অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এক সমাজ, যেখানে এখনও সামন্ততান্ত্রিক য়ুঙ্কার আর গিল্‌ড প্রভুরা নতুন এক দেহে ভর করার সন্ধানে ভূতের মতো হানা দিচ্ছে; এক আইনগত ব্যবস্থা, যার মধ্যে পুলিসি স্বেচ্ছাচার — ডিউকদের পক্ষপাতদুষ্ট বিচার ১৮৪৮ সালে দূরীভূত হলেও — প্রত্যহ নতুন নতুন ছিদ্র সৃষ্টি করছে — এছাড়া আর কিছুর উপরে নয়। নতুন সাম্রাজ্যিক আইনবিধির স্রষ্টারা এসেছে এই সর্বাধিক মন্দ ধারা থেকে, এবং তাদের কাজ তার ছাপ বহন করছে। বিশুদ্ধ আইনগত দিকটি ছাড়াও রাজনৈতিক অধিকার এই সমস্ত আইনবিধিতে খুবই লাঞ্ছিত হয়েছে। শোফেনের আদালতগুলি (৮১) যদি শ্রমিক শ্রেণীকে দমন করার কাজে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীকে সহযোগিতা করার উপায় যুগিয়ে থাকে, তাহলে রাষ্ট্রও জুরিদের আদালতের অধিকার খর্ব করে নতুন বুর্জোয়া বিরোধিতার বিপদের বিরুদ্ধে নিজেকে যথাসম্ভব সুরক্ষিত করে। দণ্ডবিধির রাজনৈতিক অনুচ্ছেদগুলি প্রায়শই এত অস্পষ্ট ও স্থিতিস্থাপক যেন বর্তমান

সাম্রাজ্যিক আদালতের মাপে বিশেষ করে তৈরি এবং সাম্রাজ্যিক আদালত তৈরি তাদের মাপে। স্পষ্টতই, নতুন আইনবিধিগুলি প্রুশীয় অলিখিত আইনের তুলনায় সামনের দিকে একটি পদক্ষেপ — আজ এমন কি স্টোয়েকারও সেই বিধির মতো ভয়াবহ কিছু উদ্ভাবন করতে অপারগ হবেন, এমন কি নিজের মাথাও যদি মুড়োতে রাজী থাকেন, তাও নয়। কিন্তু যে সমস্ত প্রদেশ এই সেদিন পর্যন্তও ফরাসী আইনের আওতায় বাস করত, তারা ধোয়া-মোছা নকল আর ধ্রুপদী আসলটির মধ্যেকার পার্থক্য তীব্রভাবে অনুভব করে। জাতীয় উদারপন্থীরা তাদের কর্মসূচি থেকে চ্যুত হয়েছে বলেই নাগরিক অধিকারের বিনিময়ে রাষ্ট্রক্ষমতার এই শক্তিবৃদ্ধি, এই প্রথম প্রকৃত পশ্চাদ্‌গতি সম্ভব হয়েছে।

সাম্রাজ্যিক সংবাদপত্র আইনের কথাও উল্লেখ করা দরকার। এ সংক্রান্ত বৈষয়িক আইনকে দণ্ডবিধি ইতিমধ্যেই সারগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে; সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য একই রকম আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞার্থের বিশদীকরণ এবং এখানে-ওখানে চালু বণ্ড ও স্ট্যাম্প ডিউটির বিলোপসাধনই অতএব আইনের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল এবং সেই সঙ্গে সেটাই ছিল তার অর্জিত একমাত্র সাফল্য।

প্রাশিয়া যাতে আবার একটি আদর্শ রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারে সে জন্য তথাকথিত স্বশাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল, সামন্ততন্ত্রের সবচেয়ে আপত্তিজনক অবশেষগুলিকে উচ্ছেদ করা, অথচ, সারগতভাবে, সব কিছু আগের মতোই রেখে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য পূরণ করল জেলা অর্ডিন্যান্স (৮২)। য়ুঙ্কারদের জমিদারিতে পুলিসি প্রতাপ একটি কালাসঙ্গতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নামে — সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ সুবিধা হিসেবে — তা বিলুপ্ত করা হল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা পুনঃপ্রবর্তিত হল স্বতন্ত্র গ্রামীণ জেলা [Gutsbezirke] প্রতিষ্ঠায়, যার ভিতরে ভূস্বামী স্বয়ং গ্রামীণ তত্ত্বাবধায়ক [Gutsvorsteher] হিসেবে কাজ করে এবং গ্রাম-সম্প্রদায়ের প্রধানের [Gemeindevorsteher] ক্ষমতা সে ভোগ করে, অথবা সে এই গ্রামীণ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে; তা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল প্রশাসনিক জেলার [Amtsbezirk] সমগ্র পুলিস ক্ষমতা ও পুলিসি এক্তিয়ার জেলা প্রধানের [Amtsvorsteher] কাছে হস্তান্তরিত করে, গ্রামাঞ্চলে এই পদটি প্রায়

একান্তভাবেই বড় ভূস্বামীরা অধিকার করে ছিল; এইভাবে তারা গ্রাম-সম্প্রদায়ের উপরে দৃঢ়মুষ্টি-দখল বজায় রেখেছিল। ব্যক্তিবিশেষের সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ সুবিধা বিলুপ্ত করা হয়েছিল, কিন্তু এই সব সুবিধার সঙ্গে যুক্ত পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছিল সমগ্র শ্রেণীর হাতে। অনুরূপ ভোজবাজীতেই ইংরেজ বৃহৎ ভূস্বামীরা জাস্টিস অব পীস (শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত স্থানীয় নিম্নপদস্থ শাসক — অনুঃ) এবং গ্রামীণ প্রশাসনের কর্তা, পুলিস ও নিম্নতর আদালতের প্রধানে পরিণত হয়েছিল, এবং এক নতুন, আধুনিকীকৃত উপাধির আড়ালে নিজেরা যাতে ক্ষমতার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আরও ভোগ করতে পারে সে ব্যবস্থা তার দ্বারা সুনিশ্চিত করে, এই অবস্থান পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ধরনের অধীনে তারা ধরে রাখতে পারত না। সেটাই অবশ্য ইংরেজি ও জার্মান 'স্বশাসনের' মধ্যে একমাত্র মিল। আমি এরকম একজন ব্রিটিশ মন্ত্রী দেখতে পেলে খুশী হতাম যিনি পার্লামেণ্টে সাহস করে এই প্রস্তাব করতে পারেন যে নির্বাচিত স্থানীয় কর্মকর্তারা অনুমোদিত হবে এবং যদি কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি নির্বাচিত হয় তাকে রাষ্ট্রনিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে স্থানান্তরিত করা হবে; প্রস্তাব করতে পারেন যে প্রুশীয় ল্যাণ্ডর‍্যাট, প্রশাসনিক জেলাগুলির প্রধান ও প্রতিভূ-কর্তাদের ক্ষমতাসম্পন্ন সিভিল সার্ভেণ্ট (উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা — অনুঃ) রাখা হোক; প্রস্তাব করতে পারেন যে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সংস্থাগুলিকে জেলা অর্ডিন্যান্সে প্রদত্ত অধিকারের মতো সম্প্রদায়, ছোট প্রশাসনিক সংস্থা ও জেলাগুলির আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার এবং ন্যায়বিচারের পথ রোধ করার অধিকার দেওয়া হোক — এ জিনিস সমস্ত ইংরেজিভাষী দেশে এবং ইংরেজ আইনে অশ্রুতপূর্ব, কিন্তু জেলা অর্ডিন্যান্সের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই তা আমরা দেখতে পাই। আর জেলা ডায়েটগুলি [Kreistag] তথা প্রাদেশিক ল্যাণ্ডটাগগুলি যেখানে এখনও পুরনো সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় তিনটি স্তরের — বৃহৎ ভূস্বামী, শহর ও গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, সেখানে ইংলণ্ডে এমন কি অতি রক্ষণশীল এক মন্ত্রিসভাও কাউণ্টির সমস্ত প্রশাসন প্রায় সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত করে একটি আইন গ্রহণ করে (৮৩)।

ছ-টি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের জন্য জেলা অর্ডিন্যান্সের খসড়াটি

(১৮৭১) ছিল প্রথম ইঙ্গিত যে বিসমার্ক প্রাশিয়াকে জার্মানির মধ্যে লীন হয়ে যেতে দেওয়ার কথা চিন্তা পর্যন্ত করেন নি, তিনি পুরনো প্রুশীয়বাদের পুরনো মজবুত ঘাঁটি এই ছ-টি প্রদেশকে আরও শক্তিশালী করতে চেয়েছেন। পরিবর্তিত নামে য়ুঙ্কারদের হাতে তাদের ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলি ছেড়ে দেওয়া হল, আর জার্মানির ভূমিদাসরা (৮৪), এই সমস্ত অঞ্চলের গ্রামীণ শ্রমিকরা — যেমন খেতমজুর ও দিন-মজুররা — থেকে গেল প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের আগের ভূমিদাসত্বের মধ্যে এবং শুধু দুটি সরকারী কাজে তাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হল: সৈনিক হওয়া এবং রাইখস্টাগে নির্বাচনের সময়ে ভোট দেওয়ার প্রাণী হিসেবে য়ুঙ্কারদের সেবা করা। এর দ্বারা বিসমার্ক বিপ্লবী সোশ্যালিস্ট পার্টির যে উপকার করেছিলেন তা অবর্ণনীয় এবং আন্তরিকতম কৃতজ্ঞতালাভের যোগ্য।

য়ুঙ্কারদের মূর্খতা সম্পর্কে কী আর বলা যায়, যে-জেলা অর্ডিন্যান্স একান্ত তাদেরই স্বার্থে, কিছুটা আধুনিকীকৃত নামে তাদের সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ সুবিধা চিরস্থায়ী করার স্বার্থে প্রণীত হয়েছিল, তারা বখে-যাওয়া শিশুদের মতো তার গায়েই পদাঘাত করল। প্রুশীয় লর্ড সভা, কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, য়ুঙ্কার সভা প্রথমে এই খসড়া — যেটি পেশ করতে ইতিমধ্যেই পুরো এক বছর দেরি হয়ে গেছে — প্রত্যাখ্যান করল এবং ২৪ জন নতুন 'লর্ডকে' খেতাব দিয়ে মনোনীত করার পরই তা গ্রহণ করল। প্রুশীয় য়ুঙ্কাররা আরেকবার প্রমাণ করল যে তারা ক্ষুদ্রমনা, গোঁয়ার, সংশোধনাতীত প্রতিক্রিয়াশীল, জাতির জীবনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারার মতো এক বৃহৎ স্বতন্ত্র পার্টির প্রাণকেন্দ্র গঠন করতে — ব্রিটিশ বৃহৎ ভূম্যধিকারীরা প্রকৃতই যা করে — তারা অক্ষম। তার দ্বারা তারা তাদের পরিপূর্ণ বুদ্ধিহীনতার প্রমাণ দিল; বিসমার্ককে শুধু পৃথিবীর সামনে তাদের সার্বিক চরিত্রহীনতা প্রকাশ করতে হয়েছিল, আর যথাযথভাবে প্রযুক্ত সামান্য একটু চাপই sans phrase* তাদের রূপান্তরিত করল এক বিসমার্ক পার্টিতে। এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে চলেছিল কুলটুরকাম্ফ্।

প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনার রূপায়ণে একটা পাল্টা-আঘাত

---

* বিনা বাক্যে। — সম্পাঃ

সৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল — আগেকার পৃথক বিকাশের উপরে যারা নির্ভর করত এমন সমস্ত প্রুশীয়-বিরোধী শক্তির একটিমাত্র পার্টিতে মিলিত হওয়া। নানান ধরনের এই শক্তিগুলি আলট্রামনটানিজমের (৮৫) মধ্যে এক অভিন্ন পতাকা খুঁজে পেল। এক দিকে, পোপের অভ্রান্ততা-সংক্রান্ত নতুন মতের বিরুদ্ধে এমন কি অসংখ্য অর্থোডক্স ক্যাথলিকের মধ্যে সুস্থ কাণ্ডজ্ঞানের বিদ্রোহ, অন্য দিকে, পোপশাসিত রাষ্ট্রের বিনাশ এবং রোমে পোপের তথাকথিত বন্দীদশা (৮৬) ক্যাথলিক ধর্মমতের সমস্ত জঙ্গী শক্তিকে সংহত হতে বাধ্য করল। এইভাবে, যুদ্ধের সময়েই, ১৮৭০-এর শরৎ-হেমন্তকালে প্রুশীয় ল্যান্ডটাগে গঠিত হয়েছিল সুনির্দিষ্টভাবে ক্যাথলিক পার্টি অব দি সেণ্টার; ১৮৭১ সালের প্রথম জার্মান রাইখস্টাগে তারা পেয়েছিল মাত্র ৫৭টি আসন, কিন্তু প্রতিটি নতুন নির্বাচনে তারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল এবং শেষে এদের ১০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি ছিল। এই পার্টি গঠিত ছিল বহু বিভিন্নধর্মী ব্যক্তিদের দিয়ে। প্রাশিয়ায় তার প্রধান শক্তি ছিল তখনও যারা নিজেদের 'বিধিনিষেধ-আরোপিত প্রুশীয়' বলে মনে করত সেই রেনিশ ছোট খামারীরা, মুন্সটার ও পাডেরবর্ণ-এর ওয়েস্টফালীয় বিশপদের এলাকার ক্যাথলিক ভূস্বামী ও কৃষকরা এবং ক্যাথলিক সাইলেসীয়রা। দ্বিতীয় বড় বাহিনীটি ছিল দক্ষিণ জার্মান ক্যাথলিকরা, বিশেষত ব্যাভেরীয়রা। ক্যাথলিক ধর্মই সেণ্টার পার্টির ততটা মূলশক্তি ছিল না, বরং বর্তমানে জার্মানির উপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দাবিদার প্রুশীয় সব কিছুর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের বিদ্বেষের সে প্রতিনিধিত্ব করত, এই ঘটনাটাই ছিল তার আসল শক্তি। এই বিদ্বেষ ক্যাথলিক অঞ্চলগুলিতে বিশেষ জোরালো ছিল; তার পাশাপাশি ছিল বর্তমানে জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত অস্ট্রিয়ার প্রতি সহানুভূতি। এই দুটি জনপ্রিয় প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেও, সেণ্টার অবশ্যই ছিল বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে বিশ্বাসী ও যুক্তরাষ্ট্রবাদী।

সেণ্টার পার্টির এই মূলত প্রুশীয়-বিরোধী চরিত্রকে রাইখস্টাগের অন্যান্য ছোট ছোট উপদল সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছিল, তারাও প্রুশীয়-বিরোধী ছিল স্থানীয় কারণে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মতো জাতীয় ও সার্বিক কারণে নয়। শুধু ক্যাথলিক — পোল ও অ্যালসেসীয়রাই নয়,

এমন কি প্রটেস্ট্যাণ্ট গোয়েল্‌ফরাও (৮৭) সেণ্টার পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের যুক্ত করল। এবং বুর্জোয়া উদারপন্থী উপদলগুলি তথাকথিত আলট্রামনটানদের প্রকৃত চরিত্র কখনোই সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে না পারলেও, তারা যখন সেণ্টারকে 'দেশপ্রেমিক নয়' এবং 'সাম্রাজ্যের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন' অভিধায় ভূষিত করেছিল তখন নিশ্চয়ই প্রকৃত অবস্থা কিছুটা আঁচ করেছিল...*

ডিসেম্বর, ১৮৮৭-র শেষ
এবং মার্চ, ১৮৮৮-র
মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত

জার্মান ভাষা থেকে
ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

প্রথম প্রকাশ:
Die Neue Zeit,
খণ্ড ১, সংখ্যা
২২-২৬, ১৮৯৫-১৮৯৬

* পাণ্ডুলিপিটি এখানেই আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে। — সম্পাঃ

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

১৮৯১-এর খসড়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচির সমালোচনা প্রসঙ্গে (৮৮)

আগেকার কর্মসূচির (৮৯) সঙ্গে বর্তমান খসড়াটির পার্থক্য রয়েছে ভালোর দিকে। সেকেলে পরম্পরার প্রবল জের — সুনির্দিষ্ট লাসালীয় তথা স্থূল সমাজতন্ত্রী ধাঁচের — মোটের উপরে দূর করা হয়েছে, এবং তার তত্ত্বগত দিকটির কথা বলতে গেলে খসড়াটি সামগ্রিকভাবে আজকের দিনের বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং এই ভিত্তিতেই তা আলোচনা করা যায়।

এটি তিনটি অংশে বিভক্ত: ১। মুখবন্ধ, ২। রাজনৈতিক দাবি, ৩। শ্রমিকদের রক্ষার ব্যবস্থার জন্য দাবি।

১। দশ অনুচ্ছেদে মুখবন্ধ

সাধারণভাবে, যুক্ত করা যায় না এমন দুটি জিনিসকে যুক্ত করার চেষ্টায় তা ভুগছে: একটি কর্মসূচি এবং সেই সঙ্গে কর্মসূচি সম্পর্কে একটি **টীকাভাষ্যও**। ছোট, তীক্ষ্ন অর্থপ্রকাশ যথেষ্ট বোধগম্য হবে না এই ভয়ে ব্যাখ্যা যোগ করতে হয়েছে, ফলে তা হয়ে উঠেছে মাত্রাধিক শব্দবহুল ও দীর্ঘ। আমার মতে কর্মসূচি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও বোধগম্য হওয়া উচিত। তাতে যদি মাঝে মাঝে দু-একটি বিদেশী শব্দ থাকে, কিংবা প্রথম নজরে সম্পূর্ণ তাৎপর্য বোঝা যাচ্ছে না এমন কোনো বাক্য থাকে তাতে ক্ষতি নেই। সভায় মৌখিক ব্যাখ্যা এবং পত্রপত্রিকায় লিখিত ভাষ্য সে কাজটা করতে পারে, আর সংক্ষিপ্ত, অর্থপূর্ণ উক্তি একবার বুঝতে পারলে, স্মৃতিতে দৃঢ়মূল হয়ে থাকে, এবং একটি স্লোগান হয়ে ওঠে, শব্দবহুল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যা কখনোই

ঘটে না। জনপ্রিয়তার খাতিরে খুব বেশি কিছু বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়, এবং আমাদের শ্রমিকদের মানসিক ক্ষমতা ও শিক্ষার স্তর খাটো করে দেখা উচিত নয়। সংক্ষিপ্ততম কর্মসূচির চাইতে অনেক বেশি কঠিন জিনিস তারা বুঝেছে; আর সমাজতন্ত্রীবিরোধী জরুরী আইন (৯০) যদি আন্দোলনে যোগদানকারী জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক জ্ঞান প্রসারের কাজকে আরও কঠিন করে থাকে এবং কোথাও কোথাও এমন কি রোধ করেও থাকে, তাহলে এখন যখন আমাদের প্রচারমূলক রচনাদি ঝঞ্ঝাটের ঝুঁকি না-নিয়েও আবার রাখা এবং পড়া যাচ্ছে, তখন যে সময়টুকু নষ্ট হয়েছে তা পুরনো নেতৃত্বের অধীনে অচিরেই পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

এই গোটা অংশটিকেই আমি আরও কিছুটা ছোট করার চেষ্টা করব এবং যদি সফল হই তাহলে এই সঙ্গেই সংলগ্ন করে দেব, না হয় পরে পাঠিয়ে দেব। এখন আমি ১ থেকে ১০ সংখ্যাচিহ্নিত অনুচ্ছেদগুলি এক-এক করে আলোচনা করব।

অনুচ্ছেদ ১। 'পৃথকীকরণ', ইত্যাদি, 'খনি, খনিগহ্বর ও খাত' — একই জিনিসের জন্য তিনটি শব্দ: দুটি বাদ দেওয়া উচিত। আমি রেখে দেব **খনি** [Bergwerke], এই শব্দটি দেশের সমতলতম অংশেও ব্যবহৃত হয়, এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই শব্দটি দিয়েই তাদের সব-কটিকে অভিহিত করব। অবশ্য, যোগ করব, **'রেলপথ এবং** যোগাযোগের **অন্যান্য** উপায়'।

অনুচ্ছেদ ২। এখানে আমি ঢোকাবো: **'তাদের উপযোজকদের** (কিংবা **তাদের মালিকদের)** হাতে শ্রমের **সামাজিক** উপায়সমূহ হল', এবং অনুরূপভাবে নীচে 'শ্রমের উপায়সমূহের **মালিকদের** (কিংবা উপযোজকদের) উপরে নির্ভরশীলতা...' ইত্যাদি।

প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে যে এই ভদ্রলোকরা এই সব জিনিস উপযোজন করেছে **'একান্ত নিজস্ব** সম্পত্তি' হিসেবে এবং যদি 'একচেটিয়া' শব্দটি এখানে আনার উপরে [illegible] জোর দেওয়া হয় একমাত্র তাহলেই ওই কথাটি এখানেই পুনরাবৃত্তি করা দরকার। এই শব্দটি কিংবা অন্য শব্দটি নতুন কোনো অর্থ বোঝায় না। আর কর্মসূচিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু থাকলে তা তাকে দুর্বল করে ফেলে।

'সমাজের **অস্তিত্বের** জন্য **প্রয়োজনীয়** শ্রমের উপায়সমূহ'

— এই জিনিসগুলিই হাতের কাছে আছে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আগে তা ছাড়াই কাজ চালানো সম্ভব ছিল, এখন আমরা পারি না। যেহেতু শ্রমের সমস্ত উপায়ই আজকাল প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে — হয় তাদের গড়নের দরুন না-হয় সামাজিক শ্রম বিভাজনের দরুন — **শ্রমের সামাজিক উপায়সমূহ**, সেই জন্য শব্দগুলিই প্রতিটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে কী পাওয়া যাচ্ছে সেই অর্থটি যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে, সঠিকভাবে এবং বিভ্রান্তিকর কোনো অনুষঙ্গ ছাড়াই প্রকাশ করে।

এই অনুচ্ছেদের শেষ কথা যদি আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর মুখবন্ধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে চাওয়া হয়, তাহলে আমি বরং চাই তা **সম্পূর্ণরূপে** সংগতিপূর্ণ হোক: 'সামাজিক দুর্দশা' (এ হল ১ নং), 'মানসিক অধঃপতন ও রাজনৈতিক অধীনতার'।* শারীরিক অধঃপতন সামাজিক দুর্দশার অংশ, আর রাজনৈতিক **অধীনতা** একটা বাস্তব ঘটনা, আর রাজনৈতিক **অধিকারের অস্বীকৃতি** একটি অলংকারপূর্ণ কথা, তা শুধু **আপেক্ষিকভাবে** সত্য এবং এই কারণে কর্মসূচিতে স্থান পায় না।

অনুচ্ছেদ ৩। আমার মতে প্রথম বাক্যটি পরিবর্তন করা উচিত।

'একক **মালিকদের** আধিপত্যের অধীনে।'

প্রথমত, এর পর যা বলা হয় তা এক অর্থনৈতিক ঘটনা, তার ব্যাখ্যা করা উচিত অর্থনৈতিক ভাষায়। 'একক মালিকদের **আধিপত্য**' কথাটি এমন ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে যে সেই ডাকাতের দলের **রাজনৈতিক** আধিপত্যই এর কারণ। দ্বিতীয়ত, এই একক মালিকদের মধ্যে শুধু 'পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূম্যধিকারীরাই' পড়ে না (এর পরে 'বুর্জোয়া' শব্দটির তাৎপর্য কী? তারা কি একক মালিকদের তৃতীয় একটি শ্রেণী? বৃহৎ ভূম্যধিকারীরাও কি 'বুর্জোয়া'? আর, একবার যখন বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের প্রসঙ্গে এসেছি

---

* ক. মার্কস, 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলী' (এই সংস্করণের ৫ম খণ্ডের ১৮-২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ

তখন আমাদের কি সামন্ততন্ত্রের বিপুল অবশেষের কথা উপেক্ষা করা উচিত হবে, — যে অবশেষগুলি জার্মান রাজনীতির গোটা নোংরা ব্যাপারটাকেই সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র দিয়েছে?)। **কৃষক** এবং **পেটি বুর্জোয়াও** 'একক মালিক', অন্তত আজও পর্যন্ত; কিন্তু কর্মসূচিতে কোথাও তাদের উল্লেখ নেই, সুতরাং শব্দবিন্যাসে একথা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে আলোচ্য একক মালিকদের বর্গের মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

'শ্রমের উপায়সমূহের **এবং** শোষিতদের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদের সঞ্চয়।'

'সম্পদ' হল ১। শ্রমের উপায়সমূহ, ২। জীবনধারণের উপায়সমূহ। সুতরাং একটিকে বাদ দিয়ে সম্পদের একটি **অংশ** উল্লেখ করা তারপরে **'এবং'**-এর সাহায্যে দুটিকে যুক্ত করে মোট সম্পদের কথা বলা ব্যাকরণগতভাবে ভুল এবং অযৌক্তিক।

'**পুঁজিপতিদের** হাতে ক্রমবর্ধমান দ্রুততায়... বাড়ে...'

উপরোক্ত 'বৃহৎ ভূম্যধিকারী' আর 'বুর্জোয়া শ্রেণীর' কী হল? এখানে যদি শুধু পুঁজিপতিদের কথা বলাই যথেষ্ট হয়, তাহলে উপরেও তাই হওয়া উচিত। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট করে বলতে চাওয়া হয় তাহলে সাধারণত শুধু তাদের কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়।

'প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা এবং **দুর্দশা** ক্রমাগত বাড়ে।'

এই রকম চরম-সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থিত করলে, কথাটা ভুল। শ্রমিকদের সংগঠন এবং তাদের নিয়ত বর্ধমান প্রতিরোধ সম্ভবত **দুর্দশা বৃদ্ধি** কিছুটা পরিমাণে রোধ করবে। কিন্তু যেটা **নিশ্চয়ই** বাড়ে তা হল **অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতা**। এই কথাটা আমি ঢোকাতে চাই।

অনুচ্ছেদ ৪।

'পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিতমূল পরিকল্পনার অভাব'

বিষয়টির যথেষ্ট পরিমার্জনা দরকার। একটি সামাজিক ধরন, কিংবা একটি অর্থনৈতিক পর্যায় হিসেবে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে আমি

পরিচিত; পংজিবাদী **ব্যক্তিগত** উৎপাদন-ব্যবস্থা এমন একটা **ব্যাপার** যা সেই পর্যায়ে কোনো না কোনো ধরনে দেখা যায়। পংজিবাদী **ব্যক্তিগত** উৎপাদন-ব্যবস্থা কী? — **পৃথক পৃথক** উদ্যোগপতির দ্বারা উৎপাদন, যা ক্রমেই বেশি করে ব্যতিক্রম হয়ে উঠছে। **জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলির দ্বারা** পংজিবাদী উৎপাদন আর **ব্যক্তিগত** উৎপাদন নেই, বরং সম্মিলিত বহুজনের পক্ষে উৎপাদন হয়ে উঠেছে। আমরা যখন জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি থেকে ট্রাস্টে চলে আসি — যে-ট্রাস্ট শিল্পের এক-একটি গোটা শাখার উপরে আধিপত্য করে এবং একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে — তখন শুধু **ব্যক্তিগত উৎপাদনই** নয়, **পরিকল্পনাহীনতারও অবসান** ঘটে। **'ব্যক্তিগত'** শব্দটি বাদ দিলে বাক্যটি চলতে পারে।

'জনসমষ্টির ব্যাপক স্তরের সর্বনাশ।'

মনে হয় আমরা যেন এখনও বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর ধ্বংসের জন্য দুঃখ করছি, তাই এই অলঙ্কারপূর্ণ কথাটির পরিবর্তে আমি বলব এই সহজ কথাটি: 'শহুরে ও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, পেটি বুর্জোয়া ও ছোট কৃষকদের ধ্বংস করে যা বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যেকার গহ্বরকে বিস্তৃত (কিংবা গভীর) করে তোলে।'

শেষ দুটি কথায় একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথম অংশের পরিশিষ্টে আমি একটি খসড়া সংশোধনী দিলাম।*

অনুচ্ছেদ ৫। 'কারণ' শব্দটির পরিবর্তে হওয়া উচিত **'এর** কারণ,' সম্ভবত লেখার সময়ে অনবধানতার দরুনই এটা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৬। 'খনি, খনিগহ্বর, খাত', উপরে দেখুন, অনুচ্ছেদ ১-এ। **'ব্যক্তিগত** উৎপাদন', উপরে দেখুন। আমি বলতে চাই: 'একক ব্যক্তি বা জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলির তরফে বর্তমান পংজিবাদী উৎপাদনের সামগ্রিকভাবে সমাজের তরফে এবং পূর্বচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে রূপান্তর, যে রূপান্তরের জন্য, ইত্যাদি... সৃষ্টি করা হয়... এবং একমাত্র এরই দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ও সেই সঙ্গে

* এই খণ্ডের ৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ব্যতিক্রমহীনভাবে সমাজের সকল সদস্যের মুক্তি অর্জন করা যাবে।'

অনুচ্ছেদ ৭। প্রথম অংশের পরিশিষ্টে* যে কথা বলেছি, তাই বলতে চাই।

অনুচ্ছেদ ৮। আমাদের মহলে সহজবোধ্য সংক্ষিপ্তরূপ — 'শ্রেণী-সচেতন' কথাটির পরিবর্তে আমি সবাই যাতে সহজে বুঝতে পারে এবং বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করা যায় সেই জন্য এই কথা বলতে চাই: 'নিজেদের শ্রেণী-অবস্থান সম্পর্কে সচেতন শ্রমিকদের সঙ্গে' অথবা ঐরকম কিছু।

অনুচ্ছেদ ৯। শেষ বাক্যটি: '...**রাখে**... এবং তার দ্বারা সেই একই হাতে অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়নকে কেন্দ্রীভূত করে।'

অনুচ্ছেদ ১০। 'শ্রেণী-শাসনের' পর 'এবং শ্রেণীগুলির নিজেদেরই' শব্দগুলি বসানো উচিত। শ্রেণীসমূহের বিলোপসাধন আমাদের মূল দাবি, এ ছাড়া শ্রেণী-শাসনের বিলুপ্তি অর্থনৈতিকভাবে অকল্পনীয়। 'সকলের সমান অধিকারের জন্য'-এর পরিবর্তে আমার প্রস্তাব হল: 'সকলের সমান অধিকার ও **সমান কর্তব্যের** জন্য' ইত্যাদি। আমাদের পক্ষে **সমান কর্তব্য** বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক **সমান অধিকারের সঙ্গে** এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন এবং তা তাদের সুনির্দিষ্ট বুর্জোয়া অর্থের অবসান ঘটায়।

শেষ বাক্যটি: 'তাদের সংগ্রামে... সক্ষম' বাদ দিলেই ভালো হয়। 'সাধারণভাবে **জনগণের** (সেটা কে?) অবস্থার উন্নতিবিধানে সক্ষম এবং...' এই অনির্দিষ্ট ভাষার আওতায় সব কিছু — রক্ষণমূলক শুল্ক ও অবাধ বাণিজ্য, গিল্ড ও উদ্যোগের স্বাধীনতা, ভূসম্পত্তি জামিনের উপরে ঋণ, বিনিময় ব্যাঙ্ক, বাধ্যতামূলক টীকা দান এবং টীকা নিষিদ্ধকরণ, মদ্যাসক্তি ও মাদকবর্জন প্রভৃতি সব কিছুই আসতে পারে। এখানে যেকথা বলা উচিত, তা আগেই বলা হয়েছে, এবং একথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা অনাবশ্যক যে সমগ্রের জন্য দাবির মধ্যে প্রতিটি পৃথক অংশও আছে, কারণ, আমার মনে হয়, এতে জোর কমে যায়। অবশ্য যদি এই বাক্যটি এক-একটি দাবির দিকে যাওয়ার যোগসূত্র হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে তাহলে এই কথাগুলি বলা যেতে পারে: **'এই লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে** এমন সমস্ত দাবির জন্য।

* এই খণ্ডের ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

জন্যই সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি লড়াই করে' ('ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত' পুনরাবৃত্তিমূলক বলে বাদ দেওয়া দরকার)। কিংবা তা না হলে, যেটা আরও ভালো হবে: সরাসরি সবকথা বলা, অর্থাৎ একথা বলা যে বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানে যেতে পারে নি আমাদের সেইখানে গিয়ে পেঁছিতে হবে; পরিশিষ্ট ১-এ* আমি এই মর্মে একটি সমাপ্তিসূচক বাক্য অন্তর্ভুক্ত করেছি। পরবর্তী অংশ সম্পর্কে আমার মন্তব্যলিপির প্রসঙ্গে এবং সেখানে আমার উপস্থাপিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বোঝাবার পক্ষে এটা আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

২। রাজনৈতিক দাবি

খসড়া রাজনৈতিক দাবিগুলির একটা বড় দোষ আছে। যে কথা বলা উচিত ছিল, **ঠিক সেইটিই তাতে নেই**। ১০টি দাবির সবকটিই যদি মঞ্জুর করা হত, তাহলে আমরা বস্তুতই আমাদের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের বিচিত্রতর উপায় পেতাম, কিন্তু সেই লক্ষ্যটি কোনোমতেই অর্জিত হত না। জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের অধিকার দেওয়ার প্রসঙ্গে জার্মান সাম্রাজ্যিক সংবিধানটি, যথাযথভাবে বলতে গেলে, ১৮৫০ সালের প্রুশীয় সংবিধানেরই (৯১) প্রতিলিপি, এই সংবিধানের ধারাগুলি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং সরকারকেই সমস্ত প্রকৃত ক্ষমতা প্রদান করে, কিন্তু প্রতিনিধি সভাগুলিকে এমন কি কর নামঞ্জুর করতেও দেয় না; যে সংবিধান বিরোধের সময়ে (৯২) দেখিয়েছে যে সরকার সেটি নিয়ে যা খুশী করতে পারে। রাইখস্টাগের অধিকার প্রুশীয় প্রতিনিধি সভারই অধিকারের মতো আর সেই জন্যই লিব্‌ক্নেখ্‌ট এই রাইখস্টাগকে অভিহিত করেছেন সার্বভৌমতন্ত্রের নগ্নরূপ ঢাকার ডুমুর পাতা বলে। এই সংবিধান ও তার অনুমোদিত ছোট ছোট রাষ্ট্রের ব্যবস্থার ভিত্তিতে, প্রাশিয়া আর রয়েস-গ্রেইৎস-শ্লেইৎস-লোবেনস্টাইনের (৯৩) মধ্যে 'মিলনের' ভিত্তিতে — যেখানে এক রাষ্ট্রের যত বর্গ ইঞ্চি জমি, আরেক রাষ্ট্রের আছে তত বর্গ মাইল জমি — 'শ্রমের সমস্ত উপকরণকে সাধারণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার' ইচ্ছা স্পষ্টতই অবাস্তব।

বিষয়টিতে হাত দেওয়া অবশ্য বিপজ্জনক। তা সত্ত্বেও, কোনো না

---

* এই খণ্ডের ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কোনো ভাবে জিনিসটিকে আক্রমণ করা দরকার। এ যে কত প্রয়োজনীয় তা ঠিক বর্তমান সময়েই দেখা যাচ্ছে সুবিধাবাদ থেকে, যে-সুবিধাবাদ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্রজগতের একটা বড় অংশের মধ্যে বেড়ে চলেছে। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন নতুন করে চালু হওয়ার ভয়ে, অথবা সেই আইনের শাসনকালে অত্যধিক তাড়াহুড়ো করে বলা নানান ধরনের উক্তির কথা স্মরণ করে এখন তারা চায় যে পার্টি জার্মানির বর্তমান আইনী ব্যবস্থাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পার্টির সমস্ত দাবি তুলে ধরার পক্ষে উপযুক্ত বিবেচনা করুক। এগুলি হল নিজেকে এবং পার্টিকে একথা বোঝাবার চেষ্টা যে 'বর্তমান সমাজ সমাজতন্ত্র অভিমুখে বিকশিত হচ্ছে', তার দ্বারা তা সমান আবশ্যিকভাবেই পুরনো সামাজিক ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে কি না এবং কাঁকড়া যেমন তার খোলস ভেঙে ফেলে তেমনি তাকে বলপ্রয়োগে তার পুরনো খোলস বিদীর্ণ করতে হবে কি না, এবং জার্মানিতে অধিকন্তু তাকে এখনও আধা-সার্বভৌমপন্থী ও তদুপরি অবর্ণনীয়ভাবে জট-পাকানো রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিগড় চূর্ণ করতে হবে কি না — এসব প্রশ্ন না-করেই একথা বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে। কল্পনা করা যেতে পারে, যে-সব দেশে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, যেখানে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন থাকলে সাংবিধানিক উপায়ে করণীয় কাজ করা যায় সেই সব দেশে পুরনো সমাজ শান্তিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে নতুন সমাজে পরিণত হতে পারে: ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে, ব্রিটেনের মতো রাজতন্ত্রে, যেখানে আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে রাজবংশের আসন্ন ক্ষমতাত্যাগের কথা সংবাদপত্রে প্রত্যহ আলোচিত হয় এবং যেখানে এই রাজবংশ জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন। কিন্তু জার্মানিতে, যেখানে সরকার প্রায় সর্বশক্তিমান এবং রাইখস্টাগ ও অন্য সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার প্রকৃত কোনো ক্ষমতা নেই, সেই জার্মানিতে এরকম একটা জিনিসের কথা বলার অর্থ — যখন, অধিকন্তু তা বলার কোনো দরকার নেই — সার্বভৌমতন্ত্রের অঙ্গ থেকে ডুমুর পাতাটি সরিয়ে নিয়ে নিজেই তার নগ্নতা ঢাকার আবরণ হয়ে ওঠা।

শেষ অবধি এরূপ নীতি পার্টিকে একমাত্র বিপথেই চালিত করতে পারে। সাধারণ, বিমূর্ত রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিকে সামনে নিয়ে এসে তা

আশু মূর্ত প্রশ্নগুলিকে আড়াল করে রাখে, প্রথম বড় ঘটনা এবং প্রথম রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তেই সেগুলি স্বতই এসে হাজির হয়। এর ফলে, চূড়ান্ত মুহূর্তে হঠাৎ দেখা যায় পার্টি অসহায় এবং অধিকাংশ চরম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আগে কখনও আলোচিত হয় নি বলে, সেই সব প্রশ্নে তার মধ্যে বিরাজ করছে অনিশ্চয়তা ও বিরোধ — এ-ছাড়া আর কী হতে পারে? রক্ষণমূলক শুল্কের ব্যাপারে যা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি কি ঘটাতেই হবে? — বলা হয়েছিল যে এই শুল্ক শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাবনার ব্যাপার, শ্রমিকদের স্বার্থকে তা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করে না, অর্থাৎ এমন একটি বিষয় যার উপরে প্রত্যেকে ইচ্ছা মতো ভোট দিতে পারে। এখন অনেকে কি চরম বিপরীত প্রান্তে যাচ্ছে না এবং তারা কি রক্ষণমূলক শুল্কে আসক্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর তুলনায় কবডেন ও ব্রাইটের অর্থনৈতিক বিকৃতিগুলিই নতুন করে তৈরি করছে না এবং সেগুলিকে — এই নির্ভেজাল ম্যাঞ্চেস্টারবাদকে (৯৪) বিশুদ্ধতম সমাজতন্ত্র বলে প্রচার করছে না? মহৎ, মূল বিষয়টি এইভাবে বিস্মৃত হওয়া, এখনকার তাৎক্ষণিক স্বার্থকেই প্রধান বিবেচ্য করে তোলা, পরবর্তীকালের পরিণতি-নির্বিচারে এই মুহূর্তের সাফল্যের জন্য এই সংগ্রাম ও প্রয়াস, আন্দোলনের বর্তমানের জন্য তার ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দেওয়া, হয়তো বা 'সততার' সঙ্গেই করা হচ্ছে, কিন্তু তা সুবিধাবাদ এবং এখনও সুবিধাবাদই আছে, আর 'সৎ' সুবিধাবাদ সম্ভবত সব চাইতে বিপজ্জনক!

এই সূক্ষ্ম অথচ অতি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলি কী?

প্রথম। একটা বিষয় যদি সুনিশ্চিত হয়ে থাকে তবে তা এই যে আমাদের পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতায় আসতে পারে একমাত্র এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আকৃতিতে। এমন কি এটিই হল প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট ধরন, ফরাসী মহাবিপ্লব তা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে। মিকেলের মতো একজন সম্রাটের অধীনে মন্ত্রী হওয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পক্ষে অকল্পনীয়। মনে হয় আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে একটি প্রজাতন্ত্রের দাবি সরাসরি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে না, যদিও ফ্রান্সে লুই ফিলিপের আমলেও তা সম্ভব ছিল এবং এখন সম্ভব ইতালিতে। কিন্তু জার্মানিতে যে একটি প্রজাতন্ত্রীয় পার্টির কর্মসূচি

প্রকাশ্যে উপস্থিত করতে দেওয়া হয় না, এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে একটি প্রজাতন্ত্র, শুধু প্রজাতন্ত্রই নয়, কমিউনিস্ট সমাজও নিরুপদ্রব, শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিষ্ঠা করা যাবে এই বিশ্বাস কত সম্পূর্ণ রূপে ভ্রান্ত।

যাই হোক, প্রজাতন্ত্রের প্রশ্নটিকে সম্ভবত বাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমার মতে যা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং করা যায় তা হল **জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার** দাবি। এর চাইতে বেশি দূর এগোনো যদি অসম্ভব হয় তাহলে আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।

দ্বিতীয়। জার্মানির পুনর্গঠন। একদিকে, ছোট ছোট রাষ্ট্রের ব্যবস্থা অবশ্যই বিলুপ্ত করতে হবে — ব্যাভেরিয়া-ভুর্টেমবের্গ (৯৫) সংরক্ষণ অধিকার রয়েছে, আর আজকের থুরিঙ্গিয়ার মানচিত্র দেখলে দুঃখ হয় — এই অবস্থায় সমাজের বৈপ্লবিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেই দেখুন! অন্য দিকে, প্রাশিয়ার অস্তিত্ব থাকা চলবে না, জার্মানির উপরে সুনির্দিষ্ট প্রুশীয়বাদ আর যাতে বোঝা হয়ে চেপে বসতে না-পারে সে জন্য তাকে অবশ্যই কতকগুলি স্বশাসিত প্রদেশে বিভক্ত করে দিতে হবে। যে বৈপরীত্য এখন জার্মানিকে সাঁড়াশির মতো এ'টে ধরেছে, ছোট ছোট রাষ্ট্রের ব্যবস্থা আর প্রুশীয়বাদ তারই দুটি দিক, সেখানে একটি দিক সর্বদাই অপরটির অস্তিত্বের অজুহাত ও সাফাই হিসেবে কাজ করবে।

কী তার স্থান গ্রহণ করবে? আমার মতে, প্রলেতারিয়েত শুধু এক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্রের ধরনটিই ব্যবহার করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুবিশাল এলাকায় ফেডারেল প্রজাতন্ত্র এখনও মোটের উপরে আবশ্যকীয়, যদিও পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে তা ইতিমধ্যেই একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে দুটি দ্বীপে চারটি জাতির লোকের বাস এবং একটিমাত্র পার্লামেণ্ট সত্ত্বেও পাশাপাশি তিনটি পৃথক আইন প্রণয়ন-ব্যবস্থা আছে, সেই ব্রিটেনে তা হবে সামনের দিকে একটি পদক্ষেপ। ছোট সুইজারল্যাণ্ডে তা বহুদিন ধরেই এক প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে, কিন্তু তা সহনীয় একমাত্র এই কারণে যে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নিতান্ত নিষ্ক্রিয় এক সদস্য হতে পেরেই সুইজারল্যাণ্ড সন্তুষ্ট। জার্মানির পক্ষে সুইস আদর্শ অনুযায়ী ফেডারেল ব্যবস্থা প্রবর্তন পিছনের দিকে এক বিরাট পদক্ষেপ হবে। দুটি বিষয়

সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ একটি রাষ্ট্র থেকে একটি অঙ্গ রাজ্যকে পৃথক করে তোলে: প্রথমত, প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের, প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন প্রণয়ন ও নিজস্ব বিচার-ব্যবস্থা থাকে এবং দ্বিতীয়ত, একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষের পাশাপাশি একটি ফেডারেল কক্ষও থাকে, ছোট-বড় সমস্ত অঞ্চল তাতে ভোট দেয়। প্রথমটি আমরা সৌভাগ্যক্রমে কাটিয়ে উঠেছি এবং তা পুনঃপ্রবর্তন করার মতো শিশুসুলভ বোকামি আমরা করব না; দ্বিতীয়টি আছে আমাদের বুন্ডেসরাটে এবং সেটি না-থাকলে আমাদের বেশ ভালোই চলত, কারণ আমাদের 'ফেডারেল রাষ্ট্র' সাধারণত এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে উত্তরণস্বরূপ। এবং আমাদের কর্তব্য — ১৮৬৬ ও ১৮৭০ সালের উপর থেকে-আসা বিপ্লবকে অবশ্যই উল্টে দেওয়া নয়, কিন্তু তাকে পরিপুষ্ট ও উন্নত করতে হবে নিচের থেকে এক আন্দোলন দিয়ে।

তাহলে, একটি একীভূত প্রজাতন্ত্র। কিন্তু বর্তমান ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অর্থে নয়, সেটি ১৭৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সম্রাটহীন সাম্রাজ্য ছাড়া আর কিছু নয় (৯৬)। ১৭৯২ থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত প্রতিটি ফরাসী বিভাগ, প্রতিটি সম্প্রদায়, মার্কিন মডেলে পরিপূর্ণ স্বশাসন ভোগ করত, আমাদেরও তাই চাই। স্বশাসন কীভাবে সংগঠিত করতে হয় এবং আমলাতন্ত্র ছাড়াই আমরা কীভাবে কাজ চালাতে পারি, আমেরিকা ও প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্র আমাদের তা দেখিয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ আজও দেখাচ্ছে। এই ধরনের এক প্রাদেশিক ও সম্প্রদায়গত স্বশাসন, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, সুইস ফেডারেলতন্ত্র থেকে অনেক বেশি মুক্ত; একথা সত্যি যে সুইস ফেডারেলতন্ত্রে, ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অঞ্চল খুবই স্বাধীন, কিন্তু জেলা ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা স্বাধীন। আঞ্চলিক সরকারগুলি জেলা শাসক ও প্রিফেক্টদের নিযুক্ত করে, যা ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে অজ্ঞাত এবং আমরা যা এখানে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত করতে চাই প্রুশীয় ল্যান্ডর‍্যাট আর রেগিরুঙ্গসরাটের মতোই।

সম্ভবত এই সব বিষয়ের খুব কমই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আমি এগুলি উল্লেখ করছি প্রধানত জার্মানির ব্যবস্থা বর্ণনা করার জন্যও, যেখানে এই সব বিষয় প্রকাশ্যে আলোচনা করা যায় না এবং যারা এরকম একটি ব্যবস্থাকে বৈধ উপায়ে এক কমিউনিস্ট সমাজে রূপান্তরিত করতে

চায় তাদের আত্মপ্রবঞ্চনার উপরে জোর দেওয়ার জন্যও। তদুপরি, আমি পার্টি কার্যনির্বাহীকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে আইন প্রণয়ন আর বিনামূল্যে বিচার ছাড়াও — এগুলি না হলেও আমরা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারব — অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন রয়েছে। সাধারণভাবে অস্থিতিশীল এই অবস্থায় এই প্রশ্নগুলি যেকোনো সময়ে জরুরী হয়ে উঠতে পারে; এগুলি নিয়ে যদি আমরা আগেই আলোচনা না-করে থাকি এবং সে সম্পর্কে যদি মতৈক্য না-হয়ে থাকে, তখন তাহলে কী হবে?

যাই হোক, কর্মসূচিতে যা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং যে কথা সরাসরি বলা যাবে না, অন্তত পরোক্ষভাবে তার ইঙ্গিত হিসেবে কাজ করতে পারে তা হল নিম্নলিখিত দাবি:

'সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মারফৎ প্রদেশসমূহে, জেলা ও সম্প্রদায়গুলিতে পরিপূর্ণ স্বশাসন। রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের বিলোপসাধন।'

উপরে আলোচিত বিষয়গুলি প্রসঙ্গে অন্যান্য কর্মসূচিগত দাবি সূত্রায়িত করা সম্ভব কি না, সেটা আপনারা ওখানে বসে যতটা বিচার করতে পারবেন, এখানে আমি তার চাইতে কম পারব। কিন্তু বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই পার্টির ভিতরে এই প্রশ্নগুলি নিয়ে বিতর্ক বাঞ্ছনীয় হবে।

১। যথাক্রমে 'নির্বাচনের অধিকার ও ভোটদানের অধিকারের' মধ্যে, 'নির্বাচন ও ভোটদানের' মধ্যে পার্থক্য আমি বুঝতে পারছি না। এরূপ প্রভেদ করা যদি দরকারই হয় তাহলে আরও পরিষ্কার করে তা প্রকাশ করা উচিত কিংবা খসড়ার সঙ্গে সংযোজিত এক ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা উচিত।

২। 'জনগণের প্রস্তাব করার ও বাতিল করার অধিকার'। **কী প্রস্তাব করার ও বাতিল করার?** সমস্ত আইন অথবা জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত — একথা যোগ করা উচিত।

৫। রাষ্ট্র থেকে গির্জার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ। ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাষ্ট্র আচরণ করবে ব্যক্তিগত সমিতির মতো। সরকারী তহবিল থেকে কোনোরূপ সমর্থন এবং সর্বসাধারণের স্কুলগুলির*

*ব্যক্তিগত স্কুলের বিপরীতে। — সম্পাঃ

উপরে সমস্ত প্রভাব থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে। (তাদের **নিজেদের** অর্থে **নিজেদের** স্কুল তৈরি করা এবং সেখানে তাদের নিজেদের আবোল-তাবোল শিক্ষা দেওয়া থেকে তাদের নিবৃত্ত করা যায় না।)

৬। সে ক্ষেত্রে 'শিক্ষায়তনের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র' সংক্রান্ত বিষয়টি আর ওঠে না, কারণ এটি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৮। ও ৯। এখানে আমি নিম্নলিখিত বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই: এই বিষয়গুলি দাবি করে যে রাষ্ট্রকে অধিগ্রহণ করতে হবে এইগুলি: ১) **ওকালতি ব্যবসায়,** ২) **চিকিৎসা-ব্যবস্থা,** ৩) **ঔষধ-প্রস্তুতবিদ্যা, দন্তচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, নার্সিং** ইত্যাদি, ইত্যাদি, এবং পরে দাবি তোলা হয় যে শ্রমিকদের বীমাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব করা হোক। এই সমস্ত কাজের ভার কি হের ফন কাপ্রিভির উপরে ন্যস্ত করা যায়? এবং তা কি উপরে কথিত সমস্ত রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র বাতিলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ?

১০। এখানে আমি বলব: 'তার জন্য যতদূর পর্যন্ত কর দরকার, ততদূর পর্যন্ত রাষ্ট্র, জেলা ও সম্প্রদায়ের সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রগতিশীল... কর। সমস্ত পরোক্ষ রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় কর, শুল্ক প্রভৃতির বিলোপসাধন।' বাকিটা প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাষ্য কিংবা উদ্দেশ্যবর্ণনা, এর অন্তফলকে যা দুর্বল করে ফেলে।

৩। অর্থনৈতিক দাবি

২ নং বিষয়ে। **রাষ্ট্রের** কাছ থেকেও সমিতি গঠনের অধিকারের নিশ্চিতি জার্মানিতে যত বেশি দরকার, তেমনটি আর কোথাও নয়।

শেষ বাক্যাংশটি: 'নিয়ন্ত্রণের জন্য', ইত্যাদি **৪ নং বিষয় হিসেবে** যোগ করা উচিত এবং তদনুরূপ আকার দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে অর্ধেক সংখ্যক শ্রমিক ও অর্ধেক সংখ্যক উদ্যোগপতিদের নিয়ে গঠিত শ্রম চেম্বারগুলিতে আমরা বেশ ভালোভাবেই প্রতারিত হব। আগামী বহু বছর উদ্যোগপতিরা সবসময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, কারণ শ্রমিকদের মধ্যে একটিমাত্র কুলাঙ্গারই তার জন্য দরকার হবে। এবিষয়ে যদি আগে না-বলা হয় যে বিরোধ হলে **উভয় অর্ধই পৃথক** মতামত ব্যক্ত করবে, তাহলে

উদ্যোগপতিদের একটি কক্ষ এবং **অধিকন্তু শ্রমিকদের এক স্বতন্ত্র কক্ষ** থাকাই অনেক ভালো হবে।

উপসংহারে আমি অনুরোধ করতে চাই যে খসড়াটি আর একবার ফরাসী কর্মসূচির (৯৭) সঙ্গে তুলনা করে দেখা হোক, তাতে মনে হয় বিশেষ করে তৃতীয় অংশের জন্যই আরও ভালো কিছু আছে। সময়াভাবে, দুর্ভাগ্যবশত, স্প্যানিশ কর্মসূচিটি (৯৮) আমি খুঁজতে পারছি না, সেটিও অনেক দিক দিয়ে বেশ ভালো।

প্রথম অংশের পরিশিষ্ট

১। 'খনিগহ্বর, খাত' বাদ — 'রেলপথ ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়' যোগ করা উচিত।

২। শ্রমের সামাজিক উপায়সমূহ তার উপযোজকদের (অথবা তার মালিকদের) হাতে শোষণের উপায় হয়ে উঠেছে। শ্রমের উপায়সমূহের, অর্থাৎ তার দ্বারা শর্তাবদ্ধ, জীবিকার উপায়সমূহের উপযোজক কর্তৃক শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অধীনতাই সবধরনের দাসত্বের: সামাজিক দুর্দশা, মানসিক অধঃপতন ও রাজনৈতিক নির্ভরতার ভিত্তি।

৩। এই শোষণে শোষিতদের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতিতে কেন্দ্রীভূত হয় শোষকদের — পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের হাতে; শোষক ও শোষিতদের মধ্যে শ্রমের উৎপন্ন ফলের বণ্টন আরও বেশি অসম হয়ে ওঠে, এবং প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা ও তার নিরাপত্তাহীনতা আরও বেড়ে যায়, ইত্যাদি।

৪। **'ব্যক্তিগত'** (উৎপাদন-ব্যবস্থা) বাদ... শহুরে ও গ্রামীণ মধ্য স্তর, পেটি বুর্জোয়া ও ছোট কৃষকদের ধ্বংসের দরুন অবনতি হয়, বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যেকার গহ্বরকে আরও বেশি বিস্তৃত (অথবা গভীর) করে তোলে, সাধারণ নিরাপত্তাহীনতাকে সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা করে তোলে এবং প্রমাণ করে যে শ্রমের সামাজিক উপায়সমূহের উপযোজকরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দক্ষতা ও যোগ্যতা হারিয়েছে।

৫। 'তার' কারণ।

৬। ...এবং ব্যক্তি বা জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলির তরফে পুঁজিবাদী

উৎপাদনের সামগ্রিকভাবে সমাজের তরফে এবং এক পূর্বাচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে রূপান্তর, যে রূপান্তরের জন্য পুঁজিবাদী সমাজ নিজেই বৈষয়িক ও আত্মিক শর্তগুলি সৃষ্টি করে, এবং একমাত্র এরই দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ও তার সঙ্গে ব্যতিক্রমহীনভাবে সমাজের সকল সদস্যের মুক্তি অর্জন করা যাবে।

৭। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শুধু শ্রমিক শ্রেণীরই নিজের কাজ হতে পারে। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে শ্রমিক শ্রেণী তার মুক্তির ভার তার বিরুদ্ধবাদী ও শোষক, পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের হাতে, কিংবা বড় শোষকদের তরফ থেকে প্রতিযোগিতায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাদের সামনে শোষকদের দলে অথবা শ্রমিকদের দলে যোগ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না সেই পেটি বুর্জোয়া ও ছোট কৃষকদের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না।

৮। ...নিজেদের শ্রেণী-অবস্থান সম্পর্কে সচেতন শ্রমিকদের সঙ্গে, ইত্যাদি।

৯। ...রাখে ...এবং তার দ্বারা সেই একই হাতে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়নকে কেন্দ্রীভূত করে।

১০। ...শ্রেণী-শাসন ও শ্রেণীগুলির নিজেদেরই এবং সকলের সমান অধিকার ও সমান কর্তব্যের জন্য, ...বংশোদ্ভব ছাড়াই ইত্যাদি... (শেষটুকু বাদ)। মানবজাতির ...জন্য তার সংগ্রামে তাকে বাধা দেয় জার্মানির পশ্চাৎপদ রাজনৈতিক অবস্থা। প্রথমত ও প্রধানত, তাকে আন্দোলনের জন্য স্থান অধিকার করে নিতে হবে, সামন্ততন্ত্র ও সার্বভৌমতন্ত্রের সুবিশাল অবশেষ-গুলির বিলুপ্তি ঘটাতে হবে, সংক্ষেপে, জার্মান বুর্জোয়া পার্টিগুলি যে কাজ সম্পন্ন করার পক্ষে অতি কাপুরুষ ছিল এবং এখনও আছে, সেই কাজ করতে হবে। অতএব তাকে, অন্তত বর্তমানে তার কর্মসূচিতে এমন সব দাবিও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অন্যান্য সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশে যেগুলি বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিমধ্যেই রূপায়িত করেছে।

১৮ থেকে ২৯ জুন, ১৮৯১-এর মধ্যে লিখিত

জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

প্রথম প্রকাশ (পরিশিষ্ট ছাড়া):
Die Neue Zeit, খণ্ড ১, সংখ্যা ১,
১৯০১-১৯০২

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইয়ের ভূমিকা

যে বইটির ইংরেজি অনুবাদ বর্তমানে পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে, জার্মানিতে তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৫ সালে। লেখক সে সময় ছিলেন তরুণ, ২৪ বছর বয়স, এবং সেই তারুণ্যের ছাপ ভালো এবং মন্দ দিক মিলিয়ে তাঁর লেখায় পরিস্ফুট। এর ভালো বা মন্দ কোনো দিকের জন্যই লেখক লজ্জিত নন। ১৮৮৬ সালে জনৈকা আমেরিকান মহিলা, শ্রীমতী ফ্লোরেন্স কেলি-ভিশ্‌নেভেৎস্কি কর্তৃক বইটি ইংরেজিতে অনূদিত এবং পরের বছর নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়। আমেরিকান সংস্করণটি আটলাণ্টিকের এপারে খুব ব্যাপকভাবে প্রচারিতও হয় নি, আর তাছাড়া বর্তমানে সেটি নিঃশেষ হয়ে গেছে বললেই হয়, তাই সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের পূর্ণসম্মতিক্রমে বর্তমান সর্বস্বত্বসংরক্ষিত ইংরেজি সংস্করণটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

আমেরিকান সংস্করণটির জন্য লেখক ইংরেজি ভাষায় একটি নতুন ভূমিকা এবং একটি পরিশিষ্ট লিখে দেন। প্রথমটির সঙ্গে বইয়ের বিষয়বস্তুর বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না; তাতে তদানীন্তন আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। তাই বর্তমান সংস্করণে অপ্রাসঙ্গিক বোধে সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি — মূল ভূমিকাটি — অনেকখানি ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমান মুখবন্ধে।

ইংলণ্ডের কথা বিচার করলে, এই বইয়ে বর্ণিত অবস্থা বর্তমানে বহুদিক থেকে অতীতে পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের কোনো প্রচলিত

পুঁথিতে স্পষ্টভাবে স্বীকার না করলেও আধুনিক অর্থশাস্ত্রে আজ এ নিয়ম বলবৎ যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন যত বৃহদায়তনে চলে, ততই ছোটখাট চুরি-জোচ্চুরির নানা কৌশল — যা তার প্রাথমিক স্তরের বৈশিষ্ট্য, — সেগুলিকে সমর্থন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ইউরোপে ব্যবসার সর্বনিম্ন স্তরের প্রতিনিধি, পোলীয় ইহুদির যেসব ছ্যাঁচড়া ব্যবসা-কৌশল নিজের দেশে বেশ কার্যকর এবং সাধারণভাবে প্রচলিত, বার্লিন বা হাম্‌বুর্গে এসে সে দেখে সেগুলিই আবার নিতান্ত সেকেলে এবং অকেজো হয়ে পড়েছে। এবং ঠিক তেমনিই আবার, হাম্‌বুর্গ বা বার্লিন থেকে আগত ইহুদি বা খ্রীষ্টান দালালদেরও ম্যাঞ্চেস্টারের শেয়ার-বাজারে কয়েকমাস ঘুরে এ চৈতন্য হয় যে, কাপাসের সুতো বা কাপড় সস্তায় কিনতে হলে তাদেরও ঐসব সামান্য পালিশ করা কিন্তু আসলে হীন ফন্দী-ফিকির ও অপকৌশলগুলি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়, যদিও তাদের নিজেদের দেশে এগুলিই বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচিত হয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, কোনো বড়রকমের বাজারে, যেখানে সময়ই টাকা, যেখানে কেবলমাত্র সময় এবং ঝামেলা বাঁচাবার জন্যই ব্যবসাগত নীতির একটা মান অনিবার্যভাবেই গড়ে ওঠে, সেখানে ঐসব কৌশল আর কাজ দেয় না। কারখানা মালিক আর তার মজুরদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

১৮৪৭ সালের সংকটের পর, ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন থেকে এক নতুন শিল্পযুগের উন্মেষ হয়। ইংলন্ডের শিল্প ও বাণিজ্য যে খোলা জমি চেয়েছিল, শস্য আইন (৯৯) বাতিল ও তার পরবর্তী বিভিন্ন আর্থিক সংস্কারের ফলে তা পেয়ে গেল। তারপরই একের পর এক দ্রুতগতিতে এল কালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কার। বিভিন্ন ঔপনিবেশিক বাজারে ইংলন্ডের শিল্পজাত পণ্য গ্রহণের ক্ষমতা দ্রুতহারে বেড়ে চলল। ভারতে লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় অবশেষে ল্যাংকাশায়ারের যন্ত্রচালিত তাঁতের দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেল। ক্রমেই বেশি করে উন্মুক্ত হতে থাকল চীন। সর্বোপরি, যে যুক্তরাষ্ট্র তখনও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে ঔপনিবেশিক বাজার মাত্র, কিন্তু সবচেয়ে বড় বাজার, সেখানে এই দ্রুতবিকাশশীল দেশের

পক্ষেও বিস্ময়কর এক অর্থনৈতিক উন্নতি দেখা দিল। এবং অবশেষে, পূর্ববর্তী যুগে প্রবর্তিত নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি — রেলপথ ও সমুদ্রগামী স্টিমার — এখন আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সংগঠিত হল; তারই ফলে, এতদিন যে বিশ্ববাজারের সুপ্ত সম্ভাবনামাত্র ছিল তা বাস্তবিক রূপ নিল। গোড়াতে এই বিশ্ববাজার ছিল একটি শিল্পকেন্দ্র ইংলন্ডকে ঘিরে কয়েকটি প্রধানত বা সম্পূর্ণত কৃষিপ্রধান দেশ নিয়ে গঠিত। ইংলন্ডই এদের উদ্বৃত্ত অপরিমার্জিত পণ্যের বেশির ভাগটা নিত এবং পরিবর্তে এদের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার অধিকাংশও সরবরাহ করত। তাই শিল্পক্ষেত্রে ইংলন্ডের যে এমন বিপুল ও অতুলনীয় অগ্রগতি হল, যার তুলনায় ১৮৪৪-এর অবস্থাও আজ আমাদের কাছে আদিম ও তুচ্ছ মনে হচ্ছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবং যে-অনুপাতে এই অগ্রগতি হল, বৃহদায়তন শিল্পও ততই নীতিনিষ্ঠ হয়ে উঠল বলে মনে হল। মজুরদের কাছ থেকে ছ্যাঁচড়া চুরি করে মালিকে মালিকে প্রতিযোগিতায় আর কোন লাভ রইল না। টাকা করার এই হীন পথকে ব্যবসা ইতিমধ্যে অতিক্রম করে এসেছে; লক্ষপতি মালিকের আর এসব কাজ পোষায় না, যেকোনো রকমে এক-আধ পয়সা করে নিতে পারলেই যেসব ছোট ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট, তাদেরই মধ্যে প্রতিযোগিতা জীইয়ে রাখা ছাড়া এসবের আর কোনো উপযোগিতা রইল না। এইভাবে মাল দিয়ে শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধের প্রথা [truck-system] দমন করা হল, দশ ঘণ্টা কাজের আইন পাশ হল (১০০), আরও একাধিক ছোটখাট সংস্কার প্রবর্তিত হল। এ ব্যবস্থাগুলি অবাধ বাণিজ্য ও বল্গাহীন প্রতিযোগিতার একান্ত বিরোধী, কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণেই কম সৌভাগ্যশালী ভাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অতিকায় পুঁজিপতির অনুকূল। উপরন্তু, প্রতিষ্ঠান যত বড়, এবং তার সঙ্গে কর্মরত লোকের সংখ্যা যত বেশি, মালিক ও মজুরের মধ্যে প্রতিটি বিরোধে ক্ষতি ও অসুবিধার পরিমাণও ততই বেশি। আর এইভাবেই মালিকদের মধ্যে, বিশেষত বড় মালিকদের মধ্যে এক নতুন মনোভাব দেখা দিল, তারা অপ্রয়োজনীয় বিবাদ-বিসংবাদ এড়াতে, ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা মেনে নিতে এবং শেষ পর্যন্ত, সুবিধামতো সময়ে হলে এমন কি ধর্মঘটের মধ্যেও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির

শক্তিশালী উপায় আবিষ্কার করতে শিখল। গোড়ার দিকে যে বৃহত্তম শিল্পপতিরাই ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নায়ক তারাই এবার শান্তি ও সামঞ্জস্য প্রচারে অগ্রণী হয়ে উঠল। তার কারণও ছিল। ন্যায় ও হিতৈষার বেদীমূলে এতসব ত্যাগ প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত করার উপায় ছাড়া এবং তাদের যেসব ছোট ছোট প্রতিযোগীরা এই ধরনের উপরি পাওনা ছাড়া আয়ব্যয়ের সমতারক্ষা করতে পারে না, তাদের আরও সহজে এবং নিরাপদে চূর্ণ করার উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। এদের কাছে আগেকার মতো যৎসামান্য অতিরিক্ত জবরদস্তি আদায়ের কোনো গুরুত্ব আর রইল না, বরং সেগুলো বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে, প্রথম দিকে যেসব ছোটখাট অভাব-অভিযোগ শ্রমিকদের অবস্থাকে আরও বিষময় করে তুলত, সেগুলি দূর করার পক্ষে পুঁজিবাদী ভিত্তিতে উৎপাদন বিকাশটাই যথেষ্ট বলে দেখা গেল, অন্তত প্রধান প্রধান শিল্পের ক্ষেত্রে, কেননা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পূর্ণ শাখায় অবস্থাটা মোটেই অনুরূপ নয়। এবং শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশার কারণ যে এই ছোটখাট অভাব-অভিযোগের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাবে **পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই মধ্যে,** এই মহৎ কেন্দ্রীয় সত্যটা এইভাবেই ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মজুরি-শ্রমিক দৈনিক একটা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে পুঁজিপতির কাছে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। কয়েক ঘণ্টা কাজের পরই সে সেই অর্থের মূল্য পুনরুৎপাদন করে ফেলে; কিন্তু শ্রমদিন পূরণ করার জন্য তাকে পরপর আরও কয়েক ঘণ্টা কাজ করতে হবে, এই হচ্ছে তার চুক্তির সারকথা, এবং এই উদ্বৃত্ত শ্রমের অতিরিক্ত ঘণ্টাগুলিতে সে যে মূল্য উৎপাদন করে সেটাই হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্য, এর জন্য পুঁজিপতিকে কোনো দাম দিতে হয় না, অথচ এটা তার পকেটে যায়। যে ব্যবস্থা সভ্য সমাজকে এক দিকে উৎপাদন ও জীবনধারণের সমস্ত উপায়ের মালিক, মুষ্টিমেয় কয়েক জন রথ্সচাইল্ড ও ভ্যান্ডারবিল্ট এবং অন্য দিকে নিজেদের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কিছুরই মালিক নয় এমন অগণিত মজুরি-শ্রমিকের মধ্যে বিভক্ত করে দিচ্ছে, এই হচ্ছে সেই ব্যবস্থার ভিত্তি। ১৮৪৭ সাল থেকে ইংলণ্ডে পুঁজিবাদের বিকাশ এই সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে যে, এ কোনো ছোটখাট অভাব-অভিযোগের ফল নয়, ব্যবস্থারই ফল।

আবার, কলেরা, টাইফাস, বসন্ত প্রভৃতি মহামারির বারবার প্রাদুর্ভাব ব্রিটিশ বুর্জোয়াকে শিখিয়েছে যে, নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে এইসব রোগের কবল থেকে বাঁচাতে হলে তার ছোটবড় শহরগুলির জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা-ব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন। তাই এই বইয়ে বর্ণিত সবচেয়ে তীব্র অনাচারগুলি হয় অদৃশ্য হয়েছে, নয়তো তেমন চোখে পড়ে না। জলনিকাশ ব্যবস্থার প্রবর্তন বা উন্নয়ন হয়েছে; আমি যেসব অতিজঘন্য বস্তির বিবরণ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, তার অনেকগুলির উপর দিয়ে চওড়া রাস্তা পাকা হয়েছে। 'ছোট আয়র্ল্যান্ড' অদৃশ্য হয়েছে এবং উচ্ছেদ তালিকায় এরপরই 'সেভেন ডায়ালসের' (১০১) স্থান। কিন্তু তাতে কী হল? ১৮৪৪-এ যেসব পাড়াকে আমি কাব্যময় বলে বর্ণনা করতে পেরেছিলাম, শহরের কলেবরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেসব পাড়ার অনেকগুলিই আজ সেই একই জীর্ণতা, অসুবিধা ও দুর্দশার মধ্যে নেমে এসেছে। তফাৎ কেবল এই যে, আজকাল আর শুয়োর বা আবর্জনার স্তূপ বরদাস্ত করা হয় না। শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশাকে ঢাকা দেবার কৌশলে বুর্জোয়া শ্রেণী আরও অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর বাসস্থানের ব্যাপারে বিশেষ কোনো উন্নতি যে হয় নি তা 'গরিবদের গৃহ-ব্যবস্থা সম্পর্কে' ১৮৮৫-এর রাজকীয় কমিশনের রিপোর্টেই বেশ প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য ব্যাপারেও সেই একই অবস্থা। পুলিসী বিধি নির্দেশের খুবই ছড়াছড়ি, কিন্তু তা দিয়ে শ্রমিকদের দুরবস্থাকে বেড়াবন্দী করে রাখা যেতে পারে, দূর করা যায় না।

পুঁজিবাদী শোষণের যৌবনের যে বর্ণনা আমি দিয়েছি, ইংলণ্ড এইভাবে তাকে অতিক্রম করে গেলেও অন্যান্য দেশ সবেমাত্র সে স্তরে পৌঁছেছে। ফ্রান্স, জার্মানি এবং বিশেষত আমেরিকা আজ বিপজ্জনক প্রতিযোগী, — ১৮৪৪ সালেই আমি এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, — তারা শিল্পজগতে ইংলণ্ডের একাধিপত্যকে ক্রমেই বেশি করে ভেঙে দিচ্ছে। ইংলণ্ডের তুলনায় এদের শিল্প নবীন, কিন্তু সে শিল্প বাড়ছে ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত হারে; এবং লক্ষণীয় এই যে, ঠিক বর্তমানে তারা ১৮৪৪-এর ইংরেজ শিল্পের প্রায় সমপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আমেরিকার কথা ধরলে, এই তুলনা সত্যই খুব চোখে লাগে। একথা সত্য যে, আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণী

যে বহিঃপরিবেশের মধ্যে আছে তা অনেক স্বতন্ত্র, কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই একই অর্থনৈতিক নিয়ম কাজ করে চলেছে, তার ফলও সর্ববিষয়ে একেবারে এক না হলেও মোটামুটি একধরনের হতে বাধ্য। তাই আমরা আমেরিকায়ও দেখছি হ্রস্বতর শ্রমদিনের জন্য, আইনের দ্বারা কাজের সময়, বিশেষত কারখানায় নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের বেলায়, বেঁধে দেওয়ার জন্য সেই একই সংগ্রাম চলেছে; ট্রাক-সিসটেমের পূর্ণ বিকাশ দেখা যাচ্ছে এবং 'কর্তারা' শ্রমিকদের উপর আধিপত্য বিস্তারের উপায় হিসেবে গ্রামাঞ্চলে 'কুটির প্রথার' (১০২) সুযোগ নিচ্ছে। ১৮৮৬ সালে, কনেলস্‌ভিল জেলায় ১২,০০০ পেনসিলভানিয়ান কয়লা খনি-শ্রমিকের বিরাট ধর্মঘটের (১০৩) বিবরণ সংবলিত আমেরিকান সংবাদপত্রগুলি পেয়ে আমার মনে হল যেন উত্তর ইংলন্ডের কয়লা-শ্রমিকদের ১৮৪৪-এর ধর্মঘট সম্পর্কে আমার নিজেরই লেখা বিবরণ পড়ছি।* ভুল বাটখারার সাহায্যে শ্রমজীবী মানুষকে ঠকাবার সেই একই ব্যবস্থা; সেই একই ট্রাক-সিসটেম; শ্রমিকদের বাসগৃহ থেকে, অর্থাৎ কোম্পানির মালিকানাধীন কুটিরগুলি থেকে উচ্ছেদ — মালিকদের এই শেষ, কিন্তু অমোঘ হাতিয়ার প্রয়োগ করে খনি-শ্রমিকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার সেই একই প্রচেষ্টা।

বর্তমান অনুবাদে বইটিকে আমি সময়োপযোগী করার বা ১৮৪৪-এর পর যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তা বিশদে বিবৃত করার কোনো চেষ্টা করি নি। করি নি দুটি কারণে: প্রথমত, তা ভালো করে করতে গেলে বইখানির কলেবর দ্বিগুণ বেড়ে যাবে, এবং দ্বিতীয়ত, কার্ল মার্কস রচিত 'পুঁজি' বইটির প্রথম খণ্ডে, তার একটা ইংরেজি অনুবাদ বাজারে আছে, তাতে ১৮৬৫ সাল নাগাদ, অর্থাৎ ব্রিটিশ শিল্প সমৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে বেশ অনেকখানি বর্ণনা রয়েছে। ফলে, মার্কসের বিখ্যাত বইটিতে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমার আবার সেই সব বিষয়ই আলোচনা করতে হত।

একথা উল্লেখের বোধহয় বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই যে, এই বইয়ে সাধারণ তাত্ত্বিক — দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক — যে দৃষ্টিভঙ্গি

---

* ফ. এঙ্গেলস, 'ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'। — সম্পাঃ

প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে আমার আজকের দৃষ্টিভঙ্গির সর্বত্র মিল নেই। আধুনিক আন্তর্জাতিক যে সমাজতন্ত্র, প্রধানত মার্কসের প্রায় একক চেষ্টার ফলে, বিজ্ঞানরূপে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে, তার অস্তিত্ব ১৮৪৪-এ ছিল না। আমার এই বইখানি তারই ভ্রূণাবস্থার এক পর্যায় মাত্র; এবং মানব-ভ্রূণের প্রথমাবস্থায় যেমন তার মৎস্য পূর্বপুরুষদের ফুলকোর বেষ্টনী অস্থি পুনরাবির্ভূত হয়, তেমনি আধুনিক সমাজতন্ত্রের অন্যতম পূর্বপুরুষ — জার্মান দর্শন থেকে উদ্ভবের চিহ্নও এই বইয়ে সর্বত্র পরিস্ফুট। যেমন, কমিউনিজম শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগত মতবাদমাত্র নয়, বরং পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত সমস্ত সমাজের বর্তমান সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্তির একটি তত্ত্ব — এই কথার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। কথাটা বিমূর্তভাবে দেখলে নিশ্চয়ই ঠিক, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে অর্থহীন এবং অনেক সময় তার চেয়েও খারাপ। বিত্তবান শ্রেণীগুলি যতদিন মুক্তির প্রয়োজন অনুভব না করে, উপরন্তু শ্রমিক শ্রেণীর নিজ মুক্তি সাধনে প্রাণপণে বাধা দেয়, ততদিন শ্রমিক শ্রেণীকে একাই সমাজবিপ্লবের প্রস্তুতি এবং সংগ্রাম করতে হবে। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বুর্জোয়ারাও ঘোষণা করেছিল যে, বুর্জোয়াদের মুক্তিই সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি; কিন্তু অভিজাতরা এবং পাদ্রীরা সেকথা বুঝতে চায় নি; সাময়িকভাবে, সামন্ততন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপাদ্যটি বিমূর্ত ঐতিহাসিক সত্য হলেও অল্পদিনের মধ্যে তা নিতান্তই ভাবপ্রবণতায় পরিণত হল এবং বিপ্লবী সংগ্রামের আগুনে একেবারেই মিলিয়ে গেল। আর বর্তমানে, যেসব লোক নিজেদের উঁচু দৃষ্টিভঙ্গির 'নিরপেক্ষতা' থেকে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রামের বহু ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান এবং উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর স্বার্থকে মহত্তর মানবতার মধ্যে মিলিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট এক সমাজতন্ত্রের বাণী প্রচার করে, তারা হয় নিতান্তই আনাড়ী এবং তাদের অনেক কিছু শেখার বাকি, নয়তো তারা শ্রমিকের নিকৃষ্ট শত্রু — ভেড়ার ছদ্মবেশে নেকড়ে বাঘ।

লেখার মধ্যে মহা শিল্প-সংকটের পুনরাবৃত্তিকাল পাঁচ বছর বলা হয়েছে। ১৮২৫ থেকে ১৮৪২-এর ঘটনাবলীর বিচারে বাহ্যত এইরকমই মনে হয়েছিল, কিন্তু ১৮৪২ থেকে ১৮৬৮-এর শিল্প-ইতিহাস প্রমাণ

করেছে যে, আসল পুনরাবৃত্তিকাল হচ্ছে ১০ বছর; অন্তর্বর্তীকালীন ধাক্কাগুলি ছিল গৌণ এবং ক্রমে আরও মিলিয়ে যাবার দিকেই তাদের ঝোঁক। ১৮৬৮ সালের পর আবার পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। সে সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা যাবে।

এই লেখায় যৌবনসুলভ উৎসাহবশে আমি একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, তার মধ্যে একটি ছিল ইংলণ্ডে সমাজবিপ্লবের আসন্নতা সম্পর্কে; বর্তমান সংস্করণে সেগুলি যাতে বাদ না পড়ে সেবিষয়ে আমি নজর রেখেছি। ভবিষ্যদ্বাণীর বেশ কয়েকটিই যে ভুল প্রমাণিত হয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, বরং তার মধ্যে এতগুলি যে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবং ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের, বিশেষত আমেরিকার প্রতিযোগিতার ফলে ইংলণ্ডের বাণিজ্যে সংকট দেখা দেবে বলে আমি যে কথা বলেছিলাম তা যে, তত দ্রুত না হলেও, বাস্তবে পরিণত হয়েছে, এইটাই আশ্চর্যের কথা। এই প্রসঙ্গে লণ্ডনের *Commonweal* (১০৪) পত্রিকার ১ মার্চ, ১৮৮৫, সংখ্যায় '১৮৪৫ ও ১৮৮৫-এর ইংলণ্ড' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি আমি প্রকাশ করেছিলাম সেটি এখানে উপস্থিত করে বর্তমান লেখাটিকে সময়োপযোগী করা সম্ভব এবং একান্ত কর্তব্য। ঐ প্রবন্ধে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর এই ৪০ বছরের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রও পাওয়া যাবে। প্রবন্ধটি নিচে দেওয়া হল:

'৪০ বছর আগে ইংলণ্ড এক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, সব কিছু দেখে মনে হচ্ছিল যে বলপ্রয়োগ ছাড়া সে সংকটের সমাধান অসম্ভব। শিল্প-উৎপাদনের বিপুল ও দ্রুত বিকাশ তখন বিদেশী বাজারের বিস্তার ও চাহিদার বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতি দশ বছর অন্তর একটা সর্বব্যাপী বাণিজ্য বিপর্যয় শিল্পের অগ্রগতি প্রচণ্ড ব্যাহত করেছিল, তাকে অনুসরণ করে আসছিল কয়েক বছরের একটানা মন্দার পর সামান্য কয়েক বছরের সমৃদ্ধি এবং প্রতিবারই তার পরিণামে উন্মত্ত অতিরিক্ত উৎপাদন এবং তার ফলে নূতনতর ভাঙন। পুঁজিপতি শ্রেণী শস্যে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তনের জন্য কলরব করছিল এবং শহরের বুভুক্ষু জনতাকে তারা যেখান থেকে এসেছিল সেই গ্রামাঞ্চলে, জন ব্রাইটের ভাষায় অন্নের

ভিখারী নিঃস্বরূপে নয়, শত্রুদেশ দখলকারী সেনাদলের মতো, ফেরৎ পাঠিয়ে জোর করে ঐ দাবি প্রতিষ্ঠার হুমকি দিচ্ছিল। শহরের শ্রমজীবী জনতা দাবি করল রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের ভাগ — জনগণের সনদ (১০৫); তাদের সমর্থন করল ছোট ব্যবসায়ী শ্রেণীর অধিকাংশ, দুপক্ষের মধ্যে মতভেদ ছিল শুধু এই বিষয়ে যে, শারীরিক বলপ্রয়োগে সনদ হাসিল করা হবে, না নৈতিক বলপ্রয়োগে। তারপর এল ১৮৪৭-এর বাণিজ্য বিপর্যয়, আয়ার্ল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ এবং এ-দুয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের সম্ভাবনা।

'১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লব ইংরেজ মধ্য শ্রেণীকে বাঁচিয়ে দিল। বিজয়ী ফরাসী শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রী ঘোষণাবলী ইংলণ্ডের ছোট মধ্য শ্রেণীকে ভয় পাইয়ে দিল এবং ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর সংকীর্ণতর কিন্তু বেশি ব্যবহারিক আন্দোলনকে বিশৃঙ্খল করে দিল। যে সময় সর্বশক্তিতে চার্টিস্ট মতবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করার কথা, ঠিক সেই সময়, ১৮৪৮-এর ১০ এপ্রিল তারিখের বাহ্য মৃত্যুর আগেই (১০৬) তার অভ্যন্তরীণ মৃত্যু ঘটল। শ্রমিক শ্রেণীর কর্মতৎপরতা পিছনে সরে গেল। গোটা রণসীমান্ত জুড়ে জয় হল পুঁজিপতি শ্রেণীর।

'১৮৩১-এর রিফর্ম বিলে (১০৭) ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণীর উপর সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর জয় সূচিত হয়েছিল। শস্য আইন প্রত্যাহার কেবল ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়, ব্যাঙ্ক মালিক, ফাটকা দালাল, লভ্যাংশজীবী প্রভৃতি পুঁজিপতি শ্রেণীর যেসব অংশ জমিসংশ্লিষ্ট স্বার্থের সঙ্গে কমবেশি জড়িত, তাদের বিরুদ্ধেও শিল্প-পুঁজিপতিদের জয়ের নিদর্শন। এই শিল্প-পুঁজিপতিরাই তখন জাতির প্রতিভূ। অবাধ বাণিজ্যের অর্থ দাঁড়াল এই শিল্প-পুঁজিপতিদের স্বার্থে ইংলণ্ডের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ও আর্থিক নীতির আমূল পুনর্বিন্যাস, এবং সোৎসাহে সেই পথে তারা অগ্রসর হল। শিল্প-উৎপাদনের পথে সমস্ত বাধা নির্মমভাবে অপসারিত হল। শুল্ক ও সমগ্র কর-ব্যবস্থায় বিপ্লবী পরিবর্তন সাধিত হল। সমস্ত কাঁচা উৎপাদন দ্রব্য, বিশেষত শ্রমিক শ্রেণীর জীবিকার উপকরণগুলি সুলভ করা, কাঁচামালের দাম কমানো এবং শ্রমিকদের মজুরি তখনও পর্যন্ত

কমাতে না পারলেও অন্তত আর বাড়তে না দেওয়া — শিল্প-পংজিপতির পক্ষে অত্যাবশ্যক এই অনন্য লক্ষ্যসাধনে সব কিছুকে অধীনস্থ করা হল। ইংলন্ডের হওয়া চাই 'সারা দুনিয়ার শিল্পশালা', ইতিমধ্যেই ইংলন্ডের জন্য আয়ার্ল্যান্ড যা হয়ে উঠেছিল, অন্য সব দেশও হবে ঠিক তাই, অর্থাৎ হবে তার শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার এবং বিনিময়ে তারা তাকে কাঁচামাল ও খাদ্য সরবরাহ করবে। ইংলন্ড — এক কৃষিপ্রধান বিশ্বের মহান শিল্পকেন্দ্র, ক্রমেই আরও বেশি সংখ্যক শস্য ও কাপাস উৎপাদনকারী আয়ার্ল্যান্ডদের দ্বারা প্রদক্ষিত শিল্পসূর্য। কী গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!

'ইউরোপের মূলখন্ডের বেশি সংকীর্ণমনা সহযাত্রীদের তুলনায় অনেক প্রবল কান্ডজ্ঞান এবং প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে অবজ্ঞা বরাবরই ইংলন্ডের শিল্প-পংজিপতিদের বৈশিষ্ট্য, তাই নিয়ে তারা তাদের এই মহান লক্ষ্যসাধনে আত্মনিয়োগ করল। চার্টিস্ট মতবাদ তখন মুমূর্ষু। ১৮৪৭-এর ধাক্কা মন্দীভূত হয়ে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সমৃদ্ধি ফিরে এল, তাকে দেখানো হল একমাত্র অবাধ বাণিজ্যের ফল বলে। এই দুই কারণ মিলে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে শিল্পমালিকদের নেতৃত্বাধীন 'মহান উদারনৈতিক পার্টির' লেজুড়ে পরিণত করল। একবার যখন এই সুবিধা পাওয়া গেল তখন তা স্থায়ী করা দরকার। চার্টিস্টপন্থীরা অবাধ বাণিজ্যের বিরোধিতা করে নি, কিন্তু তাকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে পরিণত করার বিরোধিতা করেছিল, এর থেকে শিল্প-পংজিপতিদের এ শিক্ষা হয়েছিল এবং ক্রমশই আরও বেশি করে হচ্ছিল যে, শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য ছাড়া মধ্য শ্রেণীরা কখনও সারা জাতির উপর তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এইভাবে এই দুই শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা ক্রমিক পরিবর্তন ঘটল। কারখানা আইনগুলি একসময় ছিল প্রত্যেক শিল্পমালিকের চক্ষুশূল। এখন সেই আইনের কাছে শুধু যে স্বেচ্ছায় নতিস্বীকার করা হল তাই নয়, প্রায় প্রত্যেক শিল্পে প্রযোজ্য রূপে সেগুলির পরিবর্ধনও সহ্য করা হল। এতদিন ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বয়ং শয়তানের আবিষ্কার মনে করা হত, এখন সেগুলি সম্পূর্ণ আইনসম্মত সংগঠন এবং শ্রমিকদের মধ্যে

সুষ্ঠু অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচারের কার্যকর উপায় বলে আদর ও আনুকূল্য পেতে লাগল। ১৮৪৮ পর্যন্ত ধর্মঘটের মতো পাপাচার আর কিছু ছিল না, এখন ক্রমে তারও কালবিশেষে সবিশেষ উপযোগিতা আবিষ্কৃত হতে লাগল, বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে মালিকরাই, তাদের নিজেদের সুযোগমতো, উস্কানি দিয়ে সেই ধর্মঘট লাগিয়ে দিচ্ছে। যেসব বিধিবদ্ধ আইন মালিকের চেয়ে শ্রমিককে নিচের স্তরে বা অসুবিধাজনক স্থানে রেখেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিকটু আইনগুলি অন্তত প্রত্যাহৃত হল। এবং যে শিল্পপতিরা শেষ পর্যন্ত জনগণের সনদের বিরোধিতা করেছিল, সেই অসহনীয় 'সনদটি' কার্যত তাদেরই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হল। **'সম্পত্তি শর্তের অবসান'** ও **'ব্যালটে ভোটগ্রহণ'** আজ দেশের আইনের অঙ্গীভূত। ১৮৬৭ এবং ১৮৮৪-এর সংস্কার আইন (১০৮) — **'সর্বজনীন ভোটাধিকারের'** অন্তত জার্মানিতে তা যেভাবে এখন বর্তমান, তার কাছাকাছি পোঁছেছে, বর্তমানে পার্লামেন্টের বিবেচনাধীন পুনর্বিন্যাস আইনের খসড়ায় **সমান নির্বাচকমণ্ডলীর** ব্যবস্থা হচ্ছে যা অন্তত জার্মানির তুলনায় বেশি অসমান নয়; **সদস্যদের জন্য ভাতা** এবং একেবারে **বাৎসরিক পার্লামেণ্ট** না হোক অন্তত আরও ঘনঘন পার্লামেন্টের সম্ভাবনা দূরে দেখা যাচ্ছে — তবু এমন কিছু লোক আছে যারা বলে বেড়ায় যে, চার্টিস্ট মতবাদের মৃত্যু হয়েছে।

'পূর্বগামী আরও অনেক বিপ্লবেরই মতো ১৮৪৮-এর বিপ্লবেরও অদ্ভুত অদ্ভুত সহযোগী এবং উত্তরাধিকারী দেখা গেছে। এই বিপ্লবকে যারা দমন করল তারাই, মার্কসের ভাষায়, তার উইলের নির্দেশপালক।* লুই নেপোলিয়নকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালি সৃষ্টি করতে হল, বিসমার্ককে জার্মানির বৈপ্লবীকরণ এবং হাঙ্গেরির স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হল, আর ইংরেজ শিল্প-মালিকদের জনগণের সনদকে আইন-বিধিবদ্ধ করতে হল।

'ইংলণ্ডের পক্ষে, গোড়ার দিকে শিল্প-পুঁজিপতিদের এই প্রাধান্যের ফল হল চাঞ্চল্যকর। ব্যবসা-বাণিজ্যে পুনরুজ্জীবন দেখা দিল এবং আধুনিক

---

* ক. মার্কস, '১৮৫৯-এ এরফুর্টপনা'। — সম্পাঃ

শিল্পের এই জন্মস্থানের পক্ষেও অশ্রুতপূর্ব মাত্রায় তা বিস্তার লাভ করল; ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ এই কুড়ি বছরে অভাবনীয় উৎপাদনের পাশাপাশি, আমদানি ও রপ্তানি, পুঁজিপতিদের হাতে সঞ্চিত সম্পদ ও বড় বড় শহরে কেন্দ্রীভূত মানব শ্রমশক্তির বিহ্বলকর পরিমাণের সঙ্গে তুলনায় পূর্ববর্তী যুগের বাষ্প ও যন্ত্রের বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলিও অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। এই অগ্রগতি অবশ্য, আগেকারই মতো, দশ বছর অন্তর, ১৮৫৭ এবং ১৮৬৬ সালে, সংকটের দ্বারা বিঘ্নিত হয়; কিন্তু এ ধাক্কাগুলিকে স্বাভাবিক, অপরিহার্য ঘটনা বলেই ধরে নেওয়া হল, যাকে ভবিতব্য হিসেবে মেনে নিতেই হবে এবং শেষ পর্যন্ত তা সর্বদা আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যায়।

'আর এই যুগে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা কী? ব্যাপক শ্রমিক জনতার অবস্থায় পর্যন্ত সাময়িক উন্নতি ঘটল। কিন্তু বিপুল সংখ্যক বেকার মজুত বাহিনীর প্রবাহ, ক্রমাগত নতুন নতুন যন্ত্র দ্বারা শ্রমিকের স্থান অধিকার, এবং কৃষিতেও ক্রমেই বেশি হারে যন্ত্র প্রয়োগের ফলে স্থানচ্যুত কৃষিজীবী জনতার আগমনের ফলে এই উন্নতিও সর্বদাই আগেকার স্তরে নেমে যেত।

'শ্রমিক শ্রেণীর দুটি 'সুরক্ষিত' অংশের বেলায়ই কেবল স্থায়ী উন্নতি লক্ষ করা যায়। প্রথমত, কারখানার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে; পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা এদের কাজের ঘণ্টা অপেক্ষাকৃত যুক্তিসম্মত সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়ায় তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ঘটেছে ও একটা নৈতিক শক্তি পেয়েছে তারা, স্থানীয় কেন্দ্রীকরণের ফলে যা আরও বেড়ে গেছে। ১৮৪৮-এর আগেকার তুলনায় তারা যে ভালো আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, যত ধর্মঘট তারা করে তার দশটির মধ্যে ন-টির ক্ষেত্রেই মালিকরা নিজেরাই উৎপাদন কমাবার একমাত্র উপায় হিসেবে উস্কানি দিয়ে ধর্মঘট বাধায়। কারখানায় তৈরি মাল যতই অবিক্রীত থাক না-কেন, শ্রমদিন হ্রাসে মালিকদের কখনও রাজী করানো যায় না; কিন্তু শ্রমিকদের দিয়ে ধর্মঘট করাও, অমনি বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেক মালিক কারখানা বন্ধ করে দেবে।

'দ্বিতীয়ত, বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্ষেত্রে; যেসব বৃত্তিতে **প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের** শ্রমই প্রধান বা একমাত্র প্রযোজ্য, এগুলি সেইসব বৃত্তির সংগঠন। এইসব বৃত্তিতে স্ত্রীলোক ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিযোগিতা

বা যন্ত্রের প্রতিযোগিতা এখনও তাদের সংগঠিত শক্তিকে দুর্বল করতে পারে নি। যন্ত্র নির্মাণের মজুর, ছুতার-মিস্ত্রী, আসবাব-মিস্ত্রী, রাজ-মিস্ত্রী — এই প্রত্যেকটি অংশই এতটা করে শক্তির অধিকারী যে, যেমন রাজমিস্ত্রী ও তার সহকারী মজুরদের ক্ষেত্রে, তারা যন্ত্র প্রবর্তনে পর্যন্ত সফলভাবে বাধা দিতে পারে। ১৮৪৮-এর পর থেকে এদের অবস্থা যে লক্ষণীয়ভাবে উন্নত হয়েছে সেবিষয়ে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ নেই, এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আজ ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে তাদের মালিকরাই যে কেবল তাদের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছে তাই নয়, তারাও মালিকদের সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এরা এক অভিজাত গোষ্ঠী হয়ে উঠেছে; নিজেদের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা তারা জোর করে চালু করতে পেরেছে এবং সেই অবস্থাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছে। এরাই হচ্ছে লেওন লেভি ও গিফেন মহাশয়দের আদর্শ শ্রমিক এবং সত্যিই বিশেষ করে যেকোনো বিবেচক পুঁজিপতি এবং সাধারণভাবে সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছে এরা আজকাল বড় চমৎকার লোক।

'কিন্তু শ্রমজীবী জনতার বিপুল অংশ আজ যে দুর্দশা ও অনিরাপত্তার মধ্যে বাস করছে তা আগের তুলনায় বেশি নিচু না হলেও, অন্তত সমান নিচু। লণ্ডনের ইস্ট এণ্ড (১০৯) হচ্ছে রুদ্ধস্রোত দারিদ্র্য ও হতাশার, কর্মহীনতার কালে অনাহার আর কর্মরত কালে শারীরিক ও নৈতিক অধঃপতনের এক ক্রমবিস্তারমান বদ্ধ জলার মতো। শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ সুবিধাভোগী অল্পাংশকে বাদ দিলে প্রত্যেক বড় শহরেরও এই অবস্থা, এবং ছোটখাট শহর ও কৃষি অঞ্চলগুলিতেও তাই। যে নিয়মে শ্রমশক্তির মূল্য পরিণত হয় প্রাণধারণের অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্যে এবং অপর যে-নিয়ম শ্রমশক্তির গড়পড়তা দরকে সেই অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণগুলির সর্বনিম্ন মাত্রায় নামিয়ে আনে — এই দুই নিয়ম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের অদম্য শক্তি নিয়ে তাদের উপর প্রযুক্ত হয় এবং চাকার নিচে তাদের গুঁড়িয়ে দেয়।

'এই হল, তাহলে, ১৮৪৭-এর অবাধ বাণিজ্য নীতি এবং শিল্প-পুঁজিপতিদের বিশ বছরের শাসনের ফল। কিন্তু এর পর এক পরিবর্তন ঘটল। ১৮৬৬-এর বিপর্যয়ের পর অবশ্য ১৮৭৩-এ এক সামান্য ও স্বল্প-

কালস্থায়ী পুনরুজ্জীবন দেখা দিয়েছিল, কিন্তু বেশি দিন টেকে নি। প্রত্যাশিত সময়ে, ১৮৭৭ বা ১৮৭৮-এ আমাদের অবশ্য পূর্ণ সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয় নি, কিন্তু ১৮৭৬ থেকেই শিল্পের সমস্ত প্রধান প্রধান শাখায় একটানা অচল অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। পূর্ণ বিপর্যয় যেমন আসে না, সে বিপর্যয়ের আগে ও পরে আকাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধির যে পর্যায় আমাদের পাবার কথা তাও তেমনি আসে না। একটা নিস্তেজ মন্দা, সমস্ত ব্যবসায়ে সমস্ত বাজারমালের একটানা বাহুল্য, এই অবস্থার মধ্যেই আমরা প্রায় দশ বছর চলেছি। কেন এমন হল?

'অবাধ বাণিজ্য তত্ত্ব দাঁড়িয়েছিল এই অনুমানের উপর: ইংলন্ড হবে এক কৃষিপ্রধান বিশ্বের একমাত্র বিপুল শিল্পকেন্দ্র। আর বাস্তব ঘটনা দাঁড়িয়েছে এই যে, অনুমানটি এক অবিমিশ্র ভ্রান্তি বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেখানেই জ্বালানি, বিশেষত কয়লা আছে সেখানেই আধুনিক শিল্পের পরিস্থিতি, বাষ্পশক্তি ও যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এবং ইংলন্ড ছাড়া অন্য দেশে — ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, আমেরিকা, এমনকি রাশিয়ায় কয়লা আছে। এবং সেখানকার লোকেরা ইংরেজ পুঁজিপতিদের সম্পদ ও গৌরব বাড়াবার জন্য আইরিশ নিঃস্ব কৃষকে পরিণত হবার সুবিধাটা হৃদয়ঙ্গম করে নি। তারা দৃঢ় সংকল্পে শিল্প-উৎপাদনে লেগে গেল, কেবল নিজেদের জন্য নয়, বাকি দুনিয়ার জন্যও; আর তার ফল হল এই যে, ইংলন্ড প্রায় শতাব্দীকাল ধরে শিল্প-উৎপাদনে যে একাধিপত্য ভোগ করে আসছিল, সেটা চিরকালের মতো ভেঙে গেল।

'অথচ শিল্প-উৎপাদনে এই একাধিপত্যই হচ্ছে ইংলন্ডের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ভর-কেন্দ্র। সে একাধিপত্য যখন বজায় ছিল তখনও পণ্যের বাজার ইংরেজ শিল্পের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না; ফলে দশ বছর অন্তর সংকট দেখা দিচ্ছিল। আর আজ তো নতুন বাজার প্রতিদিন আরও দুর্লভ হয়ে উঠছে এবং এতই দুর্লভ হয়ে উঠছে যে, এবার কঙ্গোর নিগ্রোদেরও ম্যাঞ্চেস্টারের ছিট-কাপড়, স্ট্যাফোর্ডশায়ারের পটারি আর বার্মিংহামের লোহার জিনিস রূপী সভ্যতায় সবলে সামিল করে নিতে হচ্ছে। এর পর যখন ইউরোপের মহাদেশ, বিশেষত আমেরিকা থেকে জিনিসপত্র ক্রমেই বেশি পরিমাণে আসতে আরম্ভ করবে,

আজও ব্রিটিশ শিল্প-মালিকদের হাতেই যে প্রধান অংশটা রয়েছে সেটা বছরের পর বছর যখন কমতে থাকবে, তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? সর্বরোগহর হে অবাধ বাণিজ্য, জবাব দাও!

'এ কথাটা আমিই প্রথম বলি নি। ১৮৮৩ সালেই ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের (১১০) সাউথপোর্ট অধিবেশনে অর্থনীতি বিভাগের সভাপতি মিঃ ইঙ্গলিস পালগ্রেভ স্পষ্ট বলেছিলেন যে:

'ইংলণ্ডে বিপুল ব্যবসাগত মুনাফার দিন শেষ হয়েছে, এবং শিল্প-উদ্যোগের একাধিক বৃহৎ শাখার অগ্রগতিতে ছেদ পড়েছে। **প্রায় একথাই বলা যায় যে, দেশ এক প্রগতিহীন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।'**

'কিন্তু তার ফল কী হবে? পুঁজিবাদী উৎপাদন থামতে **পারে না।** তাকে বাড়তেই হবে, বিস্তৃততর হতেই হবে, নইলে তার মৃত্যু। ইতিমধ্যেই, বিশ্বের বাজারে সরবরাহের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সিংহভাগটা হ্রাস পাওয়ার অর্থই হল রুদ্ধস্রোত অবস্থা, দুর্দশা, কোথাও পুঁজির আধিক্য, কোথাও বা বেকার শ্রমিকের আধিক্য। বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধি যখন একেবারেই থেমে যাবে তখন অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

'এইখানেই পুঁজিবাদী উৎপাদনের ভেদ্য স্থান, একিলিসের গোড়ালি। নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের আবশ্যিকতা তার ভিত্তি এবং সেই নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারই আজ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ফলে দেখা দিচ্ছে এক অচল অবস্থা। এক এক বছর যাচ্ছে আর ইংলণ্ড আরও বেশি এই প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে: হয় দেশ, নয়তো পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা, একটাকে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে হবে। কোনটা যাবে?

'আর শ্রমিক শ্রেণী? ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৮-এর অভূতপূর্ব বাণিজ্য ও শিল্প বিস্তারের মধ্যেও যদি তাদের এত দৈন্য সহ্য করতে হয়ে থাকে; সেদিনও তাদের মধ্যে এক অতি সামান্য, বিশেষ সুবিধাভোগী, 'সুরক্ষিত' সংখ্যালঘু অংশ স্থায়ীভাবে উপকৃত হলেও অধিকাংশের অবস্থায় যদি বড়জোর অস্থায়ী উন্নতিমাত্র হয়ে থাকে, তাহলে এই চোখ-ধাঁধানো যুগ অনিবার্যভাবে যেদিন শেষ হবে, যেদিন আজকের এই নিরানন্দ রুদ্ধস্রোত অবস্থা কেবল তীব্রতরই হবে না, এ বদ্ধাবস্থা সেই তীব্রতররূপেই ইংরেজ

ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থায়ী, স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হবে, সেদিন পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে?

'সত্য কথাটা এই: শিল্পক্ষেত্রে ইংলণ্ডের একাধিপত্যের যুগে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীও কিছু পরিমাণে সেই একাধিপত্যের সুফলের অংশ পেয়েছে। এই সুফল তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে খুবই অসমানভাবে: বিশেষ সুবিধাভোগী সংখ্যাল্প অংশ তার বেশির ভাগটাই আত্মসাৎ করেছে, কিন্তু বৃহত্তর শ্রমিকসাধারণও, অন্তত সাময়িকভাবে, কখনও কখনও তার ভাগ পেয়েছে। এবং এই কারণেই ওয়েনবাদের অবলুপ্তির পর ইংলণ্ডে আর কোনো সমাজতন্ত্র দেখা দেয় নি। সেই একাধিপত্য ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীও বিশেষ সুবিধাভোগীর স্থান হারাবে; এবং দেখতে পাবে যে, তারা সাধারণভাবে — বিশেষ সুবিধাভোগী এবং নেতৃত্বকারী অল্পসংখ্যকরাও তার থেকে বাদ পড়বে না — অপরাপর দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে এক স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই কারণেই ইংলণ্ডে আবার সমাজতন্ত্র দেখা দেবে।'

১৮৮৫ সালে যেমন মনে হয়েছিল সেইভাবে বিষয়টির যে বর্ণনা আমি এখানে দিয়েছি তার পর আর বলার বিশেষ কিছু নেই। বলা বাহুল্য, আজ সত্যই 'ইংলণ্ডে আবার সমাজতন্ত্র দেখা দিয়েছে' এবং বেশ যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা দিয়েছে সর্ববর্গের সমাজতন্ত্র: সজ্ঞান এবং অজ্ঞান সমাজতন্ত্র, গদ্যময় ও কাব্যিক সমাজতন্ত্র, শ্রমিক শ্রেণীর এবং মধ্য শ্রেণীর সমাজতন্ত্র, কারণ, সত্যই সেই জঘন্য থেকে জঘন্যতম জিনিস সমাজতন্ত্রটা কেবল যে জাতে উঠেছে তাই নয়, উপরন্তু, তার গায়ে সত্যিই সান্ধ্য পোশাক চড়েছে এবং ড্রইং রুমের আরাম কেদারায় অলসভঙ্গিতে আরামে সে গা এলিয়ে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনমত নামক 'সমাজের' সেই ভয়ংকর স্বেচ্ছাচারী প্রভুটি কতটা চঞ্চল, এবং বিগত এক যুগের সমাজতন্ত্রী আমরা যে সেই জনমতকে অবজ্ঞা করে এসেছিলাম, তার ন্যায্যতাও আর একবার প্রমাণিত হচ্ছে। তাহলেও এ লক্ষণ দেখে আমাদের চটবার কারণ নেই।

মৃদু জোলো সমাজতন্ত্রের যে ভাব দেখানো বুর্জোয়া মহলে সাময়িক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার চেয়ে, এমন কি ইংলণ্ডে সাধারণভাবে

সমাজতন্ত্রের সত্যই যে অগ্রগতি হয়েছে, তার চেয়েও যে ঘটনাকে আমি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তা হচ্ছে লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডের পুনরুজ্জীবন। দুর্দশার এই বিপুল লীলাভূমি আজ আর ছয় বছর আগেকার মতো বদ্ধ ডোবা নয়। সে তার অসাড় হতাশা ঝেড়ে ফেলে আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং আজকাল যাকে 'নয়া ইউনিয়নবাদ' বলা হয় তার, অর্থাৎ 'অদক্ষ' শ্রমিকদের বিপুল জনগণের সংগঠন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই সংগঠন বহুল পরিমাণে পুরাতন 'দক্ষ' শ্রমিকদের ইউনিয়নেরই চেহারা নিতে পারে, কিন্তু চরিত্রগতভাবে তা মূলত পৃথক। পুরাতন ইউনিয়নগুলি যে সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সময়কার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, এবং মজুরি-প্রথাকে তারা এমন এক চিরস্থায়ী, চূড়ান্ত ব্যাপার বলে মনে করে, যা বড়জোর ইউনিয়নের সদস্যদের স্বার্থে খানিকটা সংস্কৃত করতে পারা যায়। নতুন ইউনিয়নগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন এক সময় যখন মজুরি-প্রথার অনন্ত অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসের উপর রূঢ় আঘাত পড়েছে। এগুলির প্রতিষ্ঠাতারা ও পরিচালকেরা সচেতনভাবে বা আবেগের দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রী; যে জনতার আনুগত্য এগুলিকে শক্তি জোগাল তারা ছিল অমার্জিত, অবহেলিত, শ্রমিক শ্রেণীর অভিজাত অংশ তাদের দেখত তাচ্ছিল্যের চোখে; কিন্তু এই দিক থেকে তাদের বিপুল সুবিধা ছিল যে, **তাদের মন ছিল অকর্ষিত জমির** মতো, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেসব 'ভদ্র' বুর্জোয়া কুসংস্কার অপেক্ষাকৃত সচ্ছল 'পুরাতন' ইউনিয়ন-পন্থীদের মস্তিষ্কে বাধা জন্মায় তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর যখন আমরা দেখছি যে, এই নতুন ইউনিয়নগুলিই সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং সমৃদ্ধ ও গর্বিত 'পুরাতন' ইউনিয়নগুলিকে ক্রমেই নিজেদের পেছনে টেনে আসছে।

ইস্ট এণ্ডের কর্মীরা অনেক বড় বড় ভুল করেছে তাতে সন্দেহ নেই, এ ধরনের ভুল তাদের পূর্বগামীরাও করেছে, আর তাদের যারা 'ছিঃ ছিঃ' করে সেই মতবাগীশ সমাজতন্ত্রীরাও করে থাকে। একটা বৃহৎ জাতির মতো একটা বৃহৎ শ্রেণীও নিজের ভুলের পরিণাম ভুগে যত তাড়াতাড়ি এবং ভালোভাবে শেখে, অন্য কোনোভাবে তা শেখে না। এবং অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যত ভুলই হোক না কেন, লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডের

পুনরুজ্জীবন আজও এই fin de siècle*-র বৃহত্তম ফলবান ঘটনা এবং এই ঘটনা দেখে যেতে পারলাম বলে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।**

ফ. এঙ্গেলস

১১ জানুয়ারি, ১৮৯২

'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটির ১৮৯২ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ

---

* শতাব্দীর শেষ। — সম্পাঃ

** 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার' দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে এঙ্গেলস উপরোক্ত ইংরেজি মুখবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন এবং তার পর পরিসমাপ্তিতে নিম্নলিখিত অংশ যোগ করে দেন:

'ছ-মাস আগে আমি উল্লিখিত অংশ লেখার পর ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন আবার বড় এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। এই সেদিন অনুষ্ঠিত পার্লামেণ্টারী নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে রক্ষণশীল ও উদারনীতিক এই উভয় পার্টিকে জানিয়ে দিয়েছে যে, এর পর থেকে তৃতীয় পার্টি, শ্রমিক দলের কথা তাদের হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। শ্রমিকদের এই পার্টি সবেমাত্র গড়ে উঠছে, এবং তার উপাদানগুলি এখনও সর্বপ্রকার চিরাচরিত সংস্কার — বুর্জোয়া, পুরাতন ট্রেড ইউনিয়ন-পন্থী, এমন কি মতবাগীশ সমাজতন্ত্রী সংস্কারগুলিও ঝেড়ে ফেলার কাজে ব্যাপৃত, যাতে তারা শেষ পর্যন্ত সকলের গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে একত্র হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হবার যে সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী তারা চলেছে তা ইতিমধ্যেই এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তারই ফলে ইংলণ্ডের পক্ষে অশ্রুতপূর্ব নির্বাচনী ফলাফল দেখা গেল। লণ্ডনে দুজন শ্রমিক নির্বাচনে দাঁড়ান [জেমস কেয়র হার্ডি ও জন বার্নস। — সম্পাঃ] এবং তাও সরাসরি সমাজতন্ত্রী হিসেবে: উদারনীতিকরা তাঁদের বিরুদ্ধে কাউকে দাঁড় করাতেই সাহস পেল না এবং সমাজতন্ত্রী দুজন বিপুল ও অপ্রত্যাশিত ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলেন। মিডল্সবরোতে শ্রমিকদের একজন প্রার্থী [জোসেফ শেভলক উইলসন। — সম্পাঃ] একজন রক্ষণশীল ও একজন উদারনীতিক প্রার্থীর সঙ্গে একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ঐ দুজনের বাধা সত্ত্বেও নির্বাচিত হন। অপর দিকে, শ্রমিকদের নতুন প্রার্থীদের মধ্যে যারা উদারনীতিকদের সঙ্গে সমঝোতা করেছিল, তাদের মাত্র একজন ছাড়া সকলেই নৈরাশ্যজনকভাবে পরাজিত হয়। আগেকার তথাকথিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের, অর্থাৎ যারা শ্রমিক শ্রেণীর লোক হয়েও ক্ষমা পায় একমাত্র এই কারণে যে, তারা নিজেরাই

উদারনীতিবাদের মহাসাগরে নিজেদের শ্রমিক চরিত্রকে ডুবিয়ে দিতে প্রস্তুত, তাদের মধ্যে পুরাতন ইউনিয়নবাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিনিধি হেনরি ব্রডহার্স্ট বন্যার মুখে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে গেলেন, কারণ তিনি ৮ ঘণ্টা রোজের বিরোধিতা করেছিলেন। গ্লাসগোতে ২টি, সলফোর্ডে ১টি এবং আরও একাধিক নির্বাচন-কেন্দ্রে শ্রমিকদের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দুটি পুরাতন পার্টিরই প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তারা অবশ্য হেরে গেছে, কিন্তু উদারনীতিক প্রার্থীরাও জিততে পারে নি। এককথায়, একাধিক বড় শহরে এবং শিল্পপ্রধান নির্বাচনী এলাকায় শ্রমিকরা সুনিশ্চিতভাবেই পুরাতন পার্টিগুলির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং তারই ফলে এমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাফল্য অর্জন করেছে যা আগেকার কোনো নির্বাচনে দেখা যায় নি। আর তারই জন্য মেহনতী জনতার মধ্যে আনন্দ উন্দাম। ভোটাধিকারকে নিজ শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করলে কী করা যায় তা এই প্রথম তারা দেখল এবং অনুভব করল। 'মহান উদারনীতিক পার্টি' সম্পর্কে কুসংস্কারগত বিশ্বাসের যে মোহ প্রায় ৪০ বছর ধরে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা আজ ভেঙেছে। একাধিক চাঞ্চল্যকর উদাহরণ থেকে তারা বুঝেছে যে, তারা, শ্রমিকরাই হল ইংলণ্ডে চূড়ান্ত শক্তি, শুধু যদি তারা চায়, আর কী চায় সেটা জানে। ১৮৯২-এর নির্বাচন থেকে সেই জানা ও চাওয়ার সূত্রপাত। বাকি যা করার, ইউরোপ মহাদেশের শ্রমিকদের আন্দোলন তার ব্যবস্থা করবে। জার্মান ও ফরাসী শ্রমিকদের পার্লামেণ্টে ও স্থানীয় কাউন্সিলগুলিতে বহুসংখ্যায় প্রতিনিধি রয়েছে, তারা আরও সাফল্য অর্জনের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব উপযুক্ত মাত্রায় চালু রাখবে। এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় যে, এই নতুন পার্লামেণ্ট মিঃ গ্ল্যাডস্টোনকে নিয়ে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারছে না আর মিঃ গ্ল্যাডস্টোনও এই পার্লামেণ্টকে নিয়ে কিছু করে উঠতে পারছেন না, তাহলে ইংরেজ শ্রমিক পার্টি ততদিনে নিশ্চয়ই এতটা সংগঠিত হয়ে উঠবে যাতে পুরাতন দুই পার্টি যেভাবে একের পর এক সরকারের আসনে বসে আসছে এবং ঠিক এই কায়দায় বুর্জোয়াদের শাসন চিরস্থায়ী করে রাখছে, তাদের সেই নাগরদোলা খেলার দ্রুত অবসান ঘটাতে পারবে।' — সম্পাঃ

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ভবিষ্যৎ ইতালীয় বিপ্লব ও সোশ্যালিস্ট পার্টি (১১১)

ইতালির পরিস্থিতি আমার মনে হয় এই রকম:

জাতীয় মুক্তির সময়ে এবং পরে ক্ষমতায় এসে বুর্জোয়া শ্রেণী তার বিজয় সম্পূর্ণ করতে সক্ষমও হয় নি, ইচ্ছুকও নয়। সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলিকে তারা ধ্বংস করে নি, জাতীয় উৎপাদনকে আধুনিক বুর্জোয়া আদলে পুনর্বিন্যস্তও করে নি। দেশকে পুঁজিবাদী শাসনের আপেক্ষিক ও সাময়িক সুফলগুলির ভাগ দিতে অপারগ এই বুর্জোয়া শ্রেণী সেই ব্যবস্থার সমস্ত বোঝা, সমস্ত অসুবিধা তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। আর, তাতেও যেন যথেষ্ট হয় নি, যেটুকু মর্যাদা ও কৃতিত্ব তারা ভোগ করছিল, নোংরা ব্যাংক জালিয়াতি করে সেটুকুও তারা চিরতরে খুইয়েছে।

ফলত শ্রমজীবী জনগণ — কৃষক, কারিগর, কৃষি ও শিল্প শ্রমিক — দেখছে, তারা এক দিকে শুধু সামন্ত যুগ থেকেই নয়, এমন কি সুপ্রাচীন কাল থেকে আসা পুরনো অন্যায়-অবিচারে (mezzadria*, দক্ষিণে লাতিফুণ্ডিয়া**, গবাদি-পশু যেখানে মানুষকে স্থানচ্যুত করে) নিষ্পেষিত; অন্য দিকে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার উদ্ভাবিত সবচেয়ে অতিগ্রাসী রাজস্ব-সংক্রান্ত আইনে নিষ্পেষিত। এটা এমন একটা দৃষ্টান্ত যেখানে সহজেই মার্কসের সঙ্গে বলা যেতে পারে: 'আমরা, পশ্চিম ইউরোপের বাকি সকলের মতোই, শুধু পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের জন্যই নয়, বরং সেই বিকাশের অসামর্থ্যের জন্যও ভুগছি। আধুনিক মন্দগুলির পাশাপাশি, উত্তরাধিকারসূত্রে

---

* ভাগ চাষ-প্রথা। — সম্পাঃ

** বড় বড় জোত জমির প্রথা। — সম্পাঃ

আসা অজস্র মন্দ আমাদের ভারাক্রান্ত করছে — সেগুলি উদ্ভূত হয়েছে উৎপাদনের সেকেলে প্রণালীর অক্রিয় জের থেকে, তার সঙ্গে আছে সামাজিক ও রাজনৈতিক কালাসঙ্গতির অবশ্যম্ভাবী ধারা। আমরা শুধু জীবিতের কাছ থেকেই কষ্ট পাচ্ছি না, পাচ্ছি মৃতের কাছ থেকেও। Le mort saisit le vif!* (মৃত ব্যক্তি মরণফাঁসে বেঁধে রেখেছে জীয়ন্তকে! — অনুঃ)

পরিস্থিতি একটা সংকটের দিকে চলেছে। উৎপাদনকারী জনসাধারণ সর্বত্র বিক্ষুব্ধ; এখানে-ওখানে তারা সমুত্থিত হচ্ছে। এই সংকট আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

স্পষ্টতই, সোশ্যালিস্ট পার্টি এত তরুণ এবং, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দরুন, এত দুর্বল যে সমাজতন্ত্রের আশু বিজয়ের আশা করতে সে সক্ষম নয়। সারা দেশ জুড়ে নাগরিক জনসমষ্টির তুলনায় কৃষিনির্ভর জনসমষ্টির পাল্লা অনেক বেশি ভারী। শহরগুলিতে সামান্যই উন্নত শিল্প আছে, তাই আদর্শ বৈশিষ্ট্যমূলক প্রলেতারীয়রা বিরল; কারিগর, ছোট দোকানদার ও শ্রেণীচ্যুত ব্যক্তিরাই — পেটি বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে তরঙ্গায়িত এক জনপুঞ্জ — সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ হল ক্ষয় ও ভাঙনের পথে মধ্য যুগের পেটি ও মধ্য বুর্জোয়া শ্রেণী, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের প্রলেতারীয়, কিন্তু এখনও বর্তমানের প্রলেতারীয় নয়। সর্বদা অর্থনৈতিক সর্বনাশের সম্মুখীন এবং এখন মরীয়া অবস্থায় উপনীত একমাত্র এই শ্রেণীই এক বিপ্লবী আন্দোলনের যোদ্ধৃসাধারণ ও নেতা — দুই-ই যোগাতে সক্ষম হবে। এই পথে তাকে অনুসরণ করবে কৃষকরা, যারা তাদের জমি অত্যধিক ইতস্ততবিক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং তাদের নিরক্ষরতার দরুন কোনোরূপ কার্যকর উদ্যোগ প্রদর্শন করতে পারে না বটে, কিন্তু যাই ঘটুক না-কেন, তারা হবে শক্তিশালী ও অপরিহার্য মিত্র।

অল্পবিস্তর শান্তিপূর্ণ সাফল্যের ক্ষেত্রে, মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটবে, আর 'পরিবর্তিত' প্রজাতন্ত্রীরা (১১২), কাভালোত্তি প্রমুখেরা ক্ষমতায় আসবেন; বিপ্লব ঘটলে এক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র হবে।

---

* 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণে মার্কসের ভূমিকা (এই সংস্করণের ষষ্ঠ খণ্ডের ৭-১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ

এই সম্ভাব্য ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্তব্য কী?

১৮৪৮ সাল থেকে যে রণকৌশল সমাজতন্ত্রীদের সর্বাধিক সাফল্য দিয়েছে তা হল **'কমিউনিস্ট ইশতেহারে'** লিপিবদ্ধ রণকৌশল:

'বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, তাতে সমাজতন্ত্রীরা* সর্বদা ও সর্বত্র সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থটাকে তুলে ধরে... শ্রমিক শ্রেণীর আশু লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য, উপস্থিত স্বার্থ হাসিল করার জন্য সমাজতন্ত্রীরা লড়াই করে থাকে, কিন্তু বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যে তারা সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, সেটার রক্ষক।'**

তারা তাই দুটি শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের বিকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, কিন্তু এই বিষয়টি কখনও বিস্মৃত হয় না যে এই পর্যায়গুলি নিতান্তই কতকগুলি স্তর মাত্র, যার শেষে আছে চরম মহৎ লক্ষ্য: সমাজ পুনর্বিন্যাসের উপায় হিসেবে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে আশু সুফল লাভ করার জন্য যারা লড়াই করছে তাদেরই পাশে তাদের স্থান। এই সমস্ত রাজনৈতিক বা সামাজিক উপকার তারা গ্রহণ করে বটে, তবে নিতান্তই **অগ্রিম অর্থ প্রদান হিসেবে**। প্রতিটি বিপ্লবী বা প্রগতিশীল আন্দোলনকে তারা তাই গণ্য করে তারা নিজেরা যে দিকে চলেছে সেই দিকেই একটি পদক্ষেপ বলে। তাদের বিশেষ ব্রত হল অন্যান্য বিপ্লবী পার্টিকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যে একটি যদি জয়ী হয় তাহলে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ রক্ষা করা। এই রণকৌশল সুমহান লক্ষ্যের কথা কখনোই বিস্মৃত হয় না, এবং সমাজতন্ত্রীদের তা নিষ্কৃতি দেয় হতাশা থেকে, যে-হতাশা অবশ্যম্ভাবীরূপেই অন্যান্য, অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন পার্টির ক্ষেত্রে দেখা দেবে, তা তারা বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রী অথবা ভাবপ্রবণ সমাজতন্ত্রী যাই হোক না-কেন; — যেটি নিতান্তই একটি স্তর মাত্র তাকে তারা ভুল করে তাদের অগ্রযাত্রার শেষ প্রান্ত বলে।

---

* 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে এঙ্গেলস কমিউনিস্টরা শব্দটির জায়গায় সমাজতন্ত্রীরা শব্দটি বসিয়েছেন। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৫৭ আর ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এসব কথাই ইতালির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাক।

ভাঙনোন্মুখ পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী ও কৃষকসমাজের বিজয় তাই হয়তো 'পরিবর্তিত' প্রজাতন্ত্রীদের এক মন্ত্রিসভা এনে দেবে। তাহলে আমরা পাব সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং আন্দোলনের অনেক বেশি স্বাধীনতা (সংবাদপত্র, সমাবেশ, সমিতির স্বাধীনতা ammonizione*-এর অবসান ইত্যাদি) — এগুলি নতুন অস্ত্র, তাচ্ছিল্য করার মতো নয়।

কিংবা আমাদের জন্য তা নিয়ে আসবে একটা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, তাতে থাকবেন একই ব্যক্তিরা এবং তাঁদের মধ্যে কিছু মাৎসিনিপন্থী। আমাদের স্বাধীনতা ও আমাদের কর্মক্ষেত্রকে তা অনেকখানি বাড়াবে, অন্তত উপস্থিত কালের মতো। আর মার্কস বলেছেন যে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রই একমাত্র রাজনৈতিক ধরন যার মধ্যে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রাম জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত লড়া যায়।** আর ইউরোপে এর যা প্রতিক্রিয়া হবে, সে কথা তো বলাই বাহুল্য।

অতএব, বর্তমান বিপ্লবী আন্দোলনের জয় আমাদের আরও শক্তিশালী করে তুলতে এবং আমাদের অনুকূলতর ambiente*** নিয়ে আসতে বাধ্য। আমরা যদি একপাশে দাঁড়িয়ে থাকি, 'affini'**** পার্টিগুলির মুখোমুখি আমাদের আচরণে আমরা যদি নিছক নেতিবাচক সমালোচনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে সবচেয়ে বড় ভুল করব। এমন ক্ষণ আসতে পারে যখন আমাদের কর্তব্য হবে তাদের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সহযোগিতা করা। সেই ক্ষণটি কী হতে পারে?

আমরা যে-শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করি, যথার্থভাবে বলতে গেলে ঠিক সেই শ্রেণীর আন্দোলন নয় এমন কোনো আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে তৈরি করা স্পষ্টতই আমাদের কাজ নয়। প্রজাতন্ত্রী ও র‍্যাডিক্যালরা যদি মনে করে যে সংগ্রামের সময় সমুপস্থিত, তাহলে তারা তাদের আবেগের তাড়নাকে

---

* পুলিসি নজর। — সম্পাঃ

** ক. মার্কস, 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' (এই সংস্করণের ৪র্থ খণ্ডের ২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ

*** পরিবেশ। — সম্পাঃ

**** 'সংশ্লিষ্ট'। — সম্পাঃ

বল্‌গাহীন করুক। আমাদের কথা বলতে গেলে, এই সব ভদ্রলোকের গালভরা প্রতিশ্রুতিতে আমরা এত ঘন ঘন প্রবঞ্চিত হয়েছি, যে আরেকবার নিজেদের প্রতারিত হতে দিতে চাই না। তাঁদের উদ্‌ঘোষণা কিংবা তাঁদের ষড়যন্ত্র কোনো কিছুতেই আমাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়া দরকার নেই। আমরা যদি প্রতিটি **প্রকৃত** গণ আন্দোলন সমর্থন করতে বাধ্য হই, তাহলে আমাদের প্রলেতারীয় পার্টির সবেমাত্র গঠিত প্রাণকেন্দ্রটি যাতে অযথা বিসর্জিত না হয় এবং নিষ্ফল স্থানীয় বিদ্রোহে প্রলেতারিয়েত যাতে হীনবল না হয় সেদিকে নজর দিতেও আমরা কম বাধ্য নই।

কিন্তু বিপরীতপক্ষে, আন্দোলন যদি প্রকৃতই জাতীয় হয় তাহলে আমাদের লোকেরা লুকিয়েও থাকবে না, তাদের সংকেতবাক্যেরও দরকার হবে না, এই আন্দোলনে আমাদের অংশগ্রহণ এক স্বাভাবিক ঘটনা। তবে সেরকম সময়ে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে, এবং আমাদের অবশ্যই একথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে যে আমরা অংশগ্রহণ করছি **এক স্বতন্ত্র পার্টি হিসেবে,** র‍্যাডিক্যাল ও প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমরা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি বটে, কিন্তু তাদের থেকে আমরা পুরোপুরি পৃথক; জয়লাভ হলে সংগ্রামের ফল সম্পর্কে আমরা আদৌ কোনো মোহ পোষণ করি না; আমাদের সন্তুষ্ট করা তো দূরের কথা, আমাদের কাছে এই ফলের অর্থ শুধু হবে বিজিত আরেকটি স্তর, অধিকতর বিজয়ের জন্য কর্মতৎপরতার এক নতুন ঘাঁটি; বিজয়ের দিনটিতেই আমাদের পথ হয়ে যাবে আলাদা; সেই দিন থেকে আমরা হব নতুন সরকারের **নতুন বিরোধীপক্ষ,** সেই বিরোধীপক্ষ প্রতিক্রিয়াশীল নয়, প্রগতিশীল, চরম বাম শক্তির বিরোধীপক্ষ, ইতিমধ্যেই অর্জিত ক্ষেত্রগুলির সীমা পেরিয়ে যে চাপ দিয়ে নিয়ে যাবে নতুন নতুন দিগ্বিজয়ে।

অভিন্ন বিজয়ের পর আমাদের হয়তো নতুন সরকারে কিছু আসন দিতে চাওয়া হবে, কিন্তু সেগুলি সবসময়েই হবে **সংখ্যালঘিষ্ঠ। সেটাই সবচেয়ে বড় বিপদ।** ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর ফরাসী সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রীরা (*La Réforme*-এর [১১৩], — লেদ্রু-রলাঁ, লুই ব্লাঁ, ফ্লকোঁ প্রভৃতি) এরূপ পদ গ্রহণ করার ভুলটি করেছিলেন (১১৪)। সরকারের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ায় তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের

নিয়ে গঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমস্ত দুষ্কৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতার দায়িত্ব স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন, আর সরকারে তাঁদের উপস্থিতি পুরোপুরি পঙ্গু করে ফেলেছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী তৎপরতাকে, যে-শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দাবিদার ছিলেন তাঁরা।

উপরের সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে আমি আপনাকে শুধু আমার নিজস্ব অভিমত জানালাম; আপনি আমার কাছে তা জানতে চেয়েছেন বলে, আর আমি তা করেছি প্রচণ্ডতম দ্বিধা নিয়ে। সাধারণ রণকৌশলের কথা বলতে গেলে, আমার সারা জীবনে আমি সেগুলির ফলপ্রদতা দেখতে পেয়েছি। আমাকে সেগুলি কখনও হতাশ করে নি। কিন্তু ইতালিতে বর্তমান অবস্থায় তার প্রয়োগের বিষয়টা আলাদা; সেটা স্থির করতে হবে অকুস্থলে, করতে হবে তাদেরই যারা রয়েছে ঘটনাবলীর কেন্দ্রস্থলে।

২৬ জানুয়ারি, ১৮৯৪ তারিখে লিখিত

ইতালীয় ভাষায় *Critica Sociale* পত্রিকার ৩য় সংখ্যা, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ তারিখে প্রকাশিত

ফরাসী থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা (১১৫)

সর্বত্র সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কৃষক সমস্যা আজ হঠাৎ কেন আশু আলোচ্যের মধ্যে স্থান পেয়েছে তা নিয়ে বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলির মধ্যে খুবই বিস্ময় সঞ্চার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অনেকদিন আগেই এই আলোচনা শুরু হয় নি বলেই তাদের বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল। আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে সিসিলি, আন্দালুসিয়া থেকে রাশিয়া ও বুলগেরিয়া পর্যন্ত কৃষকরা জনসমষ্টি, উৎপাদন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার এক অতি অপরিহার্য উপাদান। ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিম ইউরোপের দুটো অঞ্চল। খাস গ্রেট ব্রিটেনে বড় বড় ভূসম্পত্তি ও বৃহদায়তন কৃষি-ব্যবস্থা স্ব-নির্ভর কৃষকের স্থান সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে; এল্‌ব্‌ নদীর পূর্বতীরের প্রাশিয়ায় কয়েক শতাব্দী ধরে এই প্রক্রিয়া চলে আসছে; এখানেও কৃষককে ক্রমেই বেশি সংখ্যায় 'বিতাড়িত' করা হচ্ছে বা অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পিছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

এতদিন পর্যন্ত কৃষক কেবল তার অনীহার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতার কারিকারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রাম্য জীবনের বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই তার সেই অনীহার মূল নিহিত। জনসমষ্টির বিপুল অংশের এই অনীহা প্যারিস ও রোমে পার্লামেণ্টী দুর্নীতিরই শুধু নয়, রুশ স্বৈরতন্ত্রেরও দৃঢ়তম স্তম্ভ। অথচ এ অনীহা মোটেই দুর্লঙ্ঘ্য নয়। পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত যে-সব অঞ্চলে ছোট কৃষক মালিকানার প্রাধান্য, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের অভ্যুত্থানের পর থেকে কৃষকদের চোখে সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের সন্দেহভাজন ও বিরাগভাজন করে তোলা বুর্জোয়াদের পক্ষে

খুব কঠিন হয় নি; কৃষকদের কাছে সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের এমনভাবে দেখানো হয়েছে যেন এরা হল কুঁড়ে, লোভী একদল শহুরে লোক, যারা কৃষকদের সম্পত্তির উপর নজর দিয়েছে, partageux, যারা চায় কৃষকদের সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা করে নিতে। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির বিপ্লবের ধোঁয়াটে সমাজতন্ত্রী আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অতি দ্রুত সমাধি দেওয়া হয় ফরাসী কৃষকদের প্রতিক্রিয়াশীল ভোটের জোরেই; কৃষক মানসিক শান্তি চেয়েছিল, তার সযত্নে রক্ষিত স্মৃতিকোষ থেকে সে কৃষকের সম্রাট নেপোলিয়নের কিংবদন্তী বের করে আনল, এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্য (১১৬) সৃষ্টি করল। কৃষকদের এই একটা কৃতিত্বের কী মূল্যে ফরাসী জনগণকে দিতে হয়েছে তা আমরা সবাই জানি; সে দুর্ভোগের জের আজও চলছে।

কিন্তু তারপর অনেক কিছুই বদলে গেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের ফলে কৃষিতে ক্ষুদ্র উৎপাদনের জীবনসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে; ক্ষুদ্র উৎপাদন অনিবার্য গতিতে ধ্বংসের দিকে চলছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ভারতের প্রতিযোগীরাও সস্তা শস্যে ইউরোপের বাজার ভাসিয়ে দিয়েছে, সে শস্য এত সস্তা যে ইউরোপের কোনো উৎপাদক তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। বড় বড় ভূস্বামী আর ছোট কৃষক উভয়েই আজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। উভয়েই জমির মালিক এবং উভয়েই গ্রামবাসী, তাই বড় ভূস্বামীরা ছোট কৃষকদের স্বার্থের রক্ষক বলে নিজেদের জাহির করছে এবং ছোট কৃষকরাও তাদের সেইভাবে মোটের উপর স্বীকার করছে।

ইতিমধ্যে পশ্চিমাংশে এক শক্তিশালী সোশ্যালিস্ট শ্রমিক পার্টি গড়ে উঠেছে এবং বিকাশ লাভ করেছে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময়কার অস্পষ্ট সব ধারণা ও অনুভূতি আজ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, বিস্তৃততর ও গভীরতর হয়েছে এবং সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন-সম্মত এক কর্মসূচির আকার নিয়েছে, যার মধ্যে স্থান পেয়েছে একাধিক নির্দিষ্ট বাস্তব দাবি; ক্রমবর্ধমানসংখ্যক সমাজতন্ত্রী প্রতিনিধিরা জার্মান, ফরাসী ও বেলজিয়ান পার্লামেণ্টে এই সব দাবি নিয়ে সংগ্রাম করছেন। সোশ্যালিস্ট পার্টির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল আজ আর সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হলে এই পার্টিকে প্রথমে শহর থেকে গ্রামে

প্রবেশ করতে হবে, গ্রামাঞ্চলে একটা শক্তি হয়ে উঠতে হবে। অন্য সকলের তুলনায় এই পার্টির এই একটা বিশেষ সুবিধা রয়েছে যে, অর্থনৈতিক কারণ এবং রাজনৈতিক পরিণতি এই দুইয়ের অন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে তার স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি আছে এবং তাতে করে কৃষকের নাছোড়বান্দা বন্ধু এই সব বড় বড় ভূস্বামীদের মেষচর্মাবৃত নেকড়ের স্বরূপ সে অনেকদিন আগেই ধরে ফেলেছে। এই পার্টির পক্ষে কি সম্ভব ভাগ্যহত কৃষককে তার কপট রক্ষাকর্তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া, যাতে শেষ পর্যন্ত কৃষক শিল্প-শ্রমিকের নিষ্ক্রিয় বিরোধী থেকে সক্রিয় বিরোধীতে পরিণত হয়? এই প্রসঙ্গেই আমরা কৃষক সমস্যার একেবারে কেন্দ্রীয় কথায় পৌঁছচ্ছি।

১

গ্রামের যে জনসমষ্টির দিকে আমরা মনোনিবেশ করতে পারি তাদের মধ্যে অনেকরকমের ভাগ আছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলেও তার সবিশেষ বিভিন্নতা দেখা যায়।

পশ্চিম জার্মানিতে, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামেরই মতো ছোট জোতের মালিক কৃষকদের ক্ষুদ্রায়তন কৃষিরই প্রাধান্য। এদের মধ্যে অধিকসংখ্যকই নিজ নিজ জমিখণ্ডের মালিক এবং অল্পাংশ সে জমি ইজারায় নিয়েছে।

উত্তর-পশ্চিমে — নিম্ন স্যাক্সনি ও শ্লেজভিগ-হল্‌স্টাইনে — বড় এবং মাঝারি চাষীর প্রাধান্য দেখতে পাই। পুরুষ এবং স্ত্রী খেতমজুর তো বটেই, এমন কি দিন-মজুর ছাড়াও এদের চলে না। ব্যাভেরিয়ার একাংশ সম্পর্কেও একথা খাটে।

এল্‌ব্‌ নদীর পূর্বতীরের প্রাশিয়ায় এবং মেক্‌লেনবুর্গে দেখা যায় বড় বড় ভূসম্পত্তি এবং চাকরবাকর, খেতমজুর ও দিন-মজুর দিয়ে বৃহদায়তন চাষের অঞ্চল, আর তাদেরই মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রমক্ষীয়মাণ সংখ্যায় ছোট ও মাঝারি কৃষক।

মধ্য জার্মানিতে উৎপাদন ও ভূসম্পত্তির মালিকানার এই সব রূপই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশে আছে দেখা যায়। কোনো বড় অঞ্চল জুড়ে কোনো একটা বিশেষ রূপের সুস্পষ্ট প্রাধান্য নেই।

এগুলি ছাড়াও ছোট-বড় এমন সব অঞ্চল আছে যেখানে নিজস্ব বা ইজারায় নেওয়া আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ পরিবারের জীবিকা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে পরিমাণ জমি কেবল পারিবারিক কোনো বৃত্তিরই ভিত্তি হতে পারে এবং তারই সাহায্যে সে বৃত্তি অন্যথা অকল্পনীয় কম মজুরি দিতে পারে, ফলে সমস্ত বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও তার উৎপন্ন মালের নিয়মিত বিক্রি সুনিশ্চিত থাকে।

এই গ্রাম্য জনতার কোন কোন অংশকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি স্বপক্ষে আনতে পারে? আমরা অবশ্য খুবই মোটামুটিভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করব; সুনির্দিষ্ট রূপগুলিই কেবল আমরা বেছে নেব। মধ্যবর্তী স্তর বা মিশ্রিত গ্রামীণ জনসমষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করার মতো স্থান এখানে নেই।

ছোট কৃষককে নিয়েই শুরু করা যাক। পশ্চিম ইউরোপে সাধারণভাবে সমস্ত কৃষকের মধ্যে এই ছোট কৃষকই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেবল তাই নয়, সমগ্র প্রশ্নটির যে মীমাংসা করে সে সেই চরম ব্যাপারটিও বটে। একবার নিজেদের মনে ছোট কৃষকদের সম্পর্কে মনোভাব আমরা ঠিক করে নিতে পারলে গ্রামীণ জনসমষ্টির অন্যান্য অংশ সম্পর্কে আমাদের মত স্থির করার প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য আমাদের হাতে এসে যায়।

নিজে এবং নিজ পরিবারের সাহায্যেই যতটা চাষ করা যায়, তার চেয়ে বড় নয়, এবং যতটুকু থেকে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলে, তার চেয়ে ছোট নয়, ছোট কৃষক বলতে এখানে আমরা সেইরকম এক খণ্ড জমির মালিক বা ইজারাদার, বিশেষত প্রথমোক্তকেই, বোঝাচ্ছি। ঠিক ছোট হস্তশিল্পীদের মতো এই ছোট কৃষকও অতএব একজন শ্রমজীবী, আধুনিক প্রলেতারীয়ের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, সে এখনও তার শ্রমের হাতিয়ারের মালিক, এবং সেইজন্যই সেটা এক বিগত উৎপাদন-পদ্ধতির জের। ভূমিদাস, অধীন চাষী কিংবা, অতি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে, খাজনা দিতে ও সামন্ত দায় পালনে বাধ্য, মুক্ত কৃষক — এই সব পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ছোট কৃষকের পার্থক্য তিনদিক থেকে। প্রথম পার্থক্য এইখানে যে, ভূস্বামীর কাছে তার যে সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা ও প্রদেয় ছিল তা

থেকে ফরাসী বিপ্লব তাকে মুক্ত করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অন্তত রাইন নদীর বামতীরে, তারই হাতে নিজস্ব স্বাধীন সম্পত্তিরূপে তার কৃষি জোত তুলে দিয়েছে। দ্বিতীয় পার্থক্য এইখানে যে, স্বয়ংশাসিত মার্ক গোষ্ঠীর আশ্রয় সে হারিয়েছে এবং তাই আগেকার এজমালি জমি ভোগদখলের অধিকারে তার অংশ থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছে। এজমালি মার্ককে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে অংশত আগেকার সামন্ত প্রভুরা এবং অংশত রোমান আইনের আদর্শে রচিত উদারনীতিক আমলাতান্ত্রিক আইনকানুন। এর ফলে, পশু খাদ্য না কিনেই ভারবাহী পশুদের খাওয়াবার যে সুযোগ ছিল তা থেকে আধুনিক কালের ছোট কৃষক বঞ্চিত হল। অবশ্য অর্থনৈতিকভাবে সামন্ত বাধ্যবাধকতা উঠে যাওয়ার ফলে যে লাভ হয়েছে তার চেয়ে মার্কের উপর অধিকার হারিয়ে তার লোকসান হয়েছে অনেক বেশি। নিজস্ব ভারবাহী পশু রাখতে পারে না এমন কৃষকের সংখ্যা অনবরত বেড়ে চলছে। তৃতীয়ত, আজকের কৃষক আগেকার উৎপাদনী কার্যকলাপের অর্ধেক হারিয়েছে। আগে সে আর তার পরিবার মিলে, তার নিজেরই উৎপন্ন কাঁচামাল থেকে নিজের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের অধিকাংশ উৎপাদন করত; অবশিষ্ট প্রয়োজন মেটাত তার প্রতিবেশীরা, এরাও চাষবাসের পাশাপাশি কোনো না কোনো একটি বৃত্তি অনুসরণ করত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূল্য পেত দ্রব্য বিনিময় করে বা প্রতিদানমূলক কাজ মারফৎ। প্রতিটি পরিবার, বিশেষ করে প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ; নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই তারা নিজেরাই উৎপাদন করত। সে ছিল প্রায় অবিমিশ্র স্বভাব অর্থনীতি; অর্থের প্রায় কোনো প্রয়োজনই ছিল না। পুঁজিবাদী উৎপাদন এই অবস্থার অবসান ঘটাল মুদ্রা অর্থনীতি ও বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা। কিন্তু এজমালি জমি যদি কৃষকের অস্তিত্বের প্রথম মূল শর্ত বলে ধরা হয়, তবে শিল্পগত এই গৌণ বৃত্তি তার দ্বিতীয় শর্ত। এবং এইভাবেই কৃষক আরও গভীরে ডুবতে থাকে। করভার, শস্যহানি, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা আর মামলা মকদ্দমা একজনের পর একজন কৃষককে মহাজনের কবলে ঠেলে দেয়; ঋণগ্রস্ততা ক্রমেই আরও সর্বজনীন হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমাগত বেড়ে চলে — সংক্ষেপে,

বিগত উৎপাদন-পদ্ধতির অন্য সব অবশেষের মতোই, আমাদের ছোট কৃষকও অসহায়ভাবে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। সে একজন ভবিষ্যৎ প্রলেতারীয়।

এইদিক থেকে সমাজতন্ত্রী প্রচারে তার সাগ্রহেই সাড়া দেওয়া উচিত। কিন্তু তার দৃঢ়মূল সম্পত্তিবোধ তাকে সাময়িকভাবে বাধা দিচ্ছে। তার বিপন্ন জমিটুকু রক্ষা করা যতই কঠিন হয়ে ওঠে, ততই সে আরও মরীয়া হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে, আর যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সমস্ত ভূসম্পত্তি সমগ্র সমাজের হাতে তুলে দেবার কথা বলে, তাদেরকে সে মহাজন আর উকিলদের মতোই বিপজ্জনক শত্রু বলে ভাবতে থাকে। তাদের এই প্রতিকূল ধারণাকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি কীভাবে কাটিয়ে উঠতে পারে? নিজেদের প্রতি অসৎ না হয়েও ধ্বংসোন্মুখ ছোট কৃষককে সে কী দিতে পারে?

এই প্রসঙ্গে মার্কসীয় প্রবণতাবিশিষ্ট ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের কৃষি কর্মসূচি থেকে আমরা একটি ব্যবহারিক নির্ভরবিন্দু পাই; ছোট কৃষক অর্থনীতির চিরায়ত দেশ থেকে এসেছে বলেই এই কর্মসূচিটি আরো অনুধাবনযোগ্য।

১৮৯২-এ অনুষ্ঠিত **মার্সাই** কংগ্রেসে পার্টির প্রথম কৃষি কর্মসূচি গৃহীত হয়। তাতে সম্পত্তিহীন গ্রামীণ **শ্রমিকদের** (অর্থাৎ দিন-মজুর ও চাকরবাকরদের) জন্য দাবি করা হয়: ট্রেড ইউনিয়ন ও গোষ্ঠীর পরিষদগুলি দ্বারা নির্ধারিত সর্বনিম্ন মজুরি; গ্রামীণ বৃত্তি-আদালত, যার অর্ধেক সভ্য হবে শ্রমিক; গোষ্ঠীর জমি বিক্রয় নিষিদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রীয় জমি গোষ্ঠীর কাছে ইজারা দেওয়া, এই গোষ্ঠীগুলো সমস্ত জমি — তা সে জমি নিজেদের হোক বা ইজারা নেওয়াই হোক — মিলিত চাষের জন্য সম্পত্তিহীন খেতমজুর পরিবারদের নিয়ে গঠিত সমিতিকে ইজারা দেবে এই শর্তে যে, তারা মজুরি-শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবে না, গোষ্ঠী তাদের ওপর তদারক করবে; বার্ধক্য ও অশক্ত অবস্থার জন্য পেনশন, তার খরচ চালানো হবে বড় বড় ভূসম্পত্তির উপর বিশেষ কর বসিয়ে।

ইজারাদার ও ভাগচাষীদের (métayers) কথাও বিশেষ বিবেচনা করে,

কর্মসূচিতে **ছোট কৃষকদের** জন্য এই দাবি করা হয়েছে: গোষ্ঠী চাষের যন্ত্রপাতি কিনে সেগুলি পড়তা খরচায় কৃষকদের কাছে ইজারা দেবে; সার, পয়ঃপ্রণালীর পাইপ, বীজ প্রভৃতি ক্রয় এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কৃষকদের সমবায় সমিতি গঠন; ৫,০০০ ফ্রাঁর বেশি মূল্যের ভূসম্পত্তি না হলে তার উপর থেকে হস্তান্তর কর তুলে নেওয়া; অতিরিক্ত খাজনা কমাবার জন্য এবং যে ইজারাদার বা ভাগচাষী (métayers) জমি ছেড়ে দিচ্ছে তার শ্রমের মধ্য দিয়ে জমির উন্নতির দরুন তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আইরিশ আদর্শে সালিশী কমিশন; Code civil*-এর যে ২১০২ নং ধারা জমিদারদের হাতে ফসল ক্রোক করার অধিকার দিয়েছে সেই ধারা রদ এবং কেটে তোলার আগে মাঠের ফসল বন্ধকী দখলের যে ক্ষমতা মহাজনদের আছে তার অবসান; নির্দিষ্ট পরিমাণ চাষের যন্ত্রপাতি এবং ফসল, বীজ, সার, ভারবাহী পশু, এককথায় কাজ চালাবার জন্য চাষীর একান্ত প্রয়োজনীয় সব কিছুতে বন্ধকী দখল নিষিদ্ধ করা; বহুদিন থেকেই অচল হয়ে পড়া সাধারণ মোকররী তালিকার সংশোধন, এবং যতদিন তা না হয় ততদিন প্রতি গোষ্ঠীতে স্থানীয় সংশোধন; সর্বশেষে, চাষ সম্পর্কে বিনামূল্যে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা এবং পরীক্ষামূলক কৃষিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

দেখা যাচ্ছে যে, কৃষকদের জন্য যেসব দাবি করা হয়েছে -- শ্রমিকদের জন্য দাবিগুলি আপাতত আমাদের আলোচ্য নয় — সেগুলি খুব সুদূরপ্রসারী নয়। এর একাংশ ইতিমধ্যেই অন্যান্য কোনো কোনো দেশে প্রচলিত হয়েছে। ইজারাদারদের সালিশী আদালত যে আইরিশ আদর্শ থেকে নেওয়া হয়েছে, সেকথা তো স্পষ্ট। কৃষকদের সমবায় সমিতি রাইন প্রদেশে আগে থেকেই আছে। মোকররী তালিকার সংশোধন সারা পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত উদারপন্থী, এমন কি আমলাদেরও চিরকালের সাধু ইচ্ছা। অন্যান্য দাবিগুলিও বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গুরুতর কোনো হানি না করে কার্যে পরিণত করা যায়। কর্মসূচিটির চরিত্র বর্ণনা করার জন্যই এত আলোচনা, তিরস্কার এর উদ্দেশ্য নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত।

ফ্রান্সের অতি বিভিন্ন ধরনের সব অঞ্চলে এই কর্মসূচি নিয়ে পার্টি

* দেওয়ানি বিধি (১১৭)। — সম্পাঃ

এত চমৎকার কাজ করেছে যে, কৃষকদের রুচির সঙ্গে এটিকে আরও খাপ খাইয়ে নেবার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে লাগল, কেননা খেতে পেলেই ক্ষিদে বাড়ে। সেইসঙ্গে অবশ্য এও বোঝা গেল যে, এতে বিপজ্জনক পথে পা দেওয়া হবে। সাধারণ সমাজতন্ত্রী কর্মসূচির মূলনীতিগুলি লঙ্ঘন না করে কৃষককে, ভবিষ্যৎ প্রলেতারীয় রূপে নয়, আজকের সম্পত্তি-মালিক কৃষককে কি সাহায্য করা সম্ভব? এই আপত্তি খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে নতুন ব্যবহারিক প্রস্তাবগুলির আগে একটি তত্ত্বগত মুখবন্ধ যোগ করে দেওয়া হল, তাতে প্রমাণ করার চেষ্টা হল যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্তির হাত থেকে ছোট কৃষকের সম্পত্তি রক্ষা করা সমাজতন্ত্রের নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, যদিও একথা ভালো করেই জানা আছে যে, সে ধ্বংস অনিবার্য। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে নান্ত কংগ্রেসে গৃহীত এই মুখবন্ধটি এবং তার সঙ্গে দাবিগুলিও এবার আরও একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা যাক।

মুখবন্ধটি শুরু হয়েছে এইভাবে:

'যে-হেতু, পার্টির সাধারণ কর্মসূচি অনুসারে উৎপাদকেরা মুক্ত হতে পারে কেবল উৎপাদন-উপায়ের উপর তাদের মালিকানা বর্তালে;

'যে-হেতু, শিল্পক্ষেত্রে এই সমস্ত উৎপাদন-উপায় ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদী কেন্দ্রীকরণের এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, একমাত্র যৌথ বা সামাজিক রূপেই সেগুলি উৎপাদকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা যায়, অথচ কৃষির ক্ষেত্রে — অন্তত বর্তমান ফ্রান্সে — অবস্থা মোটেই সেরকম নয়, কেননা, উৎপাদন-উপায়, অর্থাৎ জমি বহু অঞ্চলে এখনও এক একজন উৎপাদকের হাতে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে বর্তমান;

'যে-হেতু, ক্ষুদ্রায়তন মালিকানা যার বৈশিষ্ট্য সেই বর্তমান ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য হলেও (est fatalement appelé a disparaître) সে ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করা সমাজতন্ত্রের কাজ নয়, কেননা শ্রমের কাছ থেকে সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করা তার কর্তব্য নয়, বরং তার বিপরীত, সর্বপ্রকার উৎপাদনের এই দুই উপাদানকে একই হাতে ন্যস্ত করে এক করে দেওয়াই তার কর্তব্য — প্রলেতারীয়ে পরিণত শ্রমিকের দাসত্ব ও দারিদ্র্য এই দুই উপাদানের **বিচ্ছিন্নতারই ফল;**

'যে-হেতু, এক দিকে, যেমন বড় বড় ভূসম্পত্তির বর্তমান অলস মালিকদের উচ্ছেদ করে সেই সমস্ত ভূসম্পত্তির উপরে কৃষক প্রলেতারীয়দের যৌথ বা সামাজিক মালিকানার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সমাজতন্ত্রের কর্তব্য, অপর দিকেও, তেমনি যে কৃষক নিজ

ভূমিখণ্ডের দখল রেখে নিজেই চাষ করে তাকে করভার, সুদখোর মহাজন এবং নতুন গজিয়ে ওঠা বড় বড় জমিদারদের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখাও সমাজতন্ত্রের কম জরুরী কর্তব্য নয়;

'যে-হেতু, যেসব উৎপাদনকারী ইজারাদার বা ভাগচাষী (métayers) হিসেবে অন্য মালিকের জমি চাষ করে এবং যারা নিজেরা দিন-মজুরদের শোষণ করলেও সেটা করতে খানিকটা বাধ্য হয় তারা নিজেরাও শোষিত হয় বলেই, তাদেরও জন্য উপরোক্ত রক্ষা-ব্যবস্থা প্রযোজ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত, —

'তাই শ্রমিক পার্টি, যে পার্টি নৈরাজ্যবাদীদের মতো সমাজ-ব্যবস্থা রূপান্তরের জন্য দারিদ্র্যের বৃদ্ধি ও বিস্তারের উপর নির্ভর করে না, বরং বিশ্বাস করে যে, শহর ও গ্রামের মেহনতীদের সংগঠন ও মিলিত প্রচেষ্টায়, সরকার ও আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা স্বহস্তে অধিকার করার মাধ্যমেই কেবলমাত্র শ্রম ও সমাজের মুক্তিলাভ সম্ভব, — সেই শ্রমিক পার্টি নিম্নলিখিত কৃষি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যাতে গ্রামীণ উৎপাদণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশকে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকার ও পাট্টার বলে যেসব বৃত্তিতে জাতীয় ভূমি-সম্পদ ব্যবহার করা হয় সেই সব বৃত্তিকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে, ভূস্বামী সামন্ত-প্রথার বিরুদ্ধে একই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা যায়।'

এবার এই সব 'যে-হেতু' আর একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা যাক।

প্রথমত, উৎপাদকদের মুক্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদন-উপায়ের উপর তাদের অধিকার, ফরাসী কর্মসূচির এই উক্তিটির সঙ্গেই জড়িত পরের কথাগুলি যোগ করে নেওয়া একান্ত দরকার যে, উৎপাদন-উপায়ের উপর অধিকার মাত্র দুটি রূপে সম্ভব, হয় ব্যক্তিগত অধিকাররূপে, সমস্ত উৎপাদকদের ক্ষেত্রে একইরূপে এই অধিকার কখনও কোথাও ছিল না এবং শিল্প-প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রোজই তা আরও অসম্ভব হয়ে উঠছে; নতুবা সাধারণের অধিকাররূপে, পুঁজিবাদী সমাজের নিজস্ব বিকাশের মধ্য দিয়েই এই ধরনের অধিকারের বৈষয়িক ও মানসিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে; এবং সেই জন্যই, প্রলেতারিয়েতকে তার ক্ষমতাধীন সমস্ত উপায় দিয়ে উৎপাদন-উপায়ের উপর **যৌথ** অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

এইভাবে, উৎপাদন-উপায়গুলির উপর যৌথ অধিকার প্রতিষ্ঠাই এখানে একমাত্র প্রধান লক্ষ্য বলে উপস্থিত করা হচ্ছে, যারই জন্য লড়াই করতে হবে। ইতিমধ্যেই যার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে সেই শিল্পক্ষেত্রেই কেবল তা নয়, সর্বত্রই, সুতরাং কৃষিক্ষেত্রেও। কর্মসূচি অনুসারে সব উৎপাদকের ক্ষেত্রে

কখনও কোথাও ব্যক্তিগত অধিকার একইরূপে থাকে নি, আর ঠিক সেই কারণেই, এবং তাছাড়াও শিল্প-প্রগতি যখন শেষ পর্যন্ত এর অবসান ঘটাবেই, তখন একে বজায় রাখায় সমাজতন্ত্রের কোনো আগ্রহ নেই, বরং এর অপসারণেই তার আগ্রহ, কেননা এই ধরনের অধিকার যেখানে যতটা পরিমাণে বর্তমান সেখানে ততটা পরিমাণে যৌথ অধিকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কর্মসূচির উল্লেখ করতে হলে সমস্ত কর্মসূচির উল্লেখ করা দরকার। তাতে নান্ত-এ উদ্ধৃত প্রতিপাদ্যটা বেশ কিছুটা বদলে যায়, কেননা তাতে করে অভিব্যক্ত সাধারণ ঐতিহাসিক সত্যটাকে সেই শর্তসাপেক্ষ করা হচ্ছে, যা থাকলে তবেই তা আজ পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় সত্য হতে পারে।

নিজ উৎপাদন-উপায়ের উপর অধিকার থাকলেই একজন উৎপাদক প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে, সে অবস্থা আর নেই। শহরাঞ্চলে হস্তশিল্প তো ইতিমধ্যেই ধ্বংস পেয়েছে, লন্ডনের মতো মহানগরীগুলিতে তা একেবারেই অন্তর্হিত হয়েছে, তার স্থান নিয়েছে বৃহদায়তন শিল্প, রক্ত-নিংড়ানো কারখানা-ব্যবস্থা আর সেই হতভাগা প্রবঞ্চকদের দল, দেউলিয়াপনার প্রসাদে যাদের জীবনযাপন ঘটে। স্ব-নির্ভর ছোট কৃষকের নিজের ছোট জমির ফালিটুকুর উপর অধিকারও নিরাপদ নয়, স্বাধীনতাও তার নেই। তার ঘরবাড়ি, তার খামার, তার সামান্য কয়েক টুকরো জমি এবং তার সঙ্গে সে নিজে পর্যন্ত মহাজনের সম্পত্তি; তার জীবিকা প্রলেতারীয়ের চেয়েও অনিশ্চিত, প্রলেতারীয় তবু মাঝে মাঝে দু-একটা দিন শান্তিতে থাকতে পায়, চিরলাঞ্ছিত ঋণদাস সেটুকুও কখনও পায় না। দেওয়ানি বিধির ২১০২ নং ধারা তুলে দিন, আইনে ব্যবস্থা করে দিন যাতে কৃষকের চাষের সরঞ্জাম ও ভারবাহী পশু ক্রোক থেকে অব্যাহতি পাবে, তবু তাকে সেই নিরুপায় অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারবেন না, যখন সে 'স্বেচ্ছায়' তার গোরু-বলদ বেচতে বাধ্য হবে, মহাজনের কাছে দেহমন লিখে দিয়ে সাময়িক রেহাই পেয়ে খুশী হবে। ছোট কৃষককে তার সম্পত্তিতে টিকিয়ে রাখার জন্য আপনাদের এই চেষ্টায় তার স্বাধীনতা রক্ষা পায় না, কেবল তার দাসত্বের বিশেষ রূপটিই বজায় থাকে; শুধু জীবন্মৃত অবস্থাই চালিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তার বাঁচারও উপায় নেই, মরারও উপায় নেই। সুতরাং,

আপনাদের বক্তব্যের সমর্থনে আপনাদের কর্মসূচির প্রথম অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা এখানে একান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

মুখবন্ধে বলা হয়েছে, আজকের ফ্রান্সে উৎপাদনের উপায়, অর্থাৎ জমি, অনেক অঞ্চলেই এখনও এক একজন উৎপাদকের হাতে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে রয়েছে; এবং শ্রমের কাছ থেকে সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া সমাজতন্ত্রের কর্তব্য নয়, বরং সমস্ত উৎপাদনের এই দুই উপাদানকে এক হাতে ন্যস্ত করে মিলিত করাই তার কর্তব্য। — ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, শেষোক্তটা এইরকম সাধারণ রূপে, কোনোক্রমেই সমাজতন্ত্রের কর্তব্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তার কর্তব্য হচ্ছে কেবল উৎপাদন-উপায়গুলিকে উৎপাদকদের কাছে **সাধারণ মালিকানা** হিসেবে হস্তান্তরিত করা। এই কথাটি ভুলে গেলেই উক্তিটি সরাসরি বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে, কেননা তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ছোট কৃষকের নিজ জমির উপর বর্তমানে যে ভুয়া অধিকার আছে তাকে প্রকৃত অধিকারে পরিণত করা, অর্থাৎ ছোট ইজারাদারকে মালিকে পরিণত করা এবং ঋণগ্রস্ত মালিককে ঋণমুক্ত মালিকে রূপান্তরিত করাই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। কৃষক মালিকানার এই ভুয়া আপাতদৃশ্যের অবসান সমাজতন্ত্র নিশ্চয়ই চায়, কিন্তু এভাবে নয়।

সে যাই হোক, এত দূর পর্যন্ত যখন এগিয়ে আসা গেল তখন কর্মসূচির মুখবন্ধ এবার সরাসরি ঘোষণা করতে পারে যে, সমাজতন্ত্রের কর্তব্য, শুধু কর্তব্য নয়, অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হচ্ছে,

> 'যে কৃষক নিজ ভূমিখণ্ডের দখল রেখে নিজেই চাষ করে তাকে করভার, সুদখোর মহাজন এবং নতুন গজিয়ে ওঠা বড় বড় জমিদারদের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখা।'

এইভাবে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যা অসম্ভব বলে ঘোষণা করা হল, এখানে মুখবন্ধে সেই কাজই অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে সমাজতন্ত্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষকের ক্ষুদ্রায়তন কৃষি-ব্যবস্থাকে 'বজায় রাখার' ভার দেওয়া হচ্ছে, অথচ এই মুখবন্ধেই বলা হয়েছে যে, এই ধরনের মালিকানার 'ধ্বংস অনিবার্য'। পুঁজিবাদী উৎপাদন যেসব হাতিয়ারে এই অনিবার্য ধ্বংস সংঘটিত করে তা এই করভার, সুদখোর মহাজন এবং নতুন গজিয়ে ওঠা বড়

বড় জমিদাররা ছাড়া আর কী? এই 'ত্রিমূর্তি'র' কবল থেকে কৃষককে রক্ষার জন্য 'সমাজতন্ত্র' কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেটা আমরা নিচে দেখতে পাব।

কিন্তু কেবল ছোট কৃষকের সম্পত্তিকে রক্ষা করলেই হবে না।

'যেসব উৎপাদনকারী ইজারাদার বা ভাগচাষী (métayers) হিসেবে অন্য মালিকের জমি চাষ করে এবং যারা নিজেরা দিন-মজুরদের শোষণ করলেও সেটা করতে খানিকটা বাধ্য হয় তারা নিজেরাও শোষিত হয় বলেই, তাদেরও জন্য উপরোক্ত রক্ষা-ব্যবস্থা প্রযোজ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত।'

এবার আমরা সত্যই বিচিত্র জায়গায় এসে পড়লাম। সমাজতন্ত্র বিশেষভাবে মজুরি-শ্রমের শোষণের বিরোধী। অথচ এখানে আক্ষরিকভাবে এই ভাষায় ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ফরাসী ইজারাদাররা যখন 'দিন-মজুরদের **শোষণ করে'** তখনও তাদের রক্ষা করা সমাজতন্ত্রের একান্ত কর্তব্য! আর তার কারণ এই যে, 'নিজেরাও শোষিত হয় বলেই' তারা এই শোষণ করতে অনেকটা বাধ্য হয়!

ঢালুতে একবার নামতে শুরু করলে গড়িয়ে যাওয়াটাই কত সহজ আর আরামদায়ক! এবার যখন জার্মানির বড় ও মাঝারি কৃষকরা এই অনুরোধ নিয়ে ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের কাছে আসবে যে, তাদের পুরুষ ও মেয়ে খেতমজুরদের শোষণের ব্যাপারে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি তাদের যাতে রক্ষা করে তার জন্য জার্মান পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে তাঁরা যেন একটু অনুরোধ করেন, এবং সেই বক্তব্যের সমর্থনে দেখাবে যে মহাজন, কর-আদায়কারী, শস্য-ফাটকাবাজ এবং পশু ব্যবসায়ীদের দ্বারা 'তারাও শোষিত হয়', তখন ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা কী জবাব দেবেন? আমাদের বড় বড় ভূস্বামীরাও যে কাউন্ট কানিৎসকে (ইনিও শস্য আমদানির ব্যাপারে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের অনুরূপ এক প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন) ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের কাছে পাঠিয়ে গ্রামীণ শ্রমিক শোষণ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে বলবে না এবং এই কথার সমর্থনে ফাটকাবাজার, মহাজন ও শস্য-ফাটকাবাজদের দ্বারা 'তারা নিজেরাও শোষিত হয়' এই যুক্তি হাজির করবে না, তারই কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে, আমাদের ফরাসী বন্ধুদের উদ্দেশ্য যতটা খারাপ মনে হচ্ছে ততটা খারাপ নয়। জানা গেল যে, উপরের উক্তিটি কেবল একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য, সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে এই: আমাদের যেসব অঞ্চলে চিনি-বীট চাষ করা হয় সেই সব অঞ্চলেরই মতো উত্তর ফ্রান্সেও বীট চাষ করতেই হবে, এই বাধ্যবাধকতায় ও অত্যন্ত কঠোর শর্তে কৃষকদের জমি ইজারা দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট কোনো কারখানায় তারই দ্বারা নির্দিষ্ট মূল্যে তাদের সেই বীট সরবরাহ করতে হবে, নির্দিষ্ট বীজ কিনতে হবে, জমিতে নির্দিষ্ট সার নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে হবে এবং তারপর ফসল পেঁছে দেবার সময় প্রচণ্ডভাবে ঠকতে হবে। জার্মানিতেও আমরা এই ধরনের ব্যবস্থার সঙ্গে খুবই পরিচিত। কিন্তু এই ধরনের কৃষককে রক্ষা করার কথাই যদি হয়, তবে সে কথা স্পষ্টভাবে খোলাখুলি বলাই উচিত। বাক্যটি এখন যেভাবে আছে তার সেই সাধারণ অ-সীমাবদ্ধ রূপে কেবল যে ফরাসী কর্মসূচিরই বিরোধিতা করা হয় তাই নয়, সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের মূলনীতিও লঙ্ঘন করা হয়, ফলে বিভিন্ন মহল থেকে যদি তাঁদের অভিপ্রায়ের বিপরীতে অসাবধান সম্পাদনার এই নিদর্শনটি তাঁদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয় তাহলেও রচয়িতাদের পক্ষ থেকে নালিশ করার উপায় থাকবে না।

মুখবন্ধের শেষ কথাটিরও কদর্থ হওয়া সম্ভব। সেখানে বলা হচ্ছে যে,

> 'গ্রামীণ উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশকে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকার ও পাট্টার বলে যেসব বৃত্তিতে জাতীয় ভূমি-সম্পদ ব্যবহার করা হয় সেই সব বৃত্তিকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে, ভূস্বামী সামন্ত-প্রথার বিরুদ্ধে একই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা'

শ্রমিক সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্তব্য।

গ্রামের প্রলেতারিয়েত এবং ছোট কৃষক ছাড়াও, মাঝারি ও বড় কৃষক, এমন কি বড় বড় মহালের ইজারাদার, পুঁজিবাদী পশু-প্রজনন ব্যবসায়ী এবং জাতির ভূমি-সম্পদের অন্যান্য পুঁজিবাদী ব্যবহারকারীদেরও নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেওয়া শ্রমিক সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্তব্য হতে পারে, একথা আমি সরাসরি অস্বীকার করি। ভূস্বামী সামন্ততন্ত্র এদের সবারই কাছে শত্রুরূপে দেখা দিতে পারে। কোনো কোনো প্রশ্নে আমরা এদের সঙ্গে

সমস্বার্থ হতে বা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য সাধনের জন্য কখনও কখনও পাশাপাশি লড়াই করতেও পারি। সমাজের যেকোনো শ্রেণী থেকে আগত ব্যক্তিবিশেষকে আমরা পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, কিন্তু পুঁজিপতি, মাঝারি বুর্জোয়া বা মাঝারি কৃষক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো গোষ্ঠীতে আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই। অবশ্য এক্ষেত্রেও, এঁদের আসল উদ্দেশ্য যতটা খারাপ দেখাচ্ছে ততটা খারাপ নয়। স্পষ্টতই, কর্মসূচির রচয়িতারা এসব দিক সম্পর্কে বিশেষ ভাবেনই নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ উক্তির উৎসাহে তাঁরা গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং তাঁরা মুখে ঠিক যা বলছেন সেই ভাবেই সেটা নিলে তাঁদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

মুখবন্ধের পরই আসে কর্মসূচিরই নতুন সংযোজনীর কথা। এখানেও সেই মুখবন্ধের মতোই অসাবধান সম্পাদনার পরিচয় পাওয়া যায়।

যে ধারায় বলা হয়েছিল যে, গোষ্ঠীকেই চাষের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলি পড়তা খরচায় কৃষকদের কাছে ইজারা দিতে হবে, সেটিকে বদলে এইভাবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, প্রথমত, গোষ্ঠী এর জন্য রাষ্ট্র থেকে অর্থ সাহায্য পাবে এবং দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি ছোট কৃষককে দেওয়া হবে বিনামূল্যে। এই অতিরিক্ত সুবিধায়ও ছোট কৃষকের বিশেষ কোনো উপকার হবে না, কেননা তার খেত ও উৎপাদন-পদ্ধতি এমনই যে সেখানে যন্ত্রপাতির ব্যবহার অতি সামান্যই সম্ভব।

তারপর,

> 'বর্তমান সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পরিবর্তে ৩,০০০ ফ্রাঁর বেশি সমস্ত আয়ের উপর ক্রমবর্ধমান হারে একটিমাত্র আয়কর প্রবর্তন।'

প্রায় প্রত্যেক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচিতেই বহু বছর ধরে এই ধরনের একটা দাবি স্থান পেয়ে আসছে। কিন্তু এখানে দাবিটিকে যে ছোট কৃষকদের বিশেষ স্বার্থে তোলা হয়েছে সেটা সত্যই অভিনব, এবং তাতে বোঝা যায় যে, এই দাবির বাস্তব তাৎপর্য কত কম বিবেচনা করা হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনের উদাহরণই ধরা যাক। সেখানে রাষ্ট্রের বাৎসরিক বাজেটের পরিমাণ ৯ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং। তার মধ্যে ১ কোটি ৩৫ লাখ থেকে ১ কোটি ৪০ লাখ আসে আয়কর থেকে। বাকি ৭ কোটি ৬০ লাখের

একটা ক্ষুদ্রতর অংশ আসে কারবারের উপর শুল্ক থেকে (ডাক ও তার-ব্যবস্থা থেকে আদায়, স্ট্যাম্প শুল্ক); কিন্তু বৃহত্তম অংশই আসে সর্বসাধারণের ভোগ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক থেকে, দেশবাসীর, বিশেষত তার দরিদ্র অংশের প্রত্যেকের আয় থেকে প্রতিবারে যৎসামান্য, অননুভবনীয় একটু করে কেটে কেটে নিয়ে, যার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় কোটি কোটি পাউন্ড। বর্তমান সমাজে রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহ করার অন্য কোনো পথ নেই বললেই চলে। ধরে নেওয়া যাক, গ্রেট ব্রিটেনে যাদের আয় ১২০ পাউন্ড স্টার্লিং (৩,০০০ ফ্রাঁ) বা তার বেশি তাদের সকলের উপর প্রত্যক্ষ ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর বসিয়ে এই ৯ কোটির বোঝা সবটাই চাপিয়ে দেওয়া হল। গিফেনের মতে, গড় জাতীয় সঞ্চয়, সর্বমোট জাতীয় সম্পদের বাৎসরিক বৃদ্ধি ১৮৬৫-১৮৭৫-এ ছিল ২৪ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং। ধরে নেওয়া যাক বর্তমানে তার পরিমাণ বাৎসরিক ৩০ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে; ৯ কোটি ট্যাক্সের ভার এই সর্বমোট সঞ্চয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গ্রাস করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমাজতন্ত্রী সরকার ছাড়া অন্য কোনো সরকার এরকম একটা কাজে হাত দিতে পারে না। আর সমাজতন্ত্রীরা যখন রাষ্ট্রের হাল ধরবে তখন তাদের এমন বহু কাজই করতে হবে যার কাছে কর-ব্যবস্থার এই সংস্কার নিতান্তই, ও রীতিমতো তাৎপর্যহীন, তাৎক্ষণিক বন্দোবস্ত বলে মনে হবে, এবং ছোট কৃষকদের সামনে তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে।

কর্মসূচির রচয়িতাদের, বোধ হয়, একথা খেয়াল ছিল যে, কর-ব্যবস্থার এই সংস্কারের জন্য কৃষককে বেশ দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। তাই 'অন্তর্বর্তীকালে' (en attendant) তাদের এই পরিপ্রেক্ষিত দেওয়া হচ্ছে:

> 'নিজ শ্রমে জীবিকা নির্বাহকারী সমস্ত কৃষকের ভূমিকর থেকে অব্যাহতি এবং সমস্ত বন্ধকী জমির উপর এই করভার হ্রাস।'

এই দাবির শেষার্ধ শুধু **বৃহত্তর** জোত নিয়েই সম্ভব, যেগুলির কেবলমাত্র নিজ পরিবার দ্বারা চাষ হয় না; সুতরাং, এই ব্যবস্থাও সেই সব কৃষকের অনুকূলে, যারা 'দিন-মজুরদের শোষণ করে'।

তারপর:

'পশুপাখি, মৎস্য ও শস্য সংরক্ষণের জন্য যে বিধিনিষেধের প্রয়োজন, তাছাড়া অন্য সর্ববিষয়ে শিকার ও মাছ ধরার নিরঙ্কুশ অধিকার।'

কথাটা শুনতে খুব জনপ্রিয়, কিন্তু বাক্যটির প্রথমাংশ শেষাংশকে নাকচ করে দিয়েছে। কৃষক পরিবার প্রতি কটি খরগোস, পাখি বা মাছ আজও গ্রামাঞ্চলে আছে? প্রত্যেক কৃষককে বছরে **একটিমাত্র** দিন শিকার ও মাছ ধরার অধিকার দিলে যত দরকার তার চেয়ে বেশি বলে মনে হয় কি?

'আইনগত ও প্রথাগত সুদের হার হ্রাস'

— সুতরাং, নতুন তেজারতি আইন, গত দুহাজার বছর ধরে যে পুলিসী ব্যবস্থা সর্বদেশে সর্বকালে ব্যর্থ হয়েছে তাকে আর একবার চালু করার প্রচেষ্টা। ছোট কৃষক যদি এমন অবস্থায় পড়ে যখন মহাজনের শরণাপন্ন হওয়াই তার কাছে কম বিপদ, তখন মহাজন তেজারতি আইন বাঁচিয়েই তার অস্থিমজ্জা শুষে নেবার উপায় ঠিক বার করে নেবে। এর দ্বারা বড়জোর ছোট কৃষককে প্রবোধ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার কোনো উপকার এতে হবে না; বরং, সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় ঋণ পেতে তার আরও অসুবিধারই সৃষ্টি করবে।

'বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং পড়তা খরচায় ঔষধ পাওয়ার ব্যবস্থা'

— এটা আর যাই হোক, কেবল কৃষককে রক্ষা করার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নয়, জার্মান কর্মসূচি এর চেয়ে অগ্রসর, সেখানে ঔষধও বিনামূল্যে দাবি করা হয়েছে।

'যেসব সংরক্ষিত সৈনিকদের সামরিক কাজে ডাকা হয়েছে তাদের পরিবারদের জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা'

— জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ায় এই ব্যবস্থা খুবই অ-সন্তোষজনকভাবে হলেও বর্তমান, তাছাড়া এটাও কেবল কৃষকদের দাবি নয়।

'জমির জন্য সার, চাষের যন্ত্রপাতি ও উৎপন্ন মাল পরিবহণের মূল্য হ্রাস'

— মোটামুটিভাবে জার্মানিতে চালু রয়েছে এবং রয়েছে প্রধানত... বড় বড় ভূস্বামীদেরই স্বার্থে।

'জমির উন্নতিসাধন এবং কৃষি উৎপাদন বিকাশের উদ্দেশ্যে পূর্তকর্মের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনার জন্য অবিলম্ব প্রস্তুতি-কাজ' —

এতে সবকিছুই অনিশ্চিত ও মনোরম প্রতিশ্রুতির জগতে থেকে যায় এবং এতেও সর্বোপরি বড় বড় ভূসম্পত্তিরই স্বার্থসাধন হয়।

সংক্ষেপে, মুখবন্ধে প্রদর্শিত প্রচণ্ড তত্ত্বগত প্রচেষ্টার পর, ফরাসী শ্রমিক পার্টি কোন পন্থায় ছোট কৃষককে তার ছোট জোতের অধিকারে টিকিয়ে রাখবে বলে আশা করে, যে অধিকারের ধ্বংস কর্মসূচিরই ভাষায় অনিবার্য — সেকথা তাদের নতুন কৃষি-সংক্রান্ত কর্মসূচির ব্যবহারিক প্রস্তাবের পরও আরও বেশি অস্পষ্ট রয়ে গেল।

২

একটি বিষয়ে আমাদের ফরাসী কমরেডরা সম্পূর্ণ ঠিক: — ফ্রান্সে ছোট কৃষকদের **ইচ্ছার বিরুদ্ধে** কোনো স্থায়ী বিপ্লবী রূপান্তর সম্ভব নয়। তবে আমার মতে, কৃষকদের প্রভাবাধীনে আনাই যদি তাঁদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাঁরা ঠিক জায়গাটিতে হাত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তাঁরা অবিলম্বে, এমন কি সম্ভবত আগামী সাধারণ নির্বাচনে ছোট কৃষকদের নিজের পক্ষে টানতে চান বলে মনে হয়। অত্যন্ত বিপজ্জনক সব সাধারণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং তার সমর্থনে আরও বিপজ্জনক সব তত্ত্বগত যুক্তি খাড়া করেই মাত্র তাঁরা এ কাজে সফল হবার আশা করতে পারেন। তার পরে যখন ভালো করে বিচার করা হয় তখন ধরা পড়ে যে, এই সাধারণ প্রতিশ্রুতিগুলি পরস্পর-বিরোধী (যে-ব্যবস্থার ধ্বংস নিজেরাই অনিবার্য বলে ঘোষণা করেছেন তাকেই টিকিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি) এবং যেসব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলি হয় ব্যবহারিকভাবে নিতান্তই নিষ্ফল (তেজারতি আইন), নয়তো তা সাধারণভাবেই শ্রমিকদের দাবি, অথবা এমন দাবি যাতে

বড় বড় ভূস্বামীরাও উপকৃত হয়, কিংবা শেষত, এমন দাবি, ছোট কৃষকের স্বার্থসাধনে যার কোনোদিক থেকেই বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। ফলে, কর্মসূচির প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অংশ দ্বারা তার ভ্রান্ত প্রথমাংশ আপনা থেকেই সংশোধিত হয় এবং মুখবন্ধের আপাত ভয়াবহ বাগাড়ম্বর বাস্তবে নিরীহ ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

কথাটা গোড়াতেই স্পষ্ট বলে নেওয়া যাক: ছোট কৃষকদের সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং তাদের বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে যে কুসংস্কার উদ্ভূত হয় যাতে ইন্ধন জোগায় বুর্জোয়া সংবাদপত্র আর বড় বড় ভূস্বামীরা, তাতে ছোট কৃষককে অবিলম্বে পক্ষে টানা সম্ভব কেবল এমন সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে যা রক্ষা করা যাবে না বলে আমরা নিজেরাই জানি। অর্থাৎ, যত অর্থনৈতিক শক্তির ঝাপটা তাদের উপর আসছে কেবল তা থেকেই সর্বদা তাদের সম্পত্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে চলবে না। বর্তমানে তাদের উপর যেসব বোঝা চেপে আছে তা থেকেও মুক্ত করার: ইজারাদারকে স্বাধীন মালিকে পরিণত করার, বন্ধকী দায়ের ভারে মুমূর্ষু মালিককে ঋণ থেকে মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও আমাদের দিতে হবে। তা করতে পারলেও আমরা আবার সেইখানেই ফিরে যাব যেখান থেকে ঐ বর্তমান অবস্থার পুনরাবর্তন আবার শুরু হতে বাধ্য। কৃষককে মুক্ত করতে আমরা পারব না, একটা সাময়িক রেহাই দেব শুধু।

কিন্তু আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা গেল না বলে আগামীকাল আবার যাকে হারাতে হবে, সেই কৃষককে আজ রাতারাতি পক্ষে আনায় আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। যে-ছোট কারিগর চিরস্থায়ীভাবে মালিক হতে পারলে খুশী হয় তাকে পার্টিতে এনে যতটা লাভ, যে কৃষক আশা করে যে আমরা তার ক্ষুদ্র জোতের সম্পত্তি চিরস্থায়ী করে দেব তাকে পার্টিতে এনে তার চেয়ে বেশি কোনো লাভ নেই। এ সব লোকের জায়গা সেমেটিক-বিরোধীদের [anti-Semites] মধ্যে। তাদের কাছেই এরা যাক এবং তারাই এদের ছোট ছোট গৃহস্থালীকে পুনরুদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিক। এই সব ফাঁকা কথার প্রকৃত মূল্য কী এবং সেমেটিক-বিরোধী স্বর্গ থেকে কোন সুরঝঙ্কার নেমে আসে সে শিক্ষা একবার পেলে, তখন এরা ক্রমেই বুঝবে যে, আমরা, যারা অনেক কম প্রতিশ্রুতি দিই এবং মুক্তির অন্য পথ খুঁজি, সেই আমরা শেষ

পর্যন্ত অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। আমাদের দেশের মতো তীব্র সেমেটিক-বিরোধী বাগাড়ম্বর-বৃত্তি থাকলে ফরাসীরা কখনই নান্তের ভুল করতেন না।

ছোট কৃষকদের সম্বন্ধে তাহলে আমাদের মনোভাব কী হবে? ক্ষমতা দখলের সময় তাদের প্রতি কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত?

প্রথমেই বলা দরকার, ফরাসী কর্মসূচিতে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে যে, ছোট কৃষকদের অনিবার্য ধ্বংস আমরা আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কোনো হস্তক্ষেপ দ্বারা তাকে ত্বরান্বিত করা আমাদের ব্রত নয়।

দ্বিতীয়ত, এ কথাও সমান স্পষ্ট যে, আমরা যখন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করব তখন ছোট কৃষকদের জোর করে উৎখাত (ক্ষতিপূরণসহ বা বিনা ক্ষতিপূরণে) করার কথা আমরা চিন্তায়ও স্থান দেব না, কিন্তু বড় বড় ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে সেই পথই আমাদের নিতে হবে। ছোট কৃষকদের সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য হল, প্রথমত, তাদের ব্যক্তিগত উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সমবায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, জবরদস্তি করে নয়, উদাহরণ দেখিয়ে, এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক সাহায্যের প্রস্তাব করে। তখন নিশ্চয় ছোট কৃষককে তার ভবিষ্যৎ সুবিধা দেখিয়ে দেবার প্রচুর সুযোগ আমরা পাব, যে সুবিধা এমন কি আজই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা।

ডেনিশ সমাজতন্ত্রীদের দেশে প্রকৃত শহর বলতে একটিই — কোপেনহেগেন, তাই সেই শহরের বাইরে তাঁদের প্রচার প্রায় একমাত্র কৃষকদের উপর নির্ভরশীল। তাঁরা প্রায় ২০ বছর আগে এই ধরনের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। এক-একটি গ্রাম বা প্যারিশ-এর কৃষকরা — ডেনমার্কে অনেক বড় বড় ব্যক্তিগত গৃহস্থালী আছে — তাদের সমস্ত জমি মিলিত চাষের জন্য একত্র করে একটি একক বৃহৎ খামার গড়ে তুলবে এবং যে যত জমি, অর্থ বা শ্রম দিয়েছে, আয় সেই অনুপাতে ভাগ হবে। ডেনমার্কে ছোট ভূসম্পত্তির ভূমিকা খুবই গৌণ। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন কৃষিপ্রধান কোনো অঞ্চলে এই ধারণাকে কাজে লাগালে দেখা যাবে যে, সব একত্র করে মোট জমিতে বৃহদায়তন পদ্ধতিতে চাষ করলে এযাবৎ নিযুক্ত শ্রমশক্তির একটা অংশ বাড়তি হয়ে পড়বে। এই ধরনের শ্রম বাঁচানোই হচ্ছে বৃহদায়তন পদ্ধতিতে চাষের অন্যতম প্রধান সুবিধা। এই শ্রমশক্তি নিয়োগ করার দুটি পথ হতে পারে। হয়, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বড় বড় ভূসম্পত্তি থেকে অতিরিক্ত জমি

নিয়ে কৃষক সমবায়ের হাতে দেওয়া, নয়, এই কৃষকদের আনুষঙ্গিক বৃত্তি হিসেবে শিল্পে প্রবৃত্ত হওয়ার উপায় ও সম্ভাবনা জোগানো, মুখ্যত ও যতদূর সম্ভব তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং সেই সঙ্গে সমাজের কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে এতটা প্রভাব নিশ্চিত করা যাবে যাতে এই সব কৃষক সমবায়কে উচ্চতর পর্যায়ে রূপান্তরিত করা এবং সমগ্রভাবে সমবায় ও ব্যক্তিগতভাবে তাদের সভ্যদের দায়িত্ব ও অধিকার গোটা যৌথের অন্যান্য বিভাগের দায়িত্ব ও অধিকারের সমপর্যায়ে আনা সম্ভব হয়। নির্দিষ্ট এক-একটি ক্ষেত্রে কার্যত সেটা কীভাবে করা যাবে তা নির্ভর করবে প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশিষ্ট পরিবেশ এবং কোন অবস্থায় আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করছি তারই উপর। সুতরাং, এই সমবায়গুলিকে আরও কিছু সুবিধা দেওয়া হয়তো বা সম্ভব হতে পারবে, যেমন জাতীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা তাদের সমস্ত বন্ধকী ঋণের দায় গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে সুদের হারের প্রভূত হ্রাস; বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে অগ্রিম দাদন (এই দাদন যে প্রধানত অর্থেই দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম সার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবেও দেওয়া চলতে পারে) এবং অন্যান্য সুবিধা।

প্রধান কথা কৃষকদের এইটে বোঝানো যে, তাদের ঘরবাড়ি এবং জমিকে বাঁচাতে, রক্ষা করতে আমরা পারি কেবল সমবায়ী পদ্ধতিতে পরিচালিত সমবায়ী সম্পত্তিতে তাদের রূপান্তরিত করেই। ব্যক্তিগত মালিকানার শর্তাধীন ব্যক্তিগত চাষ-প্রথাই কৃষককে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যক্তিগত কাজের পদ্ধতি আঁকড়ে থাকতে চাইলে সে অনিবার্যভাবেই ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত হবে, তাদের সাবেকী উৎপাদন-পদ্ধতি পুঁজিবাদী বৃহদায়তন উৎপাদনের দ্বারা স্থানচ্যুত হবে। এই হচ্ছে আসল ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে আমরা কৃষকদের সামনে উপস্থিত হচ্ছি এবং তারা নিজেরাই যাতে পুঁজিপতিদের জন্য নয়, নিজেদেরই সকলের জন্য বৃহদায়তন পদ্ধতিতে উৎপাদন শুরু করতে পারে তার সুযোগ খুলে দিচ্ছি। এতে যে কৃষকেরই স্বার্থ রক্ষিত হবে, এই যে তাদের উদ্ধারের একমাত্র পথ, একথা তাদের বোঝানো কি সত্যই অসম্ভব?

পুঁজিবাদী উৎপাদনের সর্বশক্তিমত্তার কবল থেকে ছোট জোতের

মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাঁচিয়ে রাখব এমন প্রতিশ্রুতি তাকে আজ বা ভবিষ্যতে কখনও আমরা দিতে পারি না। এইটুকু প্রতিশ্রুতি কেবল দিতে পারি যে, তাদের সম্পত্তি-সম্পর্কে আমরা জোর করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো হস্তক্ষেপ করব না। তাছাড়াও, এই দাবি আমরা সমর্থন করতে পারি যে, ছোট কৃষকের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি ও বড় বড় ভূস্বামীর সংগ্রামে যেন এখন থেকে যতদূর সম্ভব কম অসাধু পন্থা গৃহীত হয় এবং বর্তমানে যে খোলাখুলি দস্যুতা ও বঞ্চনা প্রায়ই ঘটে তা যেন যতদূর সম্ভব বন্ধ হয়। অবশ্য ব্যতিক্রমমূলক দু-একটা ক্ষেত্রেই আমাদের দাবি ফলপ্রসূ হবে। বিকশিত পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে কোথায় সততার শেষ আর বঞ্চনার শুরু সেকথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু দেশের কর্তৃপক্ষ বঞ্চিতের পক্ষে, না বঞ্চকের পক্ষে, এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আমরা অবশ্যই দ্বিধাহীনভাবে ছোট কৃষকের পক্ষে; তার অবস্থা আরও সহনীয় করার জন্য, সে মনস্থির করলে তার সমবায়ে পেঁাছবার সর্বপ্রকার সুবিধা করে দিতে, এমন কি সে যদি তখনও এবিষয়ে মনস্থির করতে না পেরে থাকে তাহলে বেশ দীর্ঘকাল যাতে সে তার ছোট জমিটুকুতে টিকে থেকে আরও ভাবার সময় পায়, তার জন্য আমরা যথাসম্ভব সব কিছুই করব। নিজ শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে যে ছোট কৃষক তাকে আমরা আমাদেরই একজন মনে করি বলেই শুধু নয়, পার্টির প্রত্যক্ষ স্বার্থেও একাজ আমরা করি। যত বেশি সংখ্যক কৃষককে আমরা প্রলেতারীয় শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারব, তারা কৃষক থাকতে থাকতেই আমাদের পক্ষে টেনে আনতে পারব, ততই দ্রুত এবং সহজে সামাজিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে। কবে পুঁজিবাদী উৎপাদন সর্বত্র বিকশিত হয়ে তার চূড়ান্ত ফল প্রসব করবে, কবে শেষ কারিগর এবং শেষ ছোট কৃষকটি পর্যন্ত পুঁজিবাদী বৃহৎ উৎপাদনের শিকার হবে, সে পর্যন্ত এই রূপান্তর স্থগিত রেখে আমাদের কোনো লাভ নেই। কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে এই কাজে যে বৈষয়িক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, সেটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির নজরে অর্থের অপচয় মাত্র হলেও চমৎকার অর্থ বিনিয়োগ, কেননা এর ফলে সামাজিক পুনর্গঠনের সাধারণ খরচে হয়তো দশগুণ সাশ্রয় হবে। সুতরাং, এই অর্থে, কৃষকদের সঙ্গে অতি উদার ব্যবহার আমরা করতে পারি।

এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বা এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করার স্থান এটা নয়, এখানে আমরা কেবল সাধারণ নীতি নিয়েই আলোচনা করতে পারি।

অতএব, আমরা ছোট জোত চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে চাই, এরকম ধারণাটুকুও সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তাতে পার্টি বা ছোট কৃষকের যত ক্ষতি হবে তেমন আর কিছুতে নয়। এর অর্থ কৃষকের মুক্তির পথে সরাসরি বাধা সৃষ্টি করা এবং পার্টিকে সেমেটিক-বিরোধী দাঙ্গাবাজদের পর্যায়ে টেনে নামানো। বরঞ্চ, আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে ছোট কৃষকদের বার বার এই কথাই পরিষ্কার করে বলা উচিত যে, পুঁজিবাদ যতদিন কর্তৃত্ব করবে ততদিন তাদের কোনোই আশা নেই, তাদের ছোট ছোট জোতগুলিকে ছোট জোত হিসেবেই তাদের জন্য বাঁচিয়ে রাখা নিতান্তই অসম্ভব, রেলগাড়ি যেমন করে ঠেলাগাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়, তেমনি করেই পুঁজিবাদী বৃহৎ উৎপাদন-ব্যবস্থাও সুনিশ্চিতভাবে তাদের অক্ষম, অচল হয়ে যাওয়া ক্ষুদে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে দেবে। এ কাজ করলে আমরা অর্থনৈতিক বিকাশের অনিবার্য গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলব এবং সে বিকাশ ছোট কৃষকদের কাছে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হবে না।

প্রসঙ্গত, নান্ত কর্মসূচির রচয়িতারাও যে মূলত আমার সঙ্গে একমত, এ বিশ্বাস প্রকাশ না করে আমি এই বিষয়ে আলোচনা শেষ করতে পারি না। যেসব জমি আজ ছোট ছোট জোতে বিভক্ত সেটাও যে শেষ পর্যন্ত সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হতে বাধ্য, এটা না বোঝার মতো অন্তর্দৃষ্টিহীন তাঁরা নন। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেন যে, ছোট জোতের মালিকানার অবলুপ্তি সুনিশ্চিত। লাফার্গ রচিত জাতীয় পরিষদের যে রিপোর্ট নান্ত কংগ্রেসে উপস্থিত করা হয় তাতেও এই মতের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। বর্তমান বছরের ১৮ অক্টোবর সংখ্যায় বার্লিন *Sozialdemokrat* (১১৮) পত্রিকায় এই বিবরণী জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। নান্ত কর্মসূচির বিভিন্ন কথার পরস্পর-বিরোধিতা থেকেই বোঝা যায় যে, রচয়িতারা আসলে যা বলেছেন সেটা ঠিক তাঁরা বলতে চান নি। তাই তাঁদের আসল কথা যদি না বুঝে বক্তব্যগুলির অপব্যবহার করা হয়, যা সত্যিই ঘটেছে, তবে সেটা তাঁদের নিজেদেরই দোষ। সে যাই হোক, এই কর্মসূচিটিকে তাঁদের আরও ব্যাখ্যা

করতে হবে এবং আগামী ফরাসী কংগ্রেসে এর আগাগোড়া সংশোধন করতে হবে।

এবার অপেক্ষাকৃত বড় কৃষকদের প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রধানত উত্তরাধিকারের ভাগাভাগি, সেই সঙ্গে ঋণগ্রস্ততা এবং বাধ্য হয়ে জমি বিক্রির ফলে এসব ক্ষেত্রে ছোট জোতের কৃষক থেকে শুরু করে পৈতৃক সম্পত্তি অটুট রেখেছে এবং বাড়িয়েছে এমন বড় কৃষক ভূস্বামী পর্যন্ত একাধিক অন্তর্বর্তী পর্যায় দেখা যায়। যেসব জায়গায় মাঝারি কৃষক বাস করে ছোট কৃষকদের মধ্যে, সেখানে তার স্বার্থ ও চিন্তাধারা প্রতিবেশীদের থেকে খুব বেশি পৃথক হবে না; নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানে যে, তার মতো কত জন ইতিপূর্বে ছোট কৃষকের পর্যায়ে নেমে গেছে। কিন্তু যেখানে মাঝারি কৃষক ও বড় কৃষকেরই প্রাধান্য এবং খামারের কাজে সাধারণত পুরুষ ও স্ত্রী কৃষি-মজুরের প্রয়োজন হয়, সেসব জায়গায় অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম। বলা বাহুল্য, শ্রমিক পার্টিকে সর্বাগ্রে মজুরি-শ্রমিক, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী কৃষি-মজুর এবং দিন-মজুরদের হয়ে লড়াই করতে হবে। তাই শ্রমিকদের মজুরি-দাসত্ব বজায় থাকবে এই মর্মে কৃষকদের কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে কোনোক্রমেই চলতে পারে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ বড় ও মাঝারি কৃষকেরা যতদিন বড় ও মাঝারি কৃষক হিসেবেই থাকছে, ততদিন মজুরি-শ্রমিক ছাড়া তারা চালাতে পারে না। সুতরাং, ছোট জোতের কৃষককে চিরদিনই ছোট জোতের কৃষক হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যদি আমাদের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা হয়, তাহলে বড় ও মাঝারি কৃষকদের সেরকম কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল।

এক্ষেত্রেও শহরের হস্তশিল্পীদের মধ্যে আমরা অনুরূপ পরিস্থিতি দেখতে পাই। এরা কৃষকদের চেয়েও দুস্থ সেকথা ঠিক, কিন্তু এদের মধ্যেও এখনও এমন কিছু লোক আছে যারা তাদের শিক্ষানবিস ছাড়াও জোগাড়ে নিয়োগ করে, কিংবা তাদের শিক্ষানবিসরাই জোগাড়ের কাজ করে। এই সব মালিক-কারিগরদের মধ্যে যারা মালিক-কারিগর রূপেই নিজেদের অস্তিত্ব চিরদিন বজায় রাখতে চায় তারা সেমেটিক-বিরোধীদের সঙ্গেই গিয়ে মিলুক, একদিন তারা বুঝবে যে, সেখানেও তাদের কোনো সুরাহা

হবে না। বাকি যারা বুঝেছে যে, তাদের উৎপাদন-পদ্ধতির ধ্বংস অনিবার্য তারা আমাদের পক্ষে চলে আসছে, এবং শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে সমস্ত শ্রমিকদের ভাগ্যে যা আছে তারই অংশীদার হতে তারা রাজী। বড় ও মাঝারি কৃষকদের পক্ষেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তাদের চেয়ে তাদের স্ত্রী-পুরুষ কৃষি-মজুর ও দিন-মজুরদের ব্যাপারেই আমাদের ঔৎসুক্য অনেক বেশি সে কথা না বললেই চলে। এই কৃষকেরা যদি চায় যে, তাদের উদ্যোগগুলির অব্যাহত অস্তিত্ব নিশ্চিত হোক, তবে সে প্রতিশ্রুতি দেবার কোনো উপায় আমাদের নেই। সেক্ষেত্রে তাদের সেমেটিক-বিরোধী, কৃষক সংঘ বা ঐ ধরনের যেসব দল সব কিছুরই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং কোনো প্রতিশ্রুতিই না-রেখে আনন্দ পায়, তাদের মধ্যেই স্থান করে নিতে হবে। অর্থনীতির দিক থেকে আমরা স্থির জানি যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বিদেশ থেকে সস্তায় আমদানী করা খাদ্যশস্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বড় ও মাঝারি কৃষককেও ঠিক একইভাবে অনিবার্যভাবেই হার স্বীকার করতেই হবে। এই সব কৃষকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঋণভার এবং সর্বক্ষেত্রে তাদের কৃষির প্রকট অবনতির লক্ষণ থেকেই একথা প্রমাণ হচ্ছে। এ অবনতির বিরুদ্ধে এক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন জোত একত্র করে সমবায়-সমিতি গড়ার সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই আমরা করতে পারি না; এই সব সমবায়-সমিতিতে মজুরি-শ্রমের শোষণ ক্রমেই লোপ পাবে, বৃহৎ জাতীয় উৎপাদন-সমবায়ের শাখায় এগুলির ক্রমিক রূপান্তর ঘটানো যাবে, যেখানে প্রতিটি শাখা সমান দায়িত্ব ও অধিকার ভোগ করবে। এই কৃষকেরা যদি তাদের বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতির ধ্বংসের অনিবার্যতার কথা হৃদয়ঙ্গম করে ও তার থেকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত টানে, তাহলে তারা আমাদের পক্ষে চলে আসবে এবং তখন সেই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতিতে তাদের উৎক্রমণ সুগম করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করা হবে আমাদের কর্তব্য। অন্যথায়, তাদের ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে আমরা মনোনিবেশ করব তাদের মজুরি-শ্রমিকদের দিকে, তাদের মধ্যে আমরা সাড়া নিশ্চয়ই পাব। খুব সম্ভবত, এক্ষেত্রেও আমরা বলপূর্বক উৎখাত এড়াতে পারব, কিন্তু এই ভরসা রাখতে পারব যে, ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক বিকাশ এই সব নিরেট মাথাতেও সুবুদ্ধি জাগাবে।

একমাত্র বড় বড় ভূসম্পত্তির বেলাতেই সমস্যাটা অত্যন্ত সরল। এখানে নগ্ন পুঁজিবাদী উৎপাদন নিয়েই আমাদের কারবার, সুতরাং, কোনো কুণ্ঠায় সংযত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে আমাদের সামনে রয়েছে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত এবং আমাদের কর্তব্যও সুস্পষ্ট। আমাদের পার্টি রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক শিল্প-মালিকদেরই মতো বড় বড় ভূসম্পত্তির মালিকদেরও উৎখাত করতে হবে। এই উৎখাত করার দরুন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না তা অনেক পরিমাণে আমাদের উপর নির্ভর করবে না, কোন অবস্থায় আমরা ক্ষমতা পাই এবং বিশেষ করে এই ভদ্রলোকেরা, বড় বড় ভূস্বামীরা কী ব্যবহার করে তারই উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করবে। কোনো ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া চলবে না, একথা আমরা মোটেই ভাবি না। মার্কস আমায় বলেছিলেন (এবং কত বার!) যে, তাঁর মতে এদের গোটা দলটাকে কিনে ফেলতে পারলেই আমরা সবচেয়ে সস্তায় পার পাব। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় তা নয়। এইভাবে যেসব বৃহৎ মহাল সমাজের হাতে ফিরে আসবে সেগুলি সেখানকার কর্মরত গ্রামীণ মজুরদের হাতে তুলে দিতে হবে এবং সমবায়-সমিতিতে এদের সংগঠিত করতে হবে। ঐসব জমি তাদের দেওয়া হবে সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীনে তাদের ব্যবহার ও উপযোগের জন্য। সে জমিতে তাদের ইজারার শর্ত কী ধরনের হবে সে সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যায় না। আর যাই হোক, পুঁজিবাদী উদ্যোগকে সামাজিক উদ্যোগে রূপান্তরিত করার প্রস্তুতি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হয়ে আছে এবং ঠিক মিঃ ক্রুপ বা মিঃ ফন শ্টুমের কারখানার মতোই রাতারাতি সে রূপান্তর কার্যকর করা যাবে। এবং শেষ যে ছোট জোতের কৃষকদের তখনও আপত্তি থাকবে, সে এবং খুব সম্ভব কিছু বড় কৃষকও এই সব কৃষি সমবায়ের উদাহরণ দেখে সমবায়-পন্থায় বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা বুঝতে পারবে।

এইভাবে শিল্প-শ্রমিকদেরই মতো গ্রামীণ প্রলেতারীয়দের সামনেও আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিতে পারি এবং তখন এল্‌ব্‌ নদীর পূর্বতীরের প্রাশিয়ার গ্রামীণ শ্রমিককে পক্ষে আনা কেবলমাত্র সময়ের এবং তাও অল্প সময়ের ব্যাপার হতে বাধ্য। কিন্তু এল্‌ব্‌-এর পূর্বাঞ্চলের গ্রামীণ শ্রমিকদের একবার পেলে সারা জার্মানি জুড়ে নতুন

হাওয়া বইতে শুরু করবে। প্রুশীয় য়ুঙ্কারদের প্রাধান্যের এবং সেই হেতু জার্মানিতে প্রাশিয়ার বিশিষ্ট প্রভুত্বের ভিত্তি হচ্ছে এল্‌ব্‌-এর পূর্বাঞ্চলের গ্রামীণ শ্রমিকদের কার্যত অর্ধ-ভূমিদাসত্ব। এল্‌ব্‌-এর পূর্বতীরের এই য়ুঙ্কাররাই আমলাতন্ত্র ও সামরিক অফিসার মণ্ডলীর বিশেষ রূপের প্রুশীয় চরিত্র গড়ে তুলেছে এবং বাঁচিয়ে রাখছে — ঋণের দায়ে, দারিদ্র্যের চাপে এই য়ুঙ্কাররা ক্রমেই আরও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং রাষ্ট্রের ও অপরের ঘাড় ভেঙে পরগাছাসুলভ জীবন কাটাচ্ছে, এবং সেই কারণেই যে প্রাধান্য ভোগ করছে তাকে আরও আঁকড়ে ধরছে। এদেরই ঔদ্ধত্য, সংকীর্ণচেতনা এবং অহঙ্কার প্রুশীয় জাতির জার্মান রাইখকে (১১৯), — বর্তমানে জাতীয় ঐক্য সাধনের একমাত্র রূপ হিসেবে এই রাইখকে অনিবার্য বলে মেনে নিয়েও দেশের অভ্যন্তরে এতটা ঘৃণার বস্তু এবং এত বিস্ময়কর জয়লাভ সত্ত্বেও বিদেশে এত কম সম্মানভাজন করে তুলেছে। সাতটি পুরাতন প্রুশীয় প্রদেশের অটুট এলাকায়, অর্থাৎ সমস্ত রাইখের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যাপী এই এলাকায় ভূসম্পত্তি এদেরই হাতে এবং এখানে ভূসম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আসে সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষমতা — এই হচ্ছে য়ুঙ্কারদের ক্ষমতার ভিত্তি। এবং কেবল ভূসম্পত্তিই নয়, এদের বীট-চিনি শোধনাগার এবং মদ তৈরির কারখানা মারফৎ এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পও এদেরই হাতে। বাকি জার্মানির বড় বড় ভূস্বামী বা শিল্পপতিরা কেউই এমন সুবিধাজনক অবস্থায় নেই, তাদের কারোরই এমন সংহত রাজত্ব নেই। তারা উভয়েই এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে, তাছাড়া পরস্পরের সঙ্গে এবং চারিদিকের অন্যান্য সামাজিক উপাদানের সঙ্গে তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য প্রতিযোগিতা করে চলছে। কিন্তু প্রুশীয় য়ুঙ্কারদের এই প্রাধান্যের অর্থনৈতিক ভিত ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে। সমস্তরকম রাষ্ট্রীয় সাহায্য (এবং দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের সময় থেকে প্রতিটি য়ুঙ্কার বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ থাকেই) সত্ত্বেও এখানেও ঋণভার এবং দারিদ্র্য অপ্রতিরোধ্যভাবে বেড়ে চলেছে। আইন ও দেশাচারের দ্বারা পবিত্রকৃত এক কার্যত আধা-ভূমিদাস-প্রথা এবং তারই ফলে গ্রামীণ শ্রমিককে নিরঙ্কুশ শোষণের সম্ভাবনা — কেবল এরই জোরে নিমজ্জমান য়ুঙ্কাররা আজও কোনোরকমে ভেসে আছে। এই শ্রমিকদের মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক

মতবাদের বীজ বপন করুন, উদ্দীপিত করে নিজেদের অধিকারের জন্য সংগ্রামে সংহতি দিন, অমনি যুঙ্কারদের গরিমা শেষ হয়ে যাবে। সারা ইউরোপের ক্ষেত্রে রুশ জারতন্ত্র যার প্রতীক, জার্মানির ক্ষেত্রে সেই একই বর্বরতা ও লুণ্ঠনপরতার প্রতীকরূপ মহা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিটা বুদ্বুদের মতো ফেটে যাবে। প্রুশীয় সেনাবাহিনীর 'বাছাই দলগুলি' সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক হয়ে উঠবে, তার ফলে শক্তি-বিন্যাসে এমন একটা পরিবর্তন ঘটবে যার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকবে গোটা একটা ওলটপালটের সম্ভাবনা। এই কারণেই পশ্চিম জার্মানির ছোট কৃষক তথা দক্ষিণ জার্মানির মাঝারি কৃষকদের চেয়ে এল্ব্-এর পূর্বতীরের গ্রামীণ প্রলেতারীয়কে পক্ষে টানতে পারার গুরুত্ব অনেক বেশি। আমাদের চূড়ান্ত লড়াই এইখানে, এই এল্ব্-এর পূর্বতীরের প্রাশিয়াতেই লড়তে হবে এবং ঠিক সেই কারণেই সরকার ও যুঙ্কারতন্ত্র উভয়েই এই অঞ্চলে আমাদের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এবং যে ভয় দেখানো হচ্ছে সে অনুযায়ী পার্টির বিস্তার বন্ধ করার জন্য নতুন দমনমূলক ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করা হয়, তাহলে তার প্রধান লক্ষ্য হবে এল্ব্-এর পূর্বতীরের গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতকে আমাদের প্রচার থেকে রক্ষা করা। আমাদের অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। এসব সত্ত্বেও তাদের আমরা পক্ষে টেনে আনবই।

১৮৯৪-এর ১৫ ও ২২
নভেম্বরের মধ্যে লিখিত

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

Die Neue Zeit পত্রিকার
১৮৯৪-১৮৯৫-এর ১০ম সংখ্যায়
প্রকাশিত

স্বাক্ষর: ফ্রিডরিখ **এঙ্গেলস**

পত্রাবলী

বার্লিনে কনরাড শ্মিড্ট সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ৫ অগস্ট, ১৮৯০

...মরিৎস ভির্থ নামক সেই অশুভ জীবটির লেখা পাউল বার্টের বইয়ের (১২০) একটি সমালোচনা ভিয়েনার *Deutsche Worte* (১২১) পত্রিকায় পড়লাম এবং এই সমালোচনা পড়ে বইটি সম্পর্কেও আমার মনে একটা খারাপ ধারণা হয়ে গেল। বইখানি আমায় দেখতে হবে, কিন্তু ক্ষুদে মরিৎস একথা যদি বার্ট থেকে সঠিকভাবেই উদ্ধৃত করে থাকেন যে, মার্কসের রচনাবলীতে অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থার উপর দর্শন ইত্যাদির নির্ভরশীলতার একমাত্র দৃষ্টান্ত তিনি যা পেয়েছেন সেটা এই যে, দেকার্ত প্রাণীদের যন্ত্র বলে ঘোষণা করেছেন, তাহলে এই ধরনের কথা যে লোক লিখতে পারে তার জন্য আমি দুঃখিত। এই ব্যক্তি যদি এখনও দেখতে পেয়ে না থাকেন যে, অস্তিত্বের বৈষয়িক শর্ত primum agens* হলেও তাতে তার উপর ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রগুলির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে আটকায় না, যদিও সে প্রতিক্রিয়ার ফলটা গৌণ, তাহলে তিনি যা নিয়ে লিখছেন সেই বিষয়টিই কিছু বুঝতে পারেন নি। অবশ্য, আমি পূর্বেই বলেছি এটা হল আমার পরের মুখে ঝাল খাওয়া, এবং ক্ষুদে মরিৎস এক বিপজ্জনক বন্ধু। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার এ রকম বন্ধু আজকাল অনেক, যাদের কাছে এটা ইতিহাস না পড়ার একটা অজুহাত সৃষ্টি করে দিয়েছে। ঠিক যেমন অষ্টম দশকের শেষদিকের ফরাসী 'মার্কসবাদীদের' সম্পর্কে মার্কস বলতেন, 'আমি যতটুকু জানি তা হল এই যে, আমি মার্কসবাদী নই।'

---

* আদিকারণ। — সম্পাঃ

ভবিষ্যৎ সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন কী রূপ হবে, সম্পন্ন কাজের পরিমাণ অনুযায়ী হবে, না অন্য কোনরূপ হবে, এ নিয়ে *Volks-Tribüne* (১২২) পত্রিকায় একটি আলোচনা হয়েছে। ন্যায় সম্পর্কিত কতকগুলি ভাবাদর্শগত বুলির পাল্টা হিসাবে অত্যন্ত 'বস্তুবাদীভাবেই' প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একথা কারও মনে হয় নি যে, শেষ পর্যন্ত তো বণ্টনের পদ্ধতি মূলত নির্ভর করে বণ্টন করার মতো জিনিস **কী পরিমাণ** আছে তার উপর এবং উৎপাদনের ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিমাণেরও অবশ্যই পরিবর্তন হয়, যার ফলে বণ্টনের পদ্ধতিরও পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু যারা এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিল তাদের কারও মনে হয় নি যে, 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ' অবিরাম পরিবর্তনশীল ও অগ্রগতিশীল, মনে হয়েছে যেন তা চিরকালের মতো স্থির নির্দিষ্ট একটি ব্যাপার এবং সেই জন্যই সেখানে চিরদিনের মতো স্থির নির্দিষ্ট একটি বণ্টন-ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্য, যেটুকু যুক্তিযুক্তভাবে করা যায় তা হচ্ছে এই যে, ১) **শুরুতে** বণ্টনের পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণের চেষ্টা এবং ২) পরবর্তী বিকাশ কীভাবে চলবে তার **সাধারণ ঝোঁকটি** নির্ধারণের চেষ্টা। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি কথাও সারা বিতর্কের মধ্যে চোখে পড়ল না।

সাধারণভাবে 'বস্তুবাদী' কথাটি জার্মানির বহু তরুণ লেখকের কাছে এমন একটা বুলিতে পর্যবসিত হয়েছে যে, আর কিছু অধ্যয়ন না করেই যা খুশী তাতেই তাঁরা এই লেবেল এঁটে দিচ্ছেন, অর্থাৎ এই লেবেল এঁটে দিয়ে ভাবছেন, সমস্যা মিটে গেল। কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা সেটা হল সর্বোপরি অধ্যয়নের দিকদর্শন মাত্র, হেগেলপন্থা ধরনে ছক নির্মাণের হাতল নয়। সমস্ত ইতিহাসকে নতুনভাবে অধ্যয়ন করতে হবে, সমাজের বিভিন্ন গঠনরূপ থেকে তাদের অনুযায়ী রাজনৈতিক, দেওয়ানি আইনগত, নন্দনতাত্ত্বিক, দার্শনিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ধ্যানধারণা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার আগে ঐ গঠনরূপগুলির অস্তিত্বের অবস্থা বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে এখানে বিশেষ কিছু করা হয় নি, কারণ খুব কম লোকই গুরুত্বসহকারে এ কাজে হাত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য আমাদের দরকার, ক্ষেত্র বিশাল, এবং যদি কেউ গুরুত্বসহকারে কাজ করে তাহলে সে প্রচুর সাফল্য লাভ করতে পারে

ও খ্যাতিমান হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা না করে বহু তরুণ জার্মান শুধু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বুলিটি ব্যবহার করছেন (**সব কিছুই** তো বুলিতে পরিণত করা যায়) এই জন্য, যাতে ইতিহাস সম্পর্কে নিজেদের যে আপেক্ষিকভাবে সামান্য জ্ঞান আছে তা দিয়ে (অর্থনৈতিক ইতিহাসের তো এখনও শৈশবাবস্থা!) যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি একটি ফিটফাট ব্যবস্থা তৈরি করা যায়, এবং তারপর নিজেদের তারা বিরাট একটা কিছু বলে মনে করে। তারপর বার্টের মতো কেউ এসে মূল বস্তুটিকেই আক্রমণ করে বসবে, যা তার মহলে মাত্র একটা বুলিতে পর্যবসিত করা হয়েছে।

এ সব কিছুই অবশ্য ঠিক হয়ে যাবে। জার্মানিতে এখন অনেক কিছু সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি আমাদের আছে। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন আমাদের পক্ষে অন্যতম একটা মস্ত কাজ করে দিয়েছে এই যে, সমাজতন্ত্রের ছোপ লাগা জার্মান ছাত্রের অনধিকারচর্চার হাত থেকে তা আমাদের মুক্তি দিয়েছিল। জার্মান ছাত্রটি আবার নিজেকে বড় গলায় জাহির করছেন, কিন্তু তাঁকে হজম করার মতো শক্তি আমরা এখন রাখি। আপনি, যিনি সত্যিই কিছু করেছেন, নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, পার্টির মধ্যে এসেছেন এমন তরুণ লেখকদের ক'জনই বা অর্থশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ইতিহাস, সমাজের গঠনরূপের ইতিহাস অধ্যয়ন করার কষ্ট করেন! ক'জন বা মাউরারের নামটুকু ছাড়া আর কিছু জানেন? এখানে সাংবাদিকের ঔদ্ধত্যেই সব কিছু জয় করা চাই, এবং ফলও তেমনই ফলছে। প্রায়ই মনে হয়, এই ভদ্রলোকদের ধারণা, শ্রমিকদের বেলায় সবকিছুই চলে। এই ভদ্রলোকেরা যদি জানতেন, কীভাবে মার্কস তাঁর সবচেয়ে ভালো জিনিসও শ্রমিকদের পক্ষে যথেষ্ট ভালো বলে মনে করতেন না এবং সবচেয়ে ভালো ছাড়া অন্য কিছু শ্রমিকদের দেওয়াকে কীভাবে মার্কস অপরাধ বলে মনে করতেন!..

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

ব্রেস্‌লাউ-তে অটো ফন বোয়েনিগ্‌ক্‌ সমীপে এঙ্গেলস

ফোকস্টোন, ডোভারের কাছে
২১ অগস্ট, ১৮৯০

...আপনার জিজ্ঞাসার জবাব আমি দিতে পারি শুধু সংক্ষেপে ও সাধারণভাবেই, কারণ প্রথম প্রশ্নটির ব্যাপারে আমাকে তা না হলে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখতে হবে।

১। আমার মতে, তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ' পরিবর্তনাতীত কিছু নয়। অন্য সমস্ত সামাজিক গঠনবিন্যাসের মতো, তাকেও কল্পনা করা উচিত নিরন্তর প্রবাহ ও পরিবর্তনের এক অবস্থার মধ্যে। বর্তমান ব্যবস্থা থেকে তার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটা স্বভাবতই রয়েছে উৎপাদনের সমস্ত উপায়ের উপরে জাতির সাধারণ মালিকানার ভিত্তিতে সংগঠিত উৎপাদনের মধ্যে। এই পুনর্বিন্যাস আগামীকাল শুরু করা, কিন্তু তা ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন করা, আমার রীতিমতো সম্ভব বলে মনে হয়। আমাদের শ্রমিকরা যে তা করতে সক্ষম তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের অজস্র উৎপাদক ও উপভোক্তা সমবায় থেকে, পুলিস যখন সেগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করে না-দেয় তখন যেগুলি বুর্জোয়া স্টক কোম্পানিগুলির মতোই সমান ভালো এবং তাদের চাইতে অনেক বেশি সততার সঙ্গে পরিচালিত। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে আমাদের শ্রমিকরা তাদের বিজয়দীপ্ত সংগ্রামে যে রাজনৈতিক পরিপক্কতার চমকপ্রদ সাক্ষ্য উপস্থিত করেছে তার পরে আপনি জার্মানির জনসাধারণের অজ্ঞতার কথা কী করে বলতে পারেন, আমি তা বুঝতে পারছি না। আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের পিঠ-চাপড়ানি আর হঠকারী বক্তৃতাবাজি আরও বড় বাধা বলে আমার মনে হয়। আমাদের এখনও কৃৎকুশলী, কৃষি-অর্থনীতিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিশারদ, স্থপতি প্রভৃতিদের দরকার আছে একথা সত্যি, কিন্তু সবচেয়ে খারাপ অবস্থাও যদি হয় তাহলে আমরা সব সময়েই তাদের কিনতে পারি ঠিক যেমন পুঁজিপতিরা তাদের কেনে, আর তাদের মধ্যেকার কিছু বিশ্বাসঘাতকের ক্ষেত্রে যদি কঠোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয় — কারণ কিছু বিশ্বাসঘাতক নিশ্চয়ই থাকবে — তাহলে আমাদের সঙ্গে যথার্থ আচরণ করাটাকে তারা নিজেদের পক্ষেই

সুবিধাজনক বলে মনে করবে। কিন্তু এই সমস্ত বিশেষজ্ঞ ছাড়া — যাদের মধ্যে আমি স্কুল-শিক্ষকদেরও ধরছি — অন্য 'বুদ্ধিজীবীদের' বাদ দিয়েই আমরা খুবই ভালোভাবে চালাতে পারি। যেমন, পার্টির মধ্যে পণ্ডিতবর্গ ও ছাত্রদের বর্তমান সমাগম রীতিমতো ক্ষতিকর হতে পারে, যদি না এই ভদ্রলোকদের উপযুক্তভাবে সংযত করে রাখা হয়।

এল্‌ব্‌-এর পূর্বতীরের য়ুঙ্কার ভূসম্পত্তিগুলিকে উপযুক্ত কৃৎকৌশলগত ব্যবস্থাপনাধীনে সহজেই বর্তমানের দিন-মজুর ও খেতমজুরদের কাছে লীজ দিয়ে দেওয়া যায়, তারা এই সব ভূসম্পত্তিতে কাজ করবে যুক্তভাবে। যদি কোনো গোলমাল ঘটে, তাহলে দায়ী হবে একমাত্র য়ুঙ্কাররাই, যারা বিদ্যমান সমস্ত স্কুল-সংক্রান্ত আইনকানুন লঙ্ঘন করে মানুষকে পশুর মতো করে তুলেছে।

সবচেয়ে বড় বাধা হল ছোট চাষী আর নাছোড়বান্দা অতি-চালাক বুদ্ধিজীবীরা, যারা সব কিছু যত কম বোঝে তত বেশি জানে বলে মনে করে।

জনসাধারণের মধ্যে আমাদের যথেষ্ট সংখ্যক অনুগামী হয়ে গেলে বড় বড় শিল্প ও বৃহদায়তন ভূসম্পত্তির খামারগুলি দ্রুত সামাজীকীকরণ করা যায়, অবশ্য যদি আমাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে। বাকিটা, আগে হোক বা পরে হোক, অচিরেই হবে। আর বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় আমরা সব কিছু আমাদের মতো করে করতে পারব।

একই রকম অন্তর্দৃষ্টি না-থাকার কথা আপনি বলেছেন। সেটা আছে — কিন্তু তা বুদ্ধিজীবীদের তরফে, যারা এসেছে অভিজাততন্ত্র ও বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে এবং যারা ঘুণাক্ষরেও বোঝে না শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের এখনও কত কিছু শেখার আছে...

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

কনিগ্‌স্‌বার্গে ইয়োসেফ ব্লক সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২১[-২২] সেপ্টেম্বর, ১৮৯০

...ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে **শেষ পর্যন্ত** নির্ধারক বস্তু। এর বেশি কিছু মার্কস বা আমি কখনও বলি নি। অতএব, কেউ যদি তাকে বিকৃত করে এই দাঁড় করায় যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারই হচ্ছে **একমাত্র** নির্ধারক বস্তু, তাহলে সে প্রতিপাদ্যটিকে একটি অর্থহীন, অমূর্ত, নির্বোধ উক্তিতে পরিণত করে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হল ভিত্তি, কিন্তু উপরিকাঠামোর বিভিন্ন বস্তু যেমন, শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপগুলি এবং তার ফলাফল: সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রামের পর বিজয়ী শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইত্যাদি, বিচার-ব্যবস্থা, এমন কি যোগদানকারীদের মস্তিষ্কে এই সমস্ত বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন, রাজনৈতিক আইনগত, দার্শনিক তত্ত্বাবলী, ধর্মীয় মতামত এবং ক্রমে সেগুলির আপ্তবাক্যে পরিণতি, এসবও ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলির গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তাদের **রূপ** নির্ধারণে প্রধান হয়ে ওঠে। এদের সকলের একটি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেখানে অসংখ্য আকস্মিকতার মধ্যে (অর্থাৎ এমন সব বস্তু ও ঘটনার মধ্যে, যাদের অন্তঃসম্পর্ক এত ক্ষীণ কিম্বা এত প্রমাণাসাধ্য যে তা অবিদ্যমান, অথবা উপেক্ষণীয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে) অর্থনৈতিক আন্দোলন শেষ পর্যন্ত আবশ্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যথায় পছন্দ মতো ইতিহাসের যেকোনো আমল সম্পর্কে তত্ত্ব প্রয়োগ করা প্রথম ডিগ্রীর সরল সমীকরণের সমাধানের চেয়েও সহজ হত।

আমরা নিজেরাই আমাদের ইতিহাস সৃষ্টি করি, কিন্তু সৃষ্টি করি সর্বাগ্রে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কতকগুলি পূর্বস্থিতি ও অবস্থার মধ্যে। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক পূর্বস্থিতি ও অবস্থাই শেষ পর্যন্ত নির্ধারক হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি, এমন কি মানবমনকে আচ্ছন্ন করে থাকে যে ঐতিহ্য, তাও একটা ভূমিকা গ্রহণ করে, যদিও সে ভূমিকা নির্ধারক নয়। প্রুশীয় রাষ্ট্রও ঐতিহাসিক ও শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণ থেকেই উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু খামোকা পাণ্ডিত্য জাহির করার ইচ্ছা না

থাকলে একথা কিছুতেই বলা যায় না যে, উত্তর জার্মানির বহু ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে ব্রান্ডেনবুর্গই যে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থনীতিগত, ভাষাগত এবং, এমন কি রিফর্মেশনের (১২৩) পর, ধর্মগত পার্থক্যের প্রতীকরূপে একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তা অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দ্বারাই বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, এবং তার পেছনে আর কোনো উপাদান ছিল না (যথা, সর্বোপরি, প্রাশিয়া দখলে থাকায় পোল্যান্ডের সঙ্গে ব্রান্ডেনবুর্গের জড়িয়ে পড়া এবং কাজে কাজেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, যা অস্ট্রীয় রাজবংশগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায়ও চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল)। জার্মানির অতীতের ও বর্তমানের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব, অথবা সেই উত্তর জার্মানির ব্যঞ্জনধ্বনির অভিশ্রুতির উদ্ভব যা সুদেতিক পর্বতমালা থেকে তাউনাস পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড় দ্বারা গঠিত ভৌগোলিক বিভাগপ্রাচীরকে আরও বিস্তৃত করে তুলে সারা জার্মানিব্যাপী একটি রীতিমতো ফাটল সৃষ্টি করেছিল, নিজেকে হাস্যকর করে না তুলে অর্থনীতি দ্বারা এসবের ব্যাখ্যা করতে যাওয়া খুবই মুশকিল।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাস এমনভাবেই সৃষ্টি হয় যাতে চূড়ান্ত ফলাফল সর্বদা বহু ব্যক্তিগত ইচ্ছার সংঘাত থেকে উদ্ভূত হয় এবং এই ইচ্ছার প্রত্যেকটি আবার জীবনের বেশ কতকগুলি বিশেষ অবস্থার দ্বারা গঠিত। এইভাবে অসংখ্য পরস্পর ছেদনকারী শক্তি রয়েছে, রয়েছে শক্তির অসংখ্য সামন্তরিক ক্ষেত্রের ধারা এবং এদেরই মধ্যে থেকেই উদ্ভূত হয় একটি সাধারণ ফল — ঐতিহাসিক ঘটনা। একে আবার এমন একক একটি শক্তির সঞ্জাত ফল বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে, যা সামগ্রিক হিসাবে **অচেতন** ও ইচ্ছাশক্তিহীনভাবে কাজ করে। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি যা চায় অপর প্রত্যেক ব্যক্তি তাতে বাধা দেয় এবং ফলাফল দাঁড়ায় এমন কিছু যা কেউই চায় নি। এইভাবে অতীত ইতিহাস একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ারূপেই চলে এবং মূলত একই গতির নিয়মাবলীর অধীন। যদিও ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক গঠন এবং বাইরের, শেষ পর্যন্ত, অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা (নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা বা সাধারণভাবে সমাজের অবস্থা) প্রণোদিত হয় এবং নিজ নিজ ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারে না বরং

একটি যৌথ গড়ে একটি সাধারণ লব্ধিতে পরিণত হয়, তাই বলে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই করা চলে না যে, তাদের মূল্য শূন্য। বরঞ্চ লব্ধ ফলে প্রত্যেকটি ইচ্ছারই অবদান রয়েছে এবং সেই পরিমাণে সেগুলি তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এই তত্ত্বটিকে অপরের মুখ থেকে না শুনে মূল উৎস থেকে অনুশীলন করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। সত্যই সেটা অনেক বেশি সোজা। মার্কস এমন কিছুই লেখেন নি, যার মধ্যে এ তত্ত্বের ভূমিকা নেই। কিন্তু, বিশেষ করে **'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'*** এই তত্ত্বপ্রয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'পুঁজি' গ্রন্থের মধ্যেও এর বহু নিদর্শন রয়েছে। আমি আপনাকে আমার এই লেখাগুলিও পড়তে বলব: 'শ্রী ওগেন ড্যুরিং-এর বিজ্ঞানে বিপ্লব' এবং 'লুড্‌ভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান'**। সেখানে আমি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিশদতম বিবরণ যতটা বর্তমান বলে আমি জানি তা উল্লেখ করেছি।

তরুণেরা যে অনেক সময় অর্থনৈতিক দিকের উপর যতখানি উচিত তার চেয়ে বেশি জোর দিয়ে থাকেন, তজ্জন্য মার্ক্স ও আমি, আমরা নিজেরাই কিছুটা দায়ী। আমাদের প্রতিপক্ষীয়রা অস্বীকার করতেন বলেই তাঁদের বিপরীতে অর্থমূল নীতিটির উপর আমাদের জোর দিতে হয়েছিল। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দিকগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার মতো সময়, স্থান বা সুযোগ আমরা পাই নি। কিন্তু ইতিহাসের কোনো যুগকে উপস্থিত করার প্রশ্ন যখন এসেছে, অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রশ্ন যখন এসেছে, তখন অন্য কথা, এবং কোনো ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে নি। দুর্ভাগ্যক্রমে, অবশ্য প্রায়ই দেখা যায় যে, লোকে ভাবে, তারা একটি নতুন তত্ত্ব বুঝে ফেলেছে এবং ঐ তত্ত্বের প্রধান নীতিগুলি আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই, এমন কি অনেকসময় ভুলভাবে আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই, বিনাদ্বিধাসংকোচে তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করতে তারা সক্ষম। হালে যাঁরা

---

* এই সংস্করণের ৪র্থ খণ্ডের ১২-১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ১০ম খণ্ডের ১৩৬-১৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

'মার্কসবাদী' হয়েছেন তাঁদের অনেককেই আমি এই সমালোচনা থেকে রেহাই দিতে পারি না, কারণ এর দৌলতেও অতি আশ্চর্য রকমের আবর্জনা সৃষ্টি হয়েছে...

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

বার্লিনে কনরাড শ্মিড্ট সমীপে এঙ্গেলস

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর, ১৮৯০

প্রিয় শ্মিড্ট,

অবসর পাওয়ামাত্রই আপনার চিঠির জবাব দিতে বসেছি। আমার মনে হয় *Züricher Post*-এ (১২৪) চাকরি নেওয়াটাই আপনার পক্ষে খুব ভালো হবে। আপনি সেখানে অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখতে পারবেন, বিশেষত যদি একথা মনে রাখেন যে, জুরিখ একটি তৃতীয় শ্রেণীর টাকার বাজার ও ফাটকাবাজার, অতএব এখানে যেসব ধারণা জন্মায় সেগুলি আবার দু দফা বা তিন দফা প্রতিফলনে ক্ষীণ কিম্বা ইচ্ছা করে বিকৃত। কিন্তু ব্যাপারটা কীভাবে চলে সে সম্পর্কে আপনি ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করবেন এবং লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ইত্যাদির শেয়ার-বাজারের আনকোরা রিপোর্ট লক্ষ করে যেতে বাধ্য হবেন। এতে করে টাকা ও শেয়ার-বাজার রূপে প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাজার আপনার কাছে প্রকট হবে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিফলন ঠিক মানুষের চোখের প্রতিফলনের মতো — কনডেন্সিং-লেন্সের মধ্য দিয়ে যায় বলে প্রতিফলনগুলিকে সেখানে ঠিক উল্টো, অর্থাৎ মাথার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখা যায়। অভাব কেবলমাত্র স্নায়ুযন্ত্রটিরই, যা প্রতিফলনটিকে আবার সোজা করে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দেবে। শেয়ার-বাজারের মানুষ শিল্পের গতি ও বিশ্ববাজারকে শুধুমাত্র টাকার বাজার ও শেয়ার-বাজারের উল্টো প্রতিফলন রূপেই দেখতে পায়, তাই কার্য তার

কাছে কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চম দশকেই ম্যাঞ্চেস্টারে আমি এ ব্যাপার লক্ষ করেছিলাম: শিল্পের গতি এবং তার পর্যায়ক্রমিক সর্বোচ্চতা ও সর্বনিম্নতা বোঝবার পক্ষে লন্ডনের শেয়ার-বাজারের রিপোর্টগ্নলি কোনো কাজেই আসত না, কারণ এই ভদ্রলোকেরা সব কিছ্নই টাকার বাজারের সংকট দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করতেন, অথচ সেগ্নলি সাধারণত হল তার লক্ষণ মাত্র। তখন লক্ষ্য ছিল শিল্প-সংকটগ্নলির ম্নল কারণ যে সাময়িক অতিউৎপাদন নয়, এইটেই প্রমাণ করা। ফলে একটা পক্ষপাতম্নলক ঝোঁকও দেখা দিত, যা থেকে আসত বিকৃতিসাধনের প্ররোচনা। এই লক্ষ্য এখন আর নেই, অন্তত আমাদের কাছে চিরদিনের মতো বিল্নপ্ত হয়ে গেছে। তার উপর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, টাকার বাজারেরও নিজস্ব সংকট থাকতে পারে, যাতে শিল্পের প্রত্যক্ষ বিশ্ঙৃখলার ভূমিকা গৌণ মাত্র অথবা তার কোনো ভূমিকাই নেই। এখানে, বিশেষ করে গত বিশ বছরের ইতিহাসে এখনও সন্ধান ও পরীক্ষা করার মতো অনেক কিছ্ন আছে।

শ্রমবিভাগ যেখানে সামাজিক ভিত্তিতে আছে সেখানে বিভিন্ন শ্রমপ্রক্রিয়া পরস্পরের থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত উৎপাদনই নির্ধারক বস্তু। কিন্তু যে ম্নহ্নর্তে খাস উৎপাদন থেকে উৎপন্নের বাণিজ্যটা স্বতন্ত্র হয়ে যায়, সেই ম্নহ্নর্ত থেকে সে তার নিজস্ব গতি অন্নসরণ করে চলে এবং সেই গতি সমগ্রভাবে উৎপাদনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং এই সাধারণ নির্ভরতার চৌহদ্দির মধ্যে তা আবার নিজস্ব কতকগ্নলি নিয়ম মেনে চলে, যা নতুন উপাদানটির চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। এই গতির কতকগ্নলি নিজস্ব পর্যায় আছে, তা আবার উৎপাদনের গতির উপরও পাল্টা প্রতিক্রিয়া ঘটায়। আমেরিকা আবিষ্কারের কারণ স্বর্ণলোল্নপতা, যা ইতিপ্নর্বেই পোর্তুগীজদের আফ্রিকায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল (স্যোটবের লিখিত 'মহার্ঘ ধাতুর উৎপাদন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), কারণ ১৪৫০ সাল থেকে ১৫৫০ সাল রৌপ্যের বিপ্নল দেশ জার্মানি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের বিপ্নলভাবে বিকশিত ইউরোপীয় শিল্প ও তদন্নযায়ী বাণিজ্যের বিনিময়-মাধ্যম জোগাতে পারে নি। ১৫০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল অবধি পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজরা যে ভারত জয় করে তার লক্ষ্য ছিল ভারত **থেকে আমদানি**—সেখানে কিছ্ন রপ্তানি করার কথা কেউ

স্বপ্নেও ভাবে নি। অথচ একমাত্র বাণিজ্যের স্বার্থে ঘটিত এই সব আবিষ্কার ও বিজয়ের কী বিপুল প্রতিক্রিয়াই না ঘটে শিল্পের উপর: বৃহদায়তন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ হয় কেবল এই সব দেশে **রপ্তানির** প্রয়োজন থেকে।

টাকার বাজারের বেলাতেও তাই। টাকার বাণিজ্য যেই পণ্যের বাণিজ্য থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন থেকেই উৎপাদন ও পণ্যবাণিজ্য কর্তৃক আরোপিত কতকগুলি শর্তাধীনে এবং সেই চৌহদ্দির মধ্যে, টাকার বাণিজ্যের একটা নিজস্ব বিকাশ ঘটতে থাকে, তার নিজস্ব প্রকৃতি কর্তৃক নির্দিষ্ট বিশেষ নিয়মাবলী ও পর্যায় দেখা দেয়। এর সঙ্গে যদি আরো যোগ করা যায় যে, টাকার বাণিজ্য কিছুটা বিকাশ লাভ করার পর সিকিউরিটির বাণিজ্যও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং সে সিকিউরিটিগুলো শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বন্ড নয় শিল্প ও পরিবহণের স্টকও বটে, ফলে উৎপাদনের একাংশের উপর টাকার বাণিজ্য প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, যদিও সামগ্রিক বিচারে উৎপাদনের দ্বারা সে নিজেই নিয়ন্ত্রিত,—তাহলে উৎপাদনের উপর টাকার বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়া আরও জোরালো ও আরও জটিল হয়ে ওঠে। টাকার কারবারীরা রেলপথ, খনি, লোহা কারখানা, ইত্যাদির মালিক। এই উৎপাদন-উপায়গুলির দুইটি দিক দেখা দেয়: তাদের কাজ চালাতে হয় কখনো কখনো প্রত্যক্ষ উৎপাদনের স্বার্থে, কখনো আবার টাকার কারবারী শেয়ার-হোল্ডারদের প্রয়োজনে। এর সবচেয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে উত্তর আমেরিকার রেলপথগুলি। জনৈক জেই গুল্ড, অথবা ভ্যান্ডারবিল্ট প্রভৃতির মতো ব্যক্তির শেয়ার-বাজারী ক্রিয়াকলাপের উপর এদের পরিচালনার কাজ নির্ভর করে; আর সংশ্লিষ্ট রেলপথটি এবং যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে তার স্বার্থের সঙ্গে এই সব ক্রিয়াকলাপের কোনো সংশ্রবই নেই। এমন কি, এখানে, ইংলন্ডেও আমরা দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন রেল কোম্পানির মধ্যে নিজ নিজ এলাকার সীমানা নিয়ে সংঘর্ষ চলতে দেখেছি—যাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে উৎপাদন ও পরিবহণ-ব্যবস্থার স্বার্থে নয়, নিতান্তই সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য, টাকার কারবারী শেয়ার-হোল্ডারদের শেয়ার-বাজারী ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করাই যার একমাত্র উদ্দেশ্য।

পণ্যবাণিজ্যের সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক এবং টাকার বাণিজ্যের সঙ্গে উভয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার ধারণার এই যে কিছু ইঙ্গিত দিলাম, এর

মধ্যেই সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আপনার প্রশ্নগুলিরও মূলত জবাব দেওয়া হয়ে গেল। শ্রমবিভাগের দিক থেকে বিষয়টিকে বোঝা সবচেয়ে সহজ। সমাজে এমন কতকগুলি সাধারণ কাজের উদ্ভব হয়, যা ছাড়া তার চলে না। এই উদ্দেশ্যে যেসব লোক নিয়োগ করা হয় তারা **সমাজের অভ্যন্তরে** শ্রমবিভাগের একটি নতুন শাখা হয়ে দাঁড়ায়। এতে তাদের বিশেষ স্বার্থের সৃষ্টি হয়, যে স্বার্থ যাদের কাছ থেকে তারা ভারপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের স্বার্থ থেকেও স্বতন্ত্র; তারা শেষোক্তদের অধীনতা থেকে নিজেদের স্বাধীন করে নেয়—এবং এইভাবে রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে। তখন, পণ্যবাণিজ্যে ও পরে টাকার বাণিজ্যে যে প্রক্রিয়া চলে, অনুরূপ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। নতুন স্বাধীন শক্তিকে প্রধানত উৎপাদনের গতি-প্রকৃতিকে অনুসরণ করতে হয় বটে, তথাপি সে আবার তার অন্তর্নিহিত আপেক্ষিক স্বাধীনতা বলে, অর্থাৎ একবার প্রদত্ত ও পরে ক্রমশ বর্ধিত এই আপেক্ষিক স্বাধীনতা বলে উৎপাদনের অবস্থা ও গতি-প্রকৃতির উপর পাল্টা প্রতিক্রিয়া করে। এ হচ্ছে দুটি অসম শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া: এক দিকে, অর্থনৈতিক গতি এবং, অপরদিকে, নতুন রাজনৈতিক শক্তি, যা যতখানি সম্ভব স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করে এবং একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যা নিজস্ব একটা গতিও লাভ করে। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক গতিটা পথ করে নেয় বটে, কিন্তু তাকেও সইতে হয় সেই রাজনৈতিক গতির প্রতিক্রিয়া, যা সে নিজেই প্রতিষ্ঠিত ও আপেক্ষিক স্বাধীনতায় ভূষিত করেছে; সইতে হয়, এক দিকে, রাষ্ট্রশক্তির এবং, অন্য দিকে, যুগপৎ-সঞ্জাত বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া। যেমন শিল্পের বাজারের গতি-প্রকৃতি প্রধানত এবং পূর্বোলিখিত সীমার মধ্যে টাকার বাজারে প্রতিফলিত হয়, অবশ্য **উল্টোভাবে** প্রতিফলিত হয়, ঠিক তেমনই বিভিন্ন যেসব শ্রেণী ইতিমধ্যেই বর্তমান ও ইতিমধ্যেই পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত, তাদের সংগ্রামটা সরকার ও বিরোধীশক্তির সংগ্রামের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু হয় তেমনি উল্টোভাবে, আর প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে, শ্রেণী-সংগ্রাম রূপে নয়, রাজনৈতিক নীতির জন্য সংগ্রাম রূপে এবং এতটা বিকৃত রূপে যে তাকে ধরতে আমাদের লেগেছে কয়েক হাজার বছর।

অর্থনৈতিক বিকাশের উপর রাষ্ট্রশক্তির প্রতিক্রিয়া তিন প্রকারের হতে

পারে। রাষ্ট্রশক্তি একই অভিমুখে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিকাশ হয় আরও দ্রুত; অর্থনৈতিক বিকাশধারার বিপরীত দিকে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আজকাল প্রত্যেক বৃহৎ জাতির মধ্যে রাষ্ট্রশক্তি শেষ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে; অথবা সেটা অর্থনৈতিক বিকাশের কয়েকটি পথ বন্ধ করে অন্য কয়েকটি পথে ঠেলে দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আগের দুটির একটিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক বিকাশের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করতে পারে এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি ও বৈষয়িক সম্পদের অপচয় ঘটাতে পারে।

এছাড়াও রয়েছে দেশজয় এবং অর্থনৈতিক সম্পদের পাশবিক ধ্বংসসাধন, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা সমগ্র স্থানীয় বা জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশকে আগে ধ্বংস করে দিতে পারত। আজকাল, এই ধরনের ঘটনায় সাধারণত বিপরীত ফলই হয়ে থাকে, অন্তত বড় বড় জাতির মধ্যে। শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক থেকে বিজিতই কখনো কখনো বিজেতা অপেক্ষা বেশি লাভবান হয়।

আইনের বেলাতেও ঠিক এই। যে মুহূর্তে বৃত্তিধারী আইনজীবী সৃষ্টি করার মতো নতুন শ্রমবিভাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, অমনি আরেকটি নতুন ও স্বাধীন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়; যা সাধারণভাবে উৎপাদন ও আদানপ্রদানের উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও এই দুটো ক্ষেত্রের উপর পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির বিশেষ ক্ষমতা ধারণ করে। কোনো আধুনিক রাষ্ট্রে আইনকে যে কেবলমাত্র সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার উপযোগী এবং তার অভিব্যক্তি হতে হবে তাই নয়, তাকে **অভ্যন্তরীণভাবে সুসঙ্গতিপূর্ণ** একটা অভিব্যক্তিও হতে হবে, যা অন্তর্বিরোধের ফলে নিজের নাকচ করে দেয় না। এই লক্ষ্য লাভ করতে গিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থার হুবহু প্রতিফলন ক্রমেই বেশি করে ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। সেটা আরও বেশি করে ঘটতে থাকে এই জন্য যে, আইনের বিধি-ব্যবস্থায় কোনো শ্রেণীর আধিপত্যের স্থূল, চরম ও নির্ভেজাল অভিব্যক্তি ঘটে কদাচিত, ঘটলে তাতে 'অধিকারের ধারণা'ই ক্ষুণ্ণ হত। এমন কি 'নেপোলিয়নের সংহিতাতে'ও (১২৫) ১৭৯২-১৭৯৬ সালের বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশুদ্ধ ও পূর্বাপর সঙ্গতিযুক্ত

অধিকারসম্পর্কিত ধারণা ইতিমধ্যেই নানাভাবে ভেজাল মিশ্রিত হয়েছে এবং যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাও প্রলেতারিয়েতের উদীয়মান শক্তির জন্য প্রতিদিনই নানাভাবে নরম করে তুলতে হয়েছে। এতে কিন্তু 'নেপোলিয়নের সংহিতার' পক্ষে সেইরকম সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হতে বাধছে না, যা দুনিয়ার প্রত্যেক অঞ্চলের প্রতিটি নতুন আইনবিধির ভিত্তিস্বরূপ। এইভাবে, 'অধিকারের বিকাশ' ধারা বহু পরিমাণে চলেছে কেবল এইভাবে যে, প্রথমে অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলীকে আইনের নীতিতে প্রত্যক্ষ তর্জমার ফলে উদ্ভূত অন্তর্বিরোধগুলিকে দূর করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস হচ্ছে এবং পরে পরবর্তী অর্থনৈতিক বিকাশের প্রভাবে ও চাপে এই ব্যবস্থার মধ্যে বারম্বার ভাঙন ও নতুন স্ববিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। (এখানে আপাতত আমি শুধু দেওয়ানি আইনের কথাই বলছি।)

আইনের নীতিরূপে অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলীর প্রতিফলনটাও উল্টোপাল্টা হতে বাধ্য। ক্রিয়ারত মানুষের অজ্ঞাতসারেই এই প্রক্রিয়া চলে; আইনবিদ মনে করে, সে পূর্বানুমিত প্রতিপাদ্যগুলি নিয়ে কাজ করছে, আসলে কিন্তু সেগুলি অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলীর প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। সেই জন্যই সব কিছুই একদম উল্টো হয়ে দাঁড়ায়। এবং আমার মনে হয় এটা খুবই স্পষ্ট যে, এই উল্টো অবস্থাটা যতদিন বোধগম্য না হচ্ছে ততদিন, তথাকথিত **মতাদর্শগত ধারণা** গড়ে তুলে নিজেই সে আবার অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর পাল্টা ক্রিয়া করে এবং কতকগুলি সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাকে সংশোধিতও করতে পারে। পরিবারের বিকাশের যদি একই পর্যায় ধরে নেওয়া হয়, তাহলে উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তিটা অর্থনৈতিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা প্রমাণ করা শক্ত হবে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডে ইচ্ছাপত্র রচয়িতার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা এবং ফ্রান্সে তার উপর আরোপিত কঠোর বিধিনিষেধ, তার কারণ শুধু অর্থনৈতিক। দুইই অবশ্য আবার উল্টো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কারণ এতে সম্পত্তি বণ্টন প্রভাবিত হয়।

ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি আরও ঊর্ধ্বচারী মতাদর্শগত ক্ষেত্রগুলির প্রসঙ্গে বলা চলে, এদের একটা প্রাগৈতিহাসিক অন্তর্বস্তু রয়েছে, আজকাল আমরা যাকে আজগুবি বলে থাকি, ঐতিহাসিক যুগ তাকে বিদ্যমান অবস্থায় পায়

এবং আত্মসাৎ করে। প্রকৃতি বিষয়ে, মানুষের নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে, ভূতপ্রেত, জাদুশক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে নানাপ্রকারের এই সব ভ্রান্ত ধারণার অর্থনৈতিক ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিম্ন অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপূরণ ঘটেছে, এবং সেই সঙ্গে তার শর্ত, এমন কি কারণও মিলেছে প্রকৃতি-বিষয়ক এই ভ্রান্ত ধারণায়। এবং যদিও প্রকৃতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের প্রধান চালিকা-শক্তি ছিল এবং ক্রমেই বেশি করে হয়ে উঠছে অর্থনৈতিক প্রয়োজন, তথাপি এই সব কিছু আদিম আজগুবি ধারণার মূলে অর্থনৈতিক কারণ খুঁজতে যাওয়া হবে পণ্ডিতমূর্খের কাজ। বিজ্ঞানের ইতিহাস হচ্ছে ক্রমাগত এই আজগুবির অপসারণ বা তার স্থানে নতুন এবং পূর্বাপেক্ষা কম আজগুবিকে স্থাপন করার ইতিহাস। যারা এই কাজ করে তারা শ্রমবিভাগের বিশেষ ক্ষেত্রের লোক এবং তাদের ধারণা তারা একটি স্বাধীন ক্ষেত্রে কাজ করছে। যে পরিমাণে তারা সামাজিক শ্রমবিভাগের অভ্যন্তরে একটি স্বাধীন গোষ্ঠীরূপে থাকে, সেই পরিমাণে ভুলভ্রান্তিসহ তাদের কীর্তি সমাজের সমগ্র বিকাশের উপর, এমন কি তার অর্থনৈতিক বিকাশের উপরও প্রভাব হিসেবে পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহলেও তারা নিজেরাই আবার অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান প্রভাবের অধীন। যেমন, দর্শনে, বুর্জোয়া যুগের ক্ষেত্রে একথা খুব সহজেই প্রমাণ করা যায়। হব্‌স ছিলেন প্রথম আধুনিক বস্তুবাদী (অষ্টাদশ শতকের অর্থে), কিন্তু যে যুগে সারা ইউরোপ জুড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের আধিপত্য, এবং যে যুগে ইংলন্ডে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বনাম জনসাধারণের লড়াই শুরু হচ্ছে, সেই যুগে তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অনুগামী। লক্‌ ছিলেন ধর্ম ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই ১৬৮৮ সালের শ্রেণী-আপসের (১২৬) সন্তান। ব্রিটিশ ডিইস্টরা (১২৭) এবং তাদের আরও সুসংগতিপূর্ণ উত্তরসাধক ফরাসী বস্তুবাদীরা ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রকৃত দার্শনিক; ফরাসী বস্তুবাদীরা এমন কি বুর্জোয়া বিপ্লবেরও দার্শনিক ছিলেন। কাণ্ট থেকে হেগেল পর্যন্ত সারা জার্মান দর্শন জুড়ে উঁকি দেয় জার্মান কূপমণ্ডূক, কখনও ইতিবাচকরূপে, কখনও নেতিবাচকরূপে। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক যুগের দর্শন শ্রমবিভাগের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র, সেই হেতু সে তার পূর্বগামীদের কাছ থেকে পাওয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট চিন্তাবস্তুকে পূর্বস্থিতিরূপে গ্রহণ

করে যাত্রা শুরু করে। এই জন্যই অর্থনীতির দিক থেকে পশ্চাৎপদ দেশগুলিও দর্শনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে: যেমন ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স—ইংলণ্ডের দর্শনের উপরই ফরাসীরা নিজেদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, পরে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয়ের তুলনায় জার্মানি। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্মানি উভয় দেশেই তখন দর্শন ও সাহিত্যের সাধারণ স্ফুরণের মূলে ছিল একটা অর্থনৈতিক জোয়ার। শেষ পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক বিকাশের আধিপত্য আমার কাছে সন্দেহাতীত; কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রের দ্বারা আরোপিত অবস্থার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ: যেমন দর্শনের বেলায় পূর্বগামীদের হাত থেকে পাওয়া যেসকল দার্শনিক মালমসলা বিদ্যমান তার উপর অর্থনৈতিক প্রভাবগুলির (যা আবার সাধারণত রাজনীতি ইত্যাদির ছদ্মবেশেই মাত্র কাজ করে) প্রক্রিয়ার মধ্যে। এখানে অর্থনীতি নতুন কিছু সৃষ্টি করে না, বিদ্যমান রূপে প্রাপ্ত চিন্তা-উপকরণ কীভাবে পরিবর্তিত ও আরও বিকশিত হবে তার পথ নির্দিষ্ট করে, এবং তাও করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে, কারণ রাজনৈতিক, আইনগত ও নৈতিক প্রতিফলনগুলিই দর্শনের উপর প্রধানতম প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয় তা আমি ফয়েরবাখ সম্পর্কিত শেষ অধ্যায়ে বলেছি*।

অতএব, বার্ট যদি ধরে নিয়ে থাকেন যে, অর্থনৈতিক আন্দোলনের উপর ঐ আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য যেকোনো প্রতিফলনের প্রতিক্রিয়া আমরা অস্বীকার করি, তাহলে তিনি বাতচক্রের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তিনি যদি শুধু একবার মার্কসের **'আঠারোই ব্রুমেয়ার'**** বইখানার পাতায় চোখ বোলান তাহলেই বুঝতে পারবেন, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ঘটনাবলী কী **বিশেষ** ভূমিকা পালন করেছে বইখানিতে প্রায় একান্তভাবে তাই আলোচিত হয়েছে, অবশ্য অর্থনৈতিক অবস্থার উপর তাদের **সাধারণ** নির্ভরশীলতার সীমার মধ্যে। কিম্বা দেখতে পারেন 'পুঁজি' গ্রন্থখানি,

---

* এই সংস্করণের ১০ম খণ্ডের ১৩৯-১৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ৪র্থ খণ্ডের ১২-১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রমদিন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে অংশে, সেই অংশ। সেখানে দেখা যাবে আইন প্রণয়নের প্রতিক্রিয়া কত প্রভাবশালী, এবং আইন প্রণয়ন নিশ্চয়ই একটি রাজনৈতিক কাজ। অথবা, বুর্জোয়ার ইতিহাস সংক্রান্ত অংশ (চতুর্বিংশ অধ্যায়*)। রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিহীন হয়, তবে কেন আমরা প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি? বলও (অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি) একটি অর্থনৈতিক শক্তি!

কিন্তু বইখানিকে সমালোচনা করার মতো সময় এখন আমার নেই। প্রথমে আমাকে তৃতীয় খণ্ডটি** প্রকাশ করতে হবে। তাছাড়া আমার ধারণা বার্নস্টাইনও বেশ ভালোভাবেই এর মোকাবিলা করতে পারবেন।

এই ভদ্রলোকদের যে বস্তুটির অভাব তা হচ্ছে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁরা সর্বদাই শুধু এখানে কারণ ও ওখানে কার্য দেখতে পান। এ যে একটা শূন্যগর্ভ বিমূর্ততা, এই ধরনের আধিবিদ্যক প্রান্তিক বৈপরীত্য যে বাস্তব জগতে দেখা যায় কেবল বড় জোর সংকটকালেই এবং সমগ্র বিপুল প্রক্রিয়া যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপেই চলে — যদিও অত্যন্ত অসম শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কারণ অর্থনৈতিক গতিটাই সর্বাধিক শক্তিশালী, সর্বাধিক আদিম, সর্বাধিক নির্ধারক — এখানে যে সব কিছুই আপেক্ষিক এবং কিছুই পরম নয়, একথা তাঁরা বুঝতে পারেন না। তাঁদের কাছে হেগেল বলে কেউ যেন কখনো ছিলেন না...

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

---

* এই সংস্করণের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৪-১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ। — সম্পাঃ

বার্লিনে ফ্রানৎস্ মেরিং সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১৪ জুলাই, ১৮৯৩

প্রিয় মিঃ মেরিং,

'লেসিং কিংবদন্তী' বইখানি দয়া করে আমাকে পাঠানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর এই প্রথম সুযোগ আজ আমার হল। বইখানির মাত্র একটা আনুষ্ঠানিক প্রাপ্তিস্বীকার জানাতে চাই নি, ঐ সঙ্গে বইখানি সম্বন্ধে, বইখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলার ইচ্ছা ছিল। তাই দেরি হল।

আমি শুরু করব শেষ থেকে, অর্থাৎ 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সংক্রান্ত' পরিশিষ্ট (১২৮) থেকে, যেখানে আপনি প্রধান প্রধান তথ্যগুলি চমৎকারভাবে এবং যেকোনো পক্ষপাতহীন মানুষকে নিঃসংশয় করার মতো করে সাজিয়ে দিয়েছেন। আপত্তি করার যেটুকু চোখে পড়ল তা এই যে, আপনি আমাকে আমার প্রাপ্যের বেশি কৃতিত্ব দিয়েছেন; এমন কি কালক্রমে আমি নিজেও যেসব কথা আবিষ্কার করতে পারতাম বলে ধরে নিই, তাহলেও মার্কস তাঁর দ্রুততর উপলব্ধি ও ব্যাপকতর দৃষ্টির সাহায্যে সে সবই অনেক আগে আবিষ্কার করেছিলেন। মার্কসের মতো ব্যক্তির সঙ্গে চল্লিশ বছর কাজ করার সৌভাগ্য যার হয়, তার যে স্বীকৃতি প্রাপ্য বলে মনে হতে পারে তা সাধারণত সে ঐ ব্যক্তির জীবদ্দশায় লাভ করে না। তারপর বৃহতের মৃত্যু হলে ক্ষুদ্র সহজেই প্রাপ্যের অতিরিক্ত পায়; আমার মনে হয় বর্তমানে আমার বেলাতেও ঠিক এই হচ্ছে; শেষ পর্যন্ত ইতিহাস এ সব কিছুই শুধরে দেবে, কিন্তু ততদিন আমি নিঃশব্দে পরপারে চলে যাব এবং কোনো কিছু সম্পর্কেই কিছু জানব না।

এছাড়া, আপনার লেখায় একটিমাত্র জিনিসের অভাব, যার উপর অবশ্য মার্কস ও আমি আমাদের লেখায় কখনও যথেষ্ট জোর দিই নি এবং সে ব্যাপারে আমরা সবাই সমানভাবে দোষী। অর্থাৎ, প্রথমে আমরা প্রধানত এই জোর দিয়েছিলাম এবং **বাধ্য হয়েই দিয়েছিলাম** যে, রাজনৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য মতাদর্শগত ধারণা এবং এই সব ধারণার মাধ্যমে সংঘটিত কার্যাবলীর **উদ্ভব হয়েছে** মূল অর্থনৈতিক ঘটনাবলী থেকে। এই কাজ করতে গিয়ে বিষয়বস্তুর স্বার্থে আমরা রূপের দিকটা, অর্থাৎ যেভাবে ও যে

কায়দায় এই সব ধারণা ইত্যাদি আবির্ভূত হয় সেই দিকটা অবহেলা করেছিলাম। এতে আমাদের শত্রুদের পক্ষে ভুল বোঝানোর ও বিকৃতি সাধনের খুব একটা সুযোগ জুটে যায়। পাউল বার্ট তারই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ভাবাদর্শ এমন একটি প্রক্রিয়া যা তথাকথিত মনীষী যে সচেতনভাবে সম্পাদন করেন সে-কথা ঠিক, কিন্তু এ সচেতনতা ভ্রান্ত সচেতনতা। তাঁকে চালিত করে যে প্রকৃত প্রেরণাশক্তি তা তাঁর কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়, অন্যথায় তা ভাবাদর্শগত প্রক্রিয়াই হত না। তাই, তিনি মিথ্যা কিম্বা আপাতপ্রতীয়মান প্রেরণাশক্তিরই অস্তিত্ব কল্পনা করেন। যেহেতু এই প্রক্রিয়া হচ্ছে চিন্তার প্রক্রিয়া, সেই হেতু তিনি এর বিষয়বস্তু ও রূপ দুইই হয় নিজের নয় পূর্বগামীদের বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে আহরণ করেন। তিনি কেবলমাত্র চিন্তা-উপকরণ নিয়েই কাজ করেন, যা তিনি পরীক্ষা না করেই চিন্তাফল বলে গ্রহণ করেন এবং চিন্তা থেকে স্বাধীন কোনো দূরতর উৎস আর অনুসন্ধান করে দেখেন না। প্রকৃতপক্ষে একে তিনি স্বাভাবিক বলেই ধরে নেন, কারণ সমস্ত কর্ম চিন্তার **মধ্যস্থতায়** সম্পন্ন হয় বলে, তিনি ধরে নেন সেটা শেষ পর্যন্ত চিন্তার **ভিত্তিতেই** ঘটছে।

যে ভাবপ্রবক্তা ইতিহাস নিয়ে কারবার করেন (ইতিহাস বলতে এখানে সোজাসুজি শুধু প্রকৃতির নয়, **সমাজের** সমস্ত ক্ষেত্রকেই বোঝাচ্ছে যেমন, রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, ধর্মশাস্ত্রীয়), তিনি বিজ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রে এমন সব মালমশলা হাতে পান, যা পূর্বপুরুষদের চিন্তা থেকে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত এবং যা একের পর এক এই সব পুরুষের মস্তিষ্কে নিজস্ব স্বাধীন বিকাশধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে। একথা সত্য যে, কোনো একটি ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহির্ঘটনাবলীও এই বিকাশের উপর সহ-নির্ধারক প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু না বলেও ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, এই ঘটনাগুলি নিজেরাও একটি চিন্তা প্রক্রিয়ার ফলমাত্র; অতএব আমরা শুদ্ধ চিন্তার জগতেই রয়ে যাই, যে চিন্তা যেন সবচেয়ে বেয়াড়া ঘটনাগুলিকে পর্যন্ত বেমালুম হজম করে ফেলে।

পৃথক পৃথক প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সংবিধান, আইন-ব্যবস্থা, ভাবাদর্শগত ধ্যানধারণার এক একটা স্বাধীন ইতিহাসের এই আপাতপ্রতীয়মানতাই

সর্বোপরি অধিকাংশ মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। লুথার ও কালভাঁ যদি সরকারী ক্যাথলিক ধর্ম 'পরাহত করে থাকেন', কিম্বা হেগেল যদি কাণ্ট ও ফিখতেকে 'পরাহত করে থাকেন', কিম্বা রুসো যদি তাঁর প্রজাতন্ত্রী 'সামাজিক চুক্তি' (১২৯) দিয়ে নিয়মতন্ত্রী মঁতেস্ক্যুকে পরোক্ষে 'পরাহত করে থাকেন', তাহলে সে যেন এক প্রক্রিয়া যা ধর্মতত্ত্ব, দর্শন বা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়েই থাকছে, তা এই বিশেষ বিশেষ চিন্তাক্ষেত্রগুলির ইতিহাসে এক একটি স্তরেরই পরিচায়ক, এবং কখনও চিন্তাক্ষেত্রের বাইরে যায় না। এর সঙ্গে আবার পুঁজিবাদী উৎপাদনের চিরন্তনতা ও চূড়ান্ততার বুর্জোয়া ভ্রান্তি যুক্ত হয়, ফলে ফিজিওক্রাট ও অ্যাডাম স্মিথের হাতে বাণিজ্যপন্থীদের (১৩০) 'পরাভব' একান্তভাবে চিন্তার জয় বলেই ধরে নেওয়া হয়, চিন্তার মধ্যে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতিফলনরূপে নয়, সর্বদা এবং সর্বত্র বিদ্যমান বাস্তব অবস্থার নির্ভুল ও চূড়ান্ত উপলব্ধিরূপে। বলতে কি সিংহহৃদয় রিচার্ড এবং ফিলিপ অগস্টাস যদি ক্রুসেড যুদ্ধে (১৩১) জড়িয়ে না পড়ে স্বাধীন বাণিজ্য প্রবর্তন করতেন, তাহলে আমরা যেন পাঁচ-শো বছরের দুর্দশা ও মূঢ়তা থেকে রেহাই পেতাম।

আমার মনে হয় বিষয়টির এই যে দিকটিকে এখানে মাত্র উল্লেখ করে যাওয়া সম্ভব হল, সেটাকে আমরা যতটা অবহেলা করেছি তা অনুচিত। এ সেই পুরাতন কাহিনী—আধেয়ের স্বার্থে আধার প্রথমে সর্বদাই অবহেলিত হয়। ফের বলি, আমি নিজেও তাই করেছি, এবং সর্বদাই ভুল বুঝতে পেরেছি কেবল post festum*। অতএব, এর জন্য আপনাকে তিরস্কার মোটেই করছি না — বরং আপনার চেয়ে পুরাতন দোষী হিসেবে সে অধিকারও আমার নেই—তাহলেও আমি ভবিষ্যতের জন্য এই দিকটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সেই সঙ্গে রয়েছে ভাবাদর্শীদের এই আজগুবি ধারণা: ইতিহাসে যাদের ভূমিকা রয়েছে সেই সব বিভিন্ন মতাদর্শক্ষেত্রের স্বাধীন ঐতিহাসিক বিকাশকে আমরা অস্বীকার করি বলে **ইতিহাসের উপর** তাদের কোনরূপ **প্রতিক্রিয়াকেও** আমরা বুঝি অস্বীকার করি। এর মূলে রয়েছে কারণ ও কার্য সম্পর্কে

* পরে। — সম্পাঃ

মাম্বলী অ-দ্বান্দ্বিক ধারণা, যেন তারা একান্তভাবেই বিপরীত মের্বস্থিত, তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সম্প্বর্ণর্বপে অবহেলা করা হয়। এই ভদ্রলোকেরা প্রায়ই ইচ্ছা করেই ভুলে যান যে, একবার যখন কোনো ঐতিহাসিক উপাদান অপরাপর এবং শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণের ফলস্বর্প স্বৃষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই উপাদানটি তার নিজের পরিবেশের উপর এবং এমন কি যেসব কারণ থেকে তার জন্ম সেগ্বলিরও উপরও প্রতিক্রিয়া স্বৃষ্টি করে। দ্বৃষ্টান্তস্বর্প, আপনার বইয়ের ৪৭৫ প্বৃষ্ঠায় প্বরোহিত সম্প্রদায় ও ধর্ম সম্পর্কে বার্টের বক্তব্য। এমন আশাতীত রকমের মাম্বলী ব্যক্তির সঙ্গে যেভাবে আপনি মোকাবিলা করেছেন তাতে আমি খ্বব খ্বশি হয়েছি। একেই আবার তারা লাইপজিগে ইতিহাসের অধ্যাপক বানিয়েছে! আগে সেখানে থাকতেন ব্বদ্ধ ভাক্সম্বথ; সংকীর্ণমনা হলেও তথ্য সম্পর্কে তিনি খ্বব সজাগ ছিলেন, সম্প্বর্ণ আলাদা ধরনের লোক তিনি!

তাছাড়া, বইখানি সম্পর্কে আমার অভিমতর্বপে আমি সেই কথারই প্বনর্বক্তি করতে পারি, যেকথা আমি *Neue Zeit* (১৩২) পত্রিকায় প্রবন্ধগ্বলি প্রকাশের সময় বলেছি: প্রব্শীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অন্য যেকোনো লেখার চেয়ে এ লেখা বহ্বগ্বণে ভালো। প্রকৃতপক্ষে একথাও বলতে পারি যে, বইখানি হচ্ছে একমাত্র ভালো বই যাতে সামান্যতম খ্বঁটিনাটি পর্যন্ত নিয়ে অধিকাংশ ব্যাপারের অন্তঃসম্পর্ককে নির্ভুলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একমাত্র দ্বঃখ, বিসমার্ক পর্যন্ত সমগ্র বিকাশধারাকে আপনি অন্তর্ভুক্ত করেন নি এবং অজ্ঞাতসারেই আমার আশা হয় বারান্তরে আপনি এই কাজটি সম্পন্ন করবেন এবং ইলেক্টর ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম থেকে ব্বদ্ধ ভিলহেল্ম* পর্যন্ত একটি সম্প্বর্ণ ও স্বসংগতিপ্বর্ণ চিত্র উপস্থিত করবেন। আপনি তো ইতিমধ্যেই আপনার প্রাথমিক অন্বসন্ধান শেষ করেছেন এবং প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে তা সমাপ্ত বলে ধরা যায়। প্বরনো নড়বড়ে দালান ভেঙে পড়ার আগেই যেকোনো ভাবে হোক কাজটি সেরে ফেলতে হবে। রাজতন্ত্রী-দেশপ্রেমিক কিংবদন্তীগ্বলির ভাঙন যদিও শ্রেণী-প্রভুত্ব গোপনকারী রাজতন্ত্রের বিলোপসাধনের পক্ষে সরাসরি একটা প্রয়োজনীয় প্বর্বশর্ত নয় (কেননা

* প্রথম ভিলহেল্ম। — **সম্পাঃ**

জার্মানিতে একটি **বিশুদ্ধ,** বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র আবির্ভূত হবার আগেই ঘটনাস্রোত তাকে পিছু ফেলে এগিয়ে গেছে), তথাপি সে ভাঙন রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকর হয়ে দাঁড়াবে।

তখন, জার্মানিকে যে সাধারণ দুর্গতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তার অংশ হিসেবে প্রাশিয়ার স্থানীয় ইতিহাসকে বিবৃত করারও আপনি আরও স্থান ও সুযোগ পাবেন। এই বিষয়টিতে আপনার মতের সঙ্গে কোনো কোনো স্থানে আমার অমিল রয়েছে, বিশেষত জার্মানির অঙ্গচ্ছেদের এবং ষোড়শ শতকে জার্মানিতে বুর্জোয়া বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে। আশা করছি, আগামী শীতকালেই আমি আমার 'কৃষকযুদ্ধ' বইখানির ঐতিহাসিক ভূমিকা নতুন করে লিখব, তখন আমি এই বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। আমি যে আপনার বক্তব্য ভুল মনে করছি তা নয়, আমি শুধু তাদের পাশাপাশি অন্য বক্তব্যও রাখছি এবং কিছুটা অন্যরকমভাবে তাদের সাজাচ্ছি।

জার্মানির ইতিহাস এক নিরবচ্ছিন্ন দীনতার কাহিনী। এই ইতিহাস অনুশীলন করতে গিয়ে আমি বরাবরই দেখেছি, কেবলমাত্র পাল্টা ফরাসী ইতিহাস পর্বগুলির সঙ্গে তুলনার মাধ্যমেই একটি সঠিক মাত্রাজ্ঞান জন্মায়, কারণ সেখানে যা ঘটছে তা আমাদের দেশে যা ঘটছে তার ঠিক বিপরীত। যখন আমরা আমাদের চরম পতনের যুগের মধ্যে দিয়ে চলেছি, ঠিক তখনই সেখানে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের disjectis membris* থেকে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে প্রক্রিয়াটির সমগ্র গতিতে একটি দুর্লভ বিষয়নিষ্ঠ যৌক্তিকতা বর্তমান, আর আমাদের ক্ষেত্রে বিষণ্ন বিশৃঙ্খলা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সেখানে মধ্যযুগে বিদেশীর হস্তক্ষেপ আসে ইংরেজ বিজেতাদের মধ্য দিয়ে, তারা হস্তক্ষেপ করে প্রভাঁস জাতিসত্তার স্বপক্ষে উত্তর ফরাসী জাতিসত্তার বিরুদ্ধে। ইংলন্ডের সঙ্গে যুদ্ধই একদিক দিয়ে ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৩৩), এবং সে যুদ্ধের অবসান হল বিদেশী হানাদারদের উৎসাদনে এবং উত্তর কর্তৃক দক্ষিণের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে। তারপর এল কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে নিজের বৈদেশিক অধিকারগুলির সমর্থনপুষ্ট বার্গান্ডির

* বিচ্ছিন্ন অংশগুলি। — সম্পাঃ

সামন্ত রাজার* সংগ্রাম। সে গ্রহণ করল ব্রান্ডেন্‌বুর্গ — প্রাশিয়ার ভূমিকা। এই সংগ্রামে অবশ্য কেন্দ্রীয় শক্তি জয়ী হল এবং চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় রাষ্ট্র। ঠিক সেই সময়ই আমাদের দেশে জাতীয় রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ল (পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের [১৩৪] অভ্যন্তরে 'জার্মান রাজ্যকে' যতটা জাতীয় রাষ্ট্র বলা চলে) এবং শুরু হল জার্মান ভূমির ব্যাপক লুণ্ঠন। এই তুলনা জার্মানদের পক্ষে অত্যন্ত হীনতাসূচক এবং সেই জন্যই আরও বেশি শিক্ষাপ্রদ; এবং যেহেতু আমাদের শ্রমিকেরা জার্মানিকে আবার ঐতিহাসিক আন্দোলনের পুরোভাগে স্থাপন করেছে, সেই হেতু অতীতের এই কলঙ্ককে পরিপাক করা আমাদের পক্ষে কিছুটা সহজ হয়েছে।

জার্মানির বিকাশের আরেকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে, সাম্রাজ্যের যে দুটো অংশ শেষ পর্যন্ত জার্মানিকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল তাদের কোনোটিই পুরোপুরি জার্মান ছিল না — দুইই ছিল বিজিত স্লাভ এলাকায় উপনিবেশ: অস্ট্রিয়া হল ব্যাভেরিয়ান উপনিবেশ, ব্রান্ডেন্‌বুর্গ হল স্যাক্সন উপনিবেশ। বিদেশী, অ-জার্মান অধিকারগুলির সমর্থনের উপর নির্ভর করেই তারা **আসল** জার্মানির অভ্যন্তরে ক্ষমতা অর্জন করেছিল: অস্ট্রিয়া নির্ভর করেছিল হাঙ্গেরীয় সমর্থনের উপর (বোহেমিয়ার কথা ছেড়েই দিচ্ছি) এবং ব্রান্ডেন্‌বুর্গ নির্ভর করেছিল প্রাশিয়ার সমর্থনের উপর। যে পশ্চিম সীমান্ত ছিল দারুণ বিপদের মধ্যে, সেখানে এধরনের কিছু ঘটে নি; উত্তর সীমান্তে দিনেমারদের হাত থেকে জার্মানিকে রক্ষা করার ভার দিনেমারদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দক্ষিণ দিকে রক্ষা করার মতো বিশেষ কিছু ছিল না বলেই সীমান্তরক্ষী সুইজারল্যান্ডবাসীরা এমন কি জার্মানি থেকে নিজেদের ছিন্ন করে নিতেও সক্ষম হয়েছিল!

কিন্তু আমি নানাধরনের অতিরিক্ত আলোচনার মধ্যে গিয়ে পড়েছি। আপনার বই আমার মনকে কীভাবে নাড়া দিয়েছে, এই বাচালতা অন্তত তার প্রমাণ।

---

* বীর কার্ল। — সম্পাঃ

আরেকবার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

ভবদীয়

ফ. এঙ্গেলস

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

পিটার্সবুর্গে ন. ফ. দানিয়েলসন সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১৭ অক্টোবর, ১৮৯৩

'রেখাচিত্রের' (১৩৫) কপিগুলির জন্য ধন্যবাদ। তিনখানি কপি আমি সমঝদার বন্ধুদের পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখে খুশি হলাম, বইখানি খুবই চাঞ্চল্য এবং রীতিমতো উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে—করাই উচিত। যেসব রুশীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, বইখানি তাঁদের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয়। এইতো গতকালই তাঁদের একজন* লিখেছেন: সেখানে, রাশিয়ায় 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের ভাগ্য' নিয়ে বিতর্ক চলেছে। বার্লিনের *Sozialpolitisches Centralblatt*** পত্রিকায় মিঃ প. স্ত্রুভে আপনার বই সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন; এই একটি বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ কর্তৃক সৃষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থা, যে পদ্ধতিতে কৃষি-সম্পর্কে ১৮৬১ সালের পরিবর্তন (১৩৬) সাধিত হয়েছিল সেই পদ্ধতি এবং সাধারণভাবে ইউরোপের রাজনৈতিক অচলাবস্থা — রাশিয়ার পুঁজিবাদী বিকাশের বর্তমান স্তর এদেরই অনিবার্য পরিণতি বলেই, আমারও মনে হয়। কিন্তু যাকে তিনি বলেছেন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার হতাশাব্যঞ্জক ধারণা, তা খণ্ডন করতে গিয়ে রাশিয়ার বর্তমান স্তরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্তরের সঙ্গে তুলনা করায়

* গোল্ডেনবের্গ। — সম্পাঃ

** প্রকাশনের তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ অক্টোবর, ১৮৯৩। [এঙ্গেলসের টীকা। — সম্পাঃ]

তিনি সুনিশ্চিতভাবে ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাশিয়াতেও আধুনিক পুঁজিবাদের কুফলগুলিকে সমান সহজে দূর করা যাবে। তিনি একেবারেই ভুলে গেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্ম থেকেই আধুনিক, বুর্জোয়া; তিনি ভুলে গেছেন যে, পুরোপুরি বুর্জোয়া সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের কবল থেকে পালিয়ে যাওয়া পেটি বুর্জোয়া ও চাষীরাই তাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু রাশিয়ায় আদিম সাম্যবাদী প্রকৃতির একটা ভিত রয়েছে, একটা সভ্যতাপূর্ব গোত্র-সংগঠন রয়েছে। তা ধ্বসে পড়ছে বটে, তবু এখনও পুঁজিবাদী বিপ্লব (যা প্রকৃত সমাজবিপ্লব) যার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করছে, তার বনিয়াদ ও উপকরণ হয়ে রয়েছে। আমেরিকায় এক শতাব্দীরও বেশি হল মুদ্রা-অর্থনীতি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এদিকে রাশিয়ায় প্রায় পুরোপুরিই স্বভাব-অর্থনীতি হল নিয়ম। অতএব, বোঝাই যায় যে, রাশিয়ার পরিবর্তন আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশি হিংসাত্মক, অনেক বেশি ক্ষুরধার হবে এবং বহুগুণ বেশি দুর্গতির মধ্য দিয়ে আসবে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমার মনে হয় আপনি যতটা হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরেছেন, ঘটনাবলী তা সমর্থন করে না। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সমাজের একটা ভয়ানক তোলপাড় ছাড়া এবং গোটাগুটি এক-একটা শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে অন্যান্য শ্রেণীতে রূপান্তর ছাড়া আদিম কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদ থেকে পুঁজিবাদী শিল্পায়নে উত্তরণ সম্ভব নয়। এর ফলে অনিবার্যভাবেই কী বিপুল পরিমাণ দুর্গতি এবং মানবজীবন ও উৎপাদন-শক্তির অপচয় ঘটে, তা আমরা ক্ষুদ্রাকারে দেখেছি—পশ্চিম ইউরোপে। কিন্তু তার ফলে মোটেই একটা মহান ও অতিপ্রতিভাধর জাতি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় না। দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি—যাতে আপনারা অভ্যস্ত—তা রুদ্ধ হতে পারে; বেপরোয়া অরণ্যবিনাশ ও সেই সঙ্গে জমিদার তথা কৃষকদের উচ্ছেদের ফলে উৎপাদন-শক্তির অপরিমেয় অপচয় ঘটাতে পারে, কিন্তু, যাই হোক না-কেন, দশ কোটির বেশি মানুষের একটি জাতি শেষ পর্যন্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ **বৃহৎ শিল্পের** একটা ভালো রকম অভ্যন্তরীণ বাজার হয়ে দাঁড়াবে এবং অন্যান্য দেশের মতো আপনাদের বেলাতেও ভারসাম্য ঘটবে—অবশ্য যদি পুঁজিবাদ পশ্চিম ইউরোপে সুদীর্ঘকাল টিকে থাকে।

আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন,

'ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা, অতীত ইতিহাস থেকে যে উৎপাদন-রূপ আমরা লাভ করেছি তার বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল না।'

আমি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলব, আদিম কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদ থেকে উন্নততর সামাজিক রূপে বিকাশলাভ অন্য যেকোনো দেশের মতো রাশিয়াতেও সম্ভব নয়, যদি না নিদর্শন জোগাবার মতো ঐ উন্নততর রূপটি অন্য কোনো দেশে **ইতিপূর্বেই বিদ্যমান** থাকে। যেখানে ঐতিহাসিক কারণে সম্ভব সেখানে এই উন্নততর রূপটি যেহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদন-রূপ ও তার সৃষ্ট সামাজিক দ্বৈতবিরোধের অনিবার্য পরিণতি, সেই জন্যই, কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠী থেকে সরাসরি তার উদ্ভব হতে পারে না, যদি ইতিমধ্যেই কোথাও তার অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত না থেকে থাকে। যদি ১৮৬০-১৮৭০ সালে ইউরোপের পশ্চিমাংশ এই ধরনের রূপান্তরের পক্ষে পরিণত হয়ে থাকত, যদি ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে তখনই এই রূপান্তরণের কাজ শুরু হয়ে যেত, তাহলে তখন রুশীদের কর্তব্য হত তাদের যে গোষ্ঠী কমবেশি অটুটই ছিল তাকে অবলম্বন করে কী করা যায় সেটা দেখানো। কিন্তু পশ্চিমে রইল অচল অবস্থা, এ ধরনের কোনো রূপান্তরণের চেষ্টা সেখানে হল না এবং পুঁজিবাদ দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে বিকাশ লাভ করতে লাগল। তখন যেহেতু রাশিয়ার পক্ষে কেবল এই গত্যন্তর ছিল: হয় গোষ্ঠীকে (১৩৭) এমন এক উৎপাদন-রূপে গড়ে তোলা, যার সঙ্গে তার একাধিক ঐতিহাসিক স্তরের ব্যবধান এবং যার উপযোগী অবস্থা তখন এমন কি পশ্চিমেও পরিপক্ক নয়,—স্পষ্টতই এ কাজ অসম্ভব,—নয় পুঁজিবাদে বিকাশ লাভ করা, তাই শেষোক্ত পথ গ্রহণ ছাড়া তার কীই বা করার ছিল?

আর গোষ্ঠীর প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, তা ততদিনই সম্ভব যতদিন তার সদস্যদের মধ্যে ধনবৈষম্য নগণ্য থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে এই বৈষম্য বড় হয়ে ওঠে, যে মুহূর্তে তার সদস্যদের কেউ কেউ সমৃদ্ধতর সদস্যদের ঋণদাসে পরিণত হয়, সে মুহূর্ত থেকে গোষ্ঠী আর টিকতে পারে না। আপনাদের দেশের কুলাকেরা ও মিরোয়েদরা (১৩৮) যে নির্মমতার সঙ্গে গোষ্ঠীকে ধ্বংস করছে, সলোনের পূর্বে এথেন্সের কুলাকেরা ও মিরোয়েদরাও ঠিক

সেই নির্মমতার সঙ্গে এথেনীয় **গোত্র-সংগঠনকে** ধ্বংস করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস নিশ্চিত বলেই আমার আশঙ্কা। কিন্তু, অন্য দিকে, পুঁজিবাদ নতুন পরিপ্রেক্ষিত ও নতুন আশার সৃষ্টি করছে। চেয়ে দেখুন, পশ্চিমে সে কী করেছে ও করছে। আপনাদের মতো মহান জাতি যেকোনো সংকটই উত্তীর্ণ হবে। এমন কোনো বড় রকমের ঐতিহাসিক অকল্যাণ নেই, যার ক্ষতিপূরণের মতো একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অনুপস্থিত। কেবলমাত্র modus operandi* পরিবর্তন হয়। ভবিতব্যই পূর্ণ হোক!..

· জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

ব্রেস্‌লাউতে ভল্‌টের বর্গিউস সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২৫ জানুয়ারি, ১৮৯৪

প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর এখানে দিলাম:

১। আমরা যাকে সমাজের বিকাশের নিয়ামক ভিত্তি বলে মনে করি সেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলতে আমরা যা বুঝি তা হল, একটি নির্দিষ্ট সমাজে মানুষ যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে তাদের জীবনধারণের উপায়গুলি উৎপন্ন করে এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলি নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে (কারণ, শ্রম বিভাজনের অস্তিত্ব)। উৎপাদন ও পরিবহণের **সমগ্র কৃৎকৌশলটি** এখানে এইভাবে অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ধারণা অনুযায়ী এই কৃৎকৌশল বিনিময়ের ধরন ও পদ্ধতিও নির্ধারণ করে এবং, তদুপরি, নির্ধারণ করে উৎপন্ন সামগ্রীর বণ্টনের ধরন ও পদ্ধতিকে এবং গোষ্ঠীপ্রধান সমাজের অবলুপ্তির পর, তার সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজনকেও, এবং সেই হেতু প্রভুত্ব ও দাসত্বের সম্পর্ক ও সেগুলির সঙ্গে রাষ্ট্র, রাজনীতি, আইন প্রভৃতিকেও। অর্থনৈতিক সম্পর্কের

* কার্যপদ্ধতি। — সম্পাঃ

মধ্যে এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত সেই **ভৌগোলিক বনিয়াদ** যার উপরে দাঁড়িয়ে সেগুলি কাজ করে, এবং অর্থনৈতিক বিকাশের পূর্বতন স্তরগুলির সেই সব অবশেষ যেগুলি প্রকৃতপক্ষে সেখান থেকে চলে এসেছে এবং টিকে আছে—প্রায়শই শুধু পরম্পরার মধ্যে দিয়ে অথবা vis inertiae*; এছাড়াও অবশ্য সমাজের এই ধরনটিকে ঘিরে-থাকা বাহ্যিক পরিবেশ।

আপনি যে কথা বলেছেন, কৃৎকৌশল যদি বিজ্ঞানের অবস্থার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে, তাহলে বিজ্ঞানও কৃৎকৌশলের **অবস্থা** ও **চাহিদার** উপরে নির্ভর করে অনেক বেশি। সমাজের যদি একটি কৃৎকৌশলগত প্রয়োজন থাকে তবে তা বিজ্ঞানকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি। গোটা হাইড্রোস্ট্যাটিকস বিজ্ঞানেরই (তরিচেলি প্রমুখ) সৃষ্টি হয়েছিল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালির পার্বত্য নির্ঝরগুলি নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন থেকে। বিদ্যুৎশক্তি সম্পর্কে যুক্তিসংগত যা কিছু আমরা জেনেছি তার কৃৎকৌশলগত প্রযোজ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার পরেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জার্মানিতে বিজ্ঞানের ইতিহাস এমনভাবে লেখার একটা রেওয়াজ হয়েছে যেন সেগুলি পড়েছে আকাশ থেকে।

২। অর্থনৈতিক শর্তগুলিকে আমরা এমন শর্ত বলে গণ্য করি যা শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিকাশকে শর্তাবদ্ধ করে। কিন্তু বর্ণ নিজেই একটা অর্থনৈতিক বিষয়। এখানে অবশ্য দুটি বিষয় উপেক্ষা করলে চলবে না:

ক) রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, শিল্পকলাগত প্রভৃতি বিকাশের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক বিকাশ। কিন্তু এই সমস্তেরই প্রতিক্রিয়া হয় পরস্পরের উপরে এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেও। এমন নয় যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই **একমাত্র সক্রিয় কারণ**, আর বাকি সব কিছু শুধু অক্রিয় ফল। বরং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে, যা **শেষ পর্যন্ত** সবসময়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন, রাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করে রক্ষণমূলক শুল্কহার, অবাধ বাণিজ্য, ভালো অথবা মন্দ অর্থ-ব্যবস্থা দিয়ে; এবং এমন কি ১৬৪৮ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত জার্মানির শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং প্রথমে অত্যধিক

* জাড্যবশে। — সম্পাঃ

ধার্মিকপনা (১৩৯) ও তারপরে ভাবপ্রবণতা এবং রাজন্য ও অভিজাতদের প্রতি গোলামসুলভ দাস্যভাবের মধ্যে অভিব্যক্ত জার্মান ফিলিস্টাইনের মারাত্মক অবসাদ আর অক্ষমতাও অর্থনৈতিক ফলবিহীন ছিল না। রোগারোগ্যের পথে সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এবং বৈপ্লবিক ও নেপোলিয়নীয় যুদ্ধগুলি এই পুরনো ব্যাধিকে যতদিন পর্যন্ত জটিল ব্যাধিতে পরিণত করে নি, ততদিন পর্যন্ত তা ঝেড়ে ফেলা যায় নি। তাই, লোকে এখানে-ওখানে সুবিধাজনকভাবে যেমনটি কল্পনা করে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যাপারটা তেমন নয় যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একটা স্বতোৎসারিত ফল প্রসব করে। তা নয়। মানুষ নিজেরাই তাদের ইতিহাস সৃষ্টি করে, তবে তারা তা করে এক নির্দিষ্ট পরিবেশে, যে-পরিবেশ তাকে শর্তাবদ্ধ করে, এবং ইতিমধ্যেই বিদ্যমান প্রকৃত সম্পর্কের ভিত্তিতে, যার মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কই- রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সম্পর্কের দ্বারা তা যতই প্রভাবিত হোক না-কেন---শেষ পর্যন্ত নিয়ামক সম্পর্ক, সেটাই হয় সেগুলির ভিতরকার মূল সুর এবং একমাত্র সেটাই উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়।

খ) মানুষ নিজেরাই তাদের ইতিহাস সৃষ্টি করে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এক যৌথ পরিকল্পনা অনুযায়ী, যৌথ ইচ্ছা নিয়ে নয় কিংবা এক নির্দিষ্ট গণ্ডিবদ্ধ বিশেষ সমাজেও নয়। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সংঘাত বাধে এবং সেই কারণেই এরূপ সমস্ত সমাজ **প্রয়োজন**-শাসিত, যার পরিপূরক ও চেহারার ধরন হল **আকস্মিক ব্যাপার**। যে প্রয়োজন সমস্ত আকস্মিক ব্যাপারের বিপরীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাও আবার শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রয়োজন। এখানেই তথাকথিত মহামানবদের কথা ওঠে। অমুক মানুষ এবং ঠিক সেই মানুষটিই যে এক বিশেষ দেশে এক বিশেষ সময়ে আবির্ভূত হয়, সেটা পুরোপুরি আকস্মিক। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে দেখুন, একটি প্রতিকল্পের জন্য দাবি উঠবে, এবং এই প্রতিকল্প পাওয়া যাবে, ভালো হোক মন্দ হোক শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া যাবেই। নিজের যুদ্ধবিগ্রহে শ্রান্ত ফরাসী প্রজাতন্ত্র যাকে প্রয়োজনে পরিণত করেছিল সেই নেপোলিয়ন, ঠিক সেই বিশেষ কর্সিকানটিই যে সামরিক একনায়ক হলেন, সেটা আকস্মিক ঘটনা; কিন্তু একজন নেপোলিয়নের অভাব ঘটলে আরেকটি যে সেই স্থান পূর্ণ করত সেকথা প্রমাণ হয় এই ঘটনায় যে দরকার হলেই মানুষটিকে

সব সময়ে পাওয়া গেছে: সিজার, অগাস্টস, ক্রমওয়েল প্রভৃতি। মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী তত্ত্ব আবিষ্কার করলেও, তিয়েরি, মিনিয়ে, গিজো এবং ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজি ইতিহাসবেত্তাই এই কথার সাক্ষ্য যে তার জন্য অন্বেষা চলছিল, এবং মর্গান কর্তৃক একই তত্ত্বের আবিষ্কার একথাই প্রমাণ করে যে তার উপযুক্ত সময় হয়েছিল এবং তা আবিষ্কার করতেই হত।

ইতিহাসের অন্য সমস্ত আকস্মিক ব্যাপার, এবং আপাত-আকস্মিক ব্যাপারের ক্ষেত্রেও তাই। যে বিশেষ ক্ষেত্রটি নিয়ে আমরা অনুসন্ধান চালাচ্ছি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সেটিকে যত দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং যত বেশি তা বিশুদ্ধ বিমূর্ত মতাদর্শের ক্ষেত্রের কাছাকাছি আসবে ততই বেশি করে তার বিকাশের ক্ষেত্রে আকস্মিক ব্যাপারের পরিচয় পাব, তার বক্ররেখাটি তত বেশি সর্পিল হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি বক্ররেখাটির গড় অক্ষরেখা আঁকেন তাহলে দেখতে পাবেন যে বিবেচনাধীন কালপর্বটি যত দীর্ঘ হবে এবং আলোচ্য ক্ষেত্রটি যত বিস্তৃত হবে, এই অক্ষরেখাটি তত বেশি করে অর্থনৈতিক বিকাশের অক্ষরেখার কাছাকাছি হয়ে দাঁড়াবে, তত বেশি করে তার সমান্তরাল হয়ে দাঁড়াবে।

জার্মানিতে সঠিক উপলব্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল অর্থনৈতিক ইতিহাসবিষয়ক সাহিত্যের দায়িত্বহীন অবহেলা। স্কুলে ইতিহাস-বিষয়ে যেসব ধারণা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সেই অভ্যস্ত ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করাই যে শুধু কঠিন কাজ তাই নয়, তা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতে নেওয়াও আরও কঠিন কাজ। যেমন, কেই বা অন্তত বৃদ্ধ গ. ফন গুলিখের রচনা পড়েছে, যার নিরস উপকরণ সংকলনে (১৪০) সব কিছু সত্ত্বেও অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যার উপযোগী প্রচুর মালমশলা আছে!

বাকি বিষয় সম্পর্কে, 'অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার'* গ্রন্থে মার্কস যে সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, আমার মনে হয়, তাই আপনার প্রশ্ন সম্পর্কে আপনাকে বেশ ভালো তথ্য যোগাবে, কারণ সেটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয়, আমিও 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', প্রথম অংশ, অধ্যায় ৯-১১ ও দ্বিতীয় অংশ,

---

* এই সংস্করণের ৪র্থ খন্ডের ১২-১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অধ্যায় ২-৪, তথা তৃতীয় অংশ, অধ্যায় ১-এ কিংবা ভূমিকায় এবং তাছাড়া 'ফয়েরবাখ'-এর* শেষাংশেও বেশির ভাগ বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছি।

দয়া করে উপরের প্রতিটি কথা অতিরিক্ত মাত্রায় খুঁটিয়ে ওজন করে দেখবেন না, তবে সাধারণ সম্পর্কটা মনে রাখবেন; আমি দুঃখিত যে, আপনাকে যা লিখছি, সেটা প্রকাশের জন্য লিখলে ঠিক যেভাবে লিখতে আমি বাধ্য হতাম সেরকম যথাযথভাবে লেখার সময় আমার নেই...

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

বার্লিনে ভার্নার জম্বার্ট সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১১ মার্চ, ১৮৯৫

প্রিয় মহাশয়,

আপনার গত মাসের ১৪ তারিখের লিপির জবাব দিতে গিয়ে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই মার্কস সম্পর্কে আপনার রচনাটি দয়া করে আমাকে পাঠানোর জন্য; ইতিমধ্যেই এটি আমি পরম কৌতূহলভরে *Archiv*-এ (১৪১) পড়েছিলাম, ডঃ হ. ব্রাউন কৃপা করে সেটি পাঠিয়েছিলেন, একটি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পুঁজি' সম্পর্কে এরূপ উপলব্ধি দেখতে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। মার্কসের ব্যাখ্যানকে আপনি যে-ভাষায় উপস্থিত করেছেন, স্বভাবতই আমি তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারি না। বিশেষ করে ৫৭৬ ও ৫৭৭ পৃষ্ঠায় মূল্যের ধারণার যে সংজ্ঞার্থ আপনি দিয়েছেন, আমার কাছে তা রীতিমতো সর্বব্যাপী বলে মনে হয়েছে: আমি একমাত্র সেই অর্থনৈতিক পর্যায়ের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে সেগুলিকে সীমাবদ্ধ করে প্রথমে ঐতিহাসিকভাবে সেগুলিকে সীমিত করতে চাই, যে অর্থনৈতিক পর্যায়ে এখন পর্যন্ত মূল্য পরিজ্ঞাত এবং একমাত্র যেখানে পরিজ্ঞাত হতে

* এই সংস্করণের ১০ম খণ্ডের ১৩৬-১৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

পারে, যথা সমাজের যেসব ধরনের মধ্যে **পণ্যসামগ্রী বিনিময়,** অথবা পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের অস্তিত্ব আছে। আদিম সাম্যবাদে মূল্যে ছিল অপরিজ্ঞাত। এবং দ্বিতীয়ত আমার মনে হয় যে, ধারণাটি সংকীর্ণতর অর্থেও সংজ্ঞায়িত করা যায়। কিন্তু তাতে বহুদূর এগিয়ে যেতে হয়, মোটামুটি আপনি ঠিকই লিখেছেন।

তারপরে অবশ্য, ৫৮৬ পৃষ্ঠায় আপনি সরাসরি আমার উদ্দেশে আবেদন করেছেন, এবং যে খোশমেজাজে আমার মাথার উপরে একটি পিস্তল উদ্যত করে রেখেছেন তাতে আমার হাসি পেয়েছে। কিন্তু আপনার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, আমি আপনাকে 'বিপরীত বুঝিয়ে দেব না'। বিভিন্ন পুঁজিবাদী উদ্যোগে উৎপন্ন $\frac{m}{c} = \frac{m}{c+v}$ -এর বিভিন্ন রাশি থেকে মুনাফার সাধারণ ও সমান হার মার্কস যে যুক্তিসংগত পারম্পর্য দিয়ে বার করেছেন, একজন পুঁজিপতির মনে তা সম্পূর্ণরূপে অজানা। যেহেতু তার একটা ঐতিহাসিক সদৃশতা থাকে, অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত আমাদের মস্তিষ্কের বাইরে বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাকে, তার প্রকাশ ঘটে যেমন এই ঘটনায় যে, মুনাফার হারের অতিরিক্ত, অথবা মোট উদ্বৃত্ত মূল্যে তার অংশের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতি ক উৎপন্ন করে, তার একটা অংশ চলে যায় পুঁজিপতি খ-র পকেটে, তার উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন normaliter* লভ্যাংশের নিচে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ঘটে বিষয়গতভাবে, বস্তুনিচয়ের মধ্যে, অচেতনভাবে, এবং এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত উপলব্ধি অর্জন করার জন্য কতখানি কাজ প্রয়োজন হয়েছিল আমরা এখনই শুধু তা অনুমান করতে পারি। মুনাফার গড় হার স্থির করার জন্য এক একজন পুঁজিপতির **সচেতন** সহযোগিতা যদি দরকার হত, একজন পুঁজিপতি যদি **জানত** যে সে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করে এবং কতখানি করে, এবং প্রায়শই তাকে তার উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ হস্তান্তরিত করে দিতে হয়, তাহলে উদ্বৃত্ত মূল্য ও মুনাফার মধ্যেকার সম্পর্কটা গোড়া থেকেই রীতিমতো স্পষ্ট হয়ে থাকত এবং পেটি না হোক, অ্যাডাম স্মিথ হয়তো ইতিমধ্যেই তা বর্ণনা করতেন।

---

* সাধারণত রীতিগত। — সম্পাঃ

মার্কসের অভিমত অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসই, বড় বড় ঘটনার ক্ষেত্রে, ঘটেছে অচেতনভাবে, অর্থাৎ ঘটনাবলী ও তার পরবর্তী পরিণাম অভীপ্সিত নয়; ইতিহাসে সাধারণ নটরা হয় আলাদা কিছু অর্জন করতে চেয়েছিল, না হয় যা তারা অর্জন করেছিল তার ফলে ঘটেছে রীতিমতো আলাদা অদৃশ্যপূর্ব পরিণতি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে: এক একজন পুঁজিপতি, প্রত্যেকে নিজের মতো করে, **সর্বাধিক** মুনাফার পিছনে ছোটে। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র আবিষ্কার করে যে, প্রত্যেকে যেখানে **অধিকতর** মুনাফার পিছনে ছোটে সেই প্রতিযোগিতার ফল হয় মুনাফার সাধারণ ও **সমান** হার, প্রত্যেকের জন্য মুনাফার প্রায় **সমান** অনুপাত। কিন্তু পুঁজিপতিরা কিংবা বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা কেউই উপলব্ধি করে না যে এই প্রতিযোগিতার প্রকৃত লক্ষ্য হল মোট পুঁজির ভিত্তিতে হিসাব-করা মোট উদ্বৃত্ত মূল্যের সমরূপ আনুপাতিক বণ্টন।

কিন্তু বাস্তবে এই সমান-করণ কীভাবে সংঘটিত হয়েছে? বিষয়টি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, এ সম্পর্কে মার্কস নিজে বেশি কিছু বলেন নি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি [Auffassungsweise] তো তত্ত্বকথা নয়, তা একটা পদ্ধতি। তৈরি কোনো আপ্তবাক্য তা যোগায় না, যোগায় অধিকতর গবেষণার মানদন্ড এবং এই গবেষণার **জন্য** পদ্ধতি। সুতরাং, এখানে কিছু পরিমাণ কাজ করতে হবে, কারণ মার্কস তাঁর প্রথম খসড়ায় নিজে তা বিশদ করেন নি। প্রথমেই এখানে আমরা পাচ্ছি পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৬, ৩য় খন্ড, ১-এর বক্তব্য, আপনার মূল্য বিষয়ক ধারণা উপস্থাপনের পক্ষেও যা গুরুত্বপূর্ণ এবং যা প্রমাণ করে যে ধারণাটিতে আপনি যতখানি আরোপ করেছেন তার চাইতে বেশি বাস্তবতা আছে অথবা ছিল। পণ্যসামগ্রী বিনিময় যখন শুরু হয়েছিল, উৎপন্ন দ্রব্য যখন ক্রমে ক্রমে পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হয়েছিল তখন সেগুলি বিনিময় করা হত মোটামুটি **তাদের মূল্য অনুযায়ী**। দুটি বস্তুতে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণই তাদের মূল্যের গুণগত তুলনায় একমাত্র মানদন্ড যুগিয়েছিল। এইভাবে সেই সময়ে মূল্যের ছিল এক **প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অস্তিত্ব**। আমরা জানি যে বিনিময়ের মধ্যে মূল্যের এই প্রত্যক্ষ রূপায়ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং এখন আর তা ঘটে না। এবং আমার মনে হয়, মধ্যবর্তী যে যোগসূত্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃত মূল্য থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালীর

মূল্যের দিকে যায় সেই যোগসূত্রগুলি, অন্তত সাধারণ রূপরেখায়, খুঁজে বার করা আপনার পক্ষে বিশেষ কঠিন হবে না; তা এত সম্পূর্ণভাবে গুপ্ত যে আমাদের অর্থনীতিবিদরা শান্তভাবে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার সত্যকার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যানের জন্য সত্যিই পুঙখানুপুঙখ গবেষণার প্রয়োজন, অথচ প্রতিদানে রীতিমতো সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই ব্যাখ্যান হবে 'পুঁজি'-র (১৪২) অতি মূল্যবান সম্পূরণ।

সব শেষে, তৃতীয় খণ্ডটিকে আমি আরও ভালো কিছু করতে পারতাম, এই কথা মনে করে আমার সম্পর্কে আপনি যে উচ্চ ধারণা তৈরি করেছেন তার জন্য আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানাতেই হয়। আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, আমি মনে করি মার্কসকে মার্কসের ভাষায় উপস্থিত করে আমি আমার কর্তব্য করেছি, এমন কি পাঠকের পক্ষে নিজের আরেকটু বেশি চিন্তা করার দরকার হবে এই ঝুঁকি নিয়েও...

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

(১) 'ইতিহাসে বলপ্রয়োগের ভূমিকা' পুস্তিকাকারে এঙ্গেলস প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন; তাঁর 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের তিনটি অধ্যায়ের পরিমার্জিত রূপ নিয়ে 'বলপ্রয়োগ তত্ত্ব' — এই একটি শিরোনামা থাকার কথা ছিল, আর বর্তমান রচনাটি হত চতুর্থ অধ্যায়। বিসমার্কের কর্মনীতির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ হিসেবে পুস্তিকাটি প্রকাশ করার অভিপ্রায় ছিল, তাতে ১৮৪৮ সালের পরবর্তী জার্মান ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক বিষয়ে 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'য়ের তত্ত্বগত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য দেখানো হত। এই অসমাপ্ত অধ্যায়টিতে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত জার্মানির ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জার্মানির একীকরণ যে-পথে অর্জন করা যেত তার এক সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে 'উপর থেকে' যেভাবে তার একীকরণ হয়েছিল তার কারণ 'ইতিহাসের বলপ্রয়োগের ভূমিকা'-য় দেওয়া হয়েছে। সেই একীকরণ এইভাবে অগ্রসর হলেও তার প্রগতিশীল চরিত্র স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে এঙ্গেলস বিসমার্কের কর্মনীতির ঐতিহাসিক অদূরদর্শিতা ও বোনাপার্টবাদ উদ্‌ঘাটিত করেছেন, এই কর্মনীতি জার্মানিকে করে তুলেছিল এক পুলিসি রাষ্ট্র এবং য়ুঙ্কারদের শাসন ও সমরবাদ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। নিজ স্বার্থ রক্ষায় অক্ষম ও সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলির চূড়ান্ত বিলুপ্তিসাধনে অক্ষম জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্থিরসংকল্পতা ও কাপুরুষতা এঙ্গেলস উদ্‌ঘাটিত করেছেন। জার্মানির শাসক শ্রেণীগুলির যে সমরপ্রিয় বৈদেশিক নীতি ১৮৭১ সালে ফ্রান্স লুণ্ঠন এবং অ্যালসেস ও লোরেন দখলের মধ্যে চরম সীমায় গিয়ে পেঁৗছেছিল এঙ্গেলস তারও তীব্র সমালোচনা করেছেন। জার্মান সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক পরিস্থিতি ও সেখানকার শ্রেণী-শক্তিগুলির বিন্যাস বিশ্লেষণ করে, সূচনালগ্ন থেকেই তার মধ্যে বিদ্যমান আভ্যন্তরিক বিরোধ, তার সমরবাদী ও আগ্রাসী প্রয়াসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে

এঙ্গেলস এই সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। এঙ্গেলসের রচনাটি সুস্পষ্টভাবে দেখায় যে জার্মানিতে একটিই মাত্র শ্রেণী — প্রলেতারিয়েত — সামগ্রিকভাবে জনগণের অকৃত্রিম জাতীয় স্বার্থের প্রতিভূর ভূমিকা দাবি করতে পারে। পৃঃ ৭

(২) ১৮১৪-১৮১৫ সালে অনুষ্ঠিত ভিয়েনা কংগ্রেসে ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের তিন শরিক, তথা অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড এবং জারতন্ত্রী রাশিয়া ইউরোপীয় মানচিত্রের এক নতুন রূপ দেয়; এর উদ্দেশ্য ছিল আইনসম্মতভাবে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সন্দেহ নেই যে এ উদ্দেশ্যটি ছিল জাতীয় ঐক্য আর জাতিসমূহের স্বাধীনতার পরিপন্থী। পৃঃ ৭

(৩) **ফেডারেল ডায়েট** (বুন্ডেস্টাগ) — ৮ জুন, ১৮১৫ তারিখের ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত জার্মান কনফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সংস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক-সার্বভৌম শাসনতন্ত্রবাদী জার্মান রাষ্ট্রগুলির ইউনিয়ন। এর সভা অনুষ্ঠিত হত ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইনে। এটি ছিল জার্মান সরকারগুলির প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি রূপায়ণের সহায়ক। ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে কনফেডারেশন ভেঙে যাওয়ার পর ডায়েটের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮৫০ সালে জার্মান কনফেডারেশন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে আবার কাজ শুরু করে। ১৮৬৬-র অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময়ে কনফেডারেশনের অস্তিত্ব চিরতরে শেষ হয়ে যায়। তার জায়গায় আসে উত্তর জার্মান কনফেডারেশন। পৃঃ ৮

(৪) **'উন্মাদ বছর'** ('das tolle Jahr') — প্রতিক্রিয়াশীল কোনো কোনো জার্মান লেখক ও ইতিহাসবেত্তা ১৮৪৮ সালটিকে এই নামেই অভিহিত করেছিলেন। ১৫০৯ সালের এরফুর্ট হাঙ্গামার বর্ণনা দিয়ে এই নামেরই একটি উপন্যাসে লুডভিগ বেখস্টাইন কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৮৩৩ সালে।

পৃঃ ৯

(৫) ১৮৪৮ সালে কালিফোর্নিয়ায় ও ১৮৫১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় নতুন স্বর্ণসঞ্চয় আবিষ্কারে বিশ্ব বাণিজ্যের উপরে যে-প্রভাব পড়েছিল, এখানে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ৯

(৬) ধর্মসংস্কারের (১২১ নং টীকা দ্রষ্টব্য) ৩০০তম বার্ষিকী ও ১৮১৩ সালের লাইপজিগ যুদ্ধের ৪র্থ বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য ১৮ অক্টোবর, ১৮১৭ তারিখে জার্মান ছাত্র-সমিতিগুলি (বুরশেনশাফ্‌ট) **ভার্টবুর্গ উৎসবের** আয়োজন করেছিল। এই উৎসব পরিণত হয়েছিল মেটেরনিখের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে ও জার্মানির একীকরণের সপক্ষে এক ছাত্র-মিছিলে। পৃঃ ১১

(৭) **হামবাখ উৎসব**—ব্যাভেরীয় পেলট্‌নেটের হামবাখ প্রাসাদের কাছে ২৭ মে, ১৮৩২ তারিখে অনুষ্ঠিত জার্মান উদারপন্থী ও র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সংগঠিত এক রাজনৈতিক মিছিল। অংশগ্রহণকারীরা বুর্জোয়া অধিকার ও সাংবিধানিক সংস্কারের নামে জার্মান সার্বভৌমদের বিরুদ্ধে সমস্ত জার্মানের ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিল। পৃঃ ১২

(৮) **ত্রিশ বছরের যুদ্ধ** (১৬১৮-১৬৪৮)—প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে সংগ্রামজনিত সারা-ইউরোপীয় যুদ্ধ। জার্মানি ছিল সেই যুদ্ধের প্রধান রণক্ষেত্র। লুণ্ঠনের ফলে তার প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল এবং যুধ্যমান পক্ষগুলির রাজ্যগ্রাসমূলক দাবির লক্ষ্য হয়েছিল সে। ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফালিয়া শান্তি সন্ধি স্বাক্ষরে পর যুদ্ধের পরিমাপ্তি ঘটে, এই সন্ধির ফলে জার্মানির রাজনৈতিক বিভাগ পাকাপাকি হয়। পৃঃ ১৩

(৯) **টেশেন শান্তি**—এক দিকে অস্ট্রিয়া এবং অন্য দিকে প্রাশিয়া ও স্যাক্সনির মধ্যে ২৪ মে, ১৭৭৯ তারিখে টেশেনে স্বাক্ষরিত শান্তি সন্ধি। ব্যাভেরীয় উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটে এই সন্ধিতে (১৭৭৮-১৭৭৯)। এই সন্ধি অনুসারে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া ব্যাভেরিয়ার কিছুটা ভূখণ্ড দখল করে নেয়, আর স্যাক্সনি পায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ। রাশিয়া কাজ করেছিল মধ্যস্থ হিসেবে এবং ফ্রান্সের সঙ্গে মিলে সন্ধির নিশ্চিতিদাতা হিসেবে। পৃঃ ১৩

(১০) **ডেপুটিবৃন্দের সাম্রাজ্যিক কমিটি** — জার্মান জাতির পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এক কমিশন। অক্টোবর,১৮০১-এ রাইখস্টাগ এই কমিটি নির্বাচিত করে। ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রতিনিধিদের (এরা অক্টোবর, ১৮০১-এ নেপোলিয়নীয় ফ্রান্সের স্বার্থে রেনিশ জার্মানির ভূখণ্ড-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এক গোপন কনভেনশন স্বাক্ষর করেছিল) চাপের ফলে কমিটি দীর্ঘ আলোচনার পর ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৩ তারিখে ১১২টি জার্মান রাষ্ট্র ভেঙে দেওয়া সম্পর্কে এবং তাদের সম্পত্তির একটা বড় অংশ ব্যাভেরিয়া, ভ্যুর্টেমবের্গ, বাডেন ও প্রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়া সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জার্মান জাতির পবিত্র রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৯৬২ সালে। এর আওতায় ছিল জার্মানি এবং ইতালির কিছু অংশ। পরবর্তীকালে এই সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ফ্রান্সের কিছু অঞ্চল, চেকিয়া, অস্ট্রিয়া এবং অন্য আরো কয়েকটি দেশ। গঠনের দিক থেকে সাম্রাজ্যটি কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্রের মতো ছিল না; এটি ছিল কিছু সামন্ত রাজ আর স্বাধীন শহরের নড়বড়ে এক যৌথ সংগঠন, যারা সম্রাটের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ বলে মেনে নিয়েছিল। এই

সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পায় ১৮০৬ সালে, যখন হাপস্‌বুর্গেরা ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হবার পর পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটের উপাধি পরিত্যাগ করতে হয়। পৃঃ ১৩

(১১) জার্মান রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সংস্থা — **রাইখস্টাগে** জার্মান রেনিশ ভূখণ্ড-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা ও সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদনের কথা এখানে বলা হয়েছে (১০ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৬৬৩ সাল থেকে রাইখস্টাগ আহূত হত রেগেনসবুর্গে। পৃঃ ১৩

(১২) **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** বা **১৮৫৩-১৮৫৬ সালের প্রাচ্যদেশের যুদ্ধ** — এটি হল এক দিকে তুরস্ক, ইংলন্ড, ফ্রান্স, সার্দিনিয়া রাজত্ব এবং অন্য দিকে রাশিয়ার মধ্যেকার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়। যুদ্ধ শেষ হয় ১৮৫৬ সালে প্যারিস শান্তি সন্ধি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। এই সন্ধি অনুসারে রাশিয়া মোল্‌দাভীয় রাজ্যকে কিছু জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় আর কৃষ্ণ সাগরকে নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়, ইত্যাদি। পৃঃ ১৫

(১৩) রাশিয়া ও ফ্রান্স ৩ মার্চ, ১৮৫৯ তারিখে প্যারিসে যে গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, এঙ্গেলস তার কথা উল্লেখ করেছেন; এই চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও সার্দিনিয়ার যুদ্ধ বাধলে রাশিয়া সদাশয় নিরপেক্ষতার অবস্থান রক্ষা করার কথা দেয়। ফ্রান্স তার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব সীমিত করে ১৮৫৬ সালের প্যারিস শান্তি সন্ধির ধারাগুলি সংশোধন করার প্রশ্ন সে তুলবে। পৃঃ ১৬

(১৪) এখানে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর ফ্রান্সে লুই বোনাপার্টের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কু দে'তার কথা বলা হচ্ছে, যার ফলে বোনাপার্টপন্থী দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের (১৮৫২-১৮৭০) অস্তিত্ব সূচিত হয়। পৃঃ ১৬

(১৫) এঙ্গেলস লুই বোনাপার্টের জীবনীর নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির কথা উল্লেখ করছেন — জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রয়াসে লুই বোনাপার্ট বিভিন্ন বিরোধী পার্টির, বিশেষত ইতালীয় কারবোনারির আস্থা লাভের চেষ্টা করেন, ১৮৩২ সালে তিনি সুইশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন; ৩০ অক্টোবর, ১৮৩৬ তারিখে দুটি গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়নের সহায়তায় তিনি স্ত্রাসবুর্গে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা করেন; ১৮৪৮ সালে, ইংলন্ডে অবস্থানকালে লুই বোনাপার্ট ব্রিটিশ পুলিসবাহিনীর অসামরিক সংরক্ষিত অংশের সদস্য — বিশেষ কনস্টেবল

হন, ১০ এপ্রিল ১৮৪৮ তারিখে চার্টিস্ট বিক্ষোভমিছিল ভাঙতে এরা সাহায্য করেছিল। পৃঃ ১৬

(১৬) এঙ্গেলস যে 'জাতিসংক্রান্ত নীতি' কথাটি ব্যবহার করেছেন তাতে বোনাপার্টপন্থী দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের (১৮৫২-১৮৭০) শাসক শ্রেণীগুলির বৈদেশিক নীতির অন্যতম অন্তর্নিহিত মূলনীতি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যগ্রাসের দুরভিসন্ধি ও বৈদেশিক রাজনৈতিক অপপ্রয়াসের একটা মতাদর্শগত আবরণ হিসেবে বড় বড় রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীগুলি তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত। জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতির সঙ্গে এর কোনোই মিল ছিল না, 'জাতিসংক্রান্ত নীতির' উদ্দেশ্য ছিল জাতিগত বিবাদে ইন্ধন যোগানো, জাতীয় আন্দোলনকে, বিশেষ করে ছোট ছোট জাতির জাতীয় আন্দোলনকে প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির প্রতিবিপ্লবী রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করা।

পৃঃ ১৭

(১৭) ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮০১ তারিখে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সম্পাদিত **লুনেভিল শান্তি সন্ধিতে** নির্ধারিত ফ্রান্সের সীমানার কথা এখানে বলা হয়েছে। ফ্রান্সের সীমানার বিস্তৃতি, বিশেষ করে রাইন নদীর বামতীর, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ দখলকে শান্তি সন্ধিতে বিধিবদ্ধ করা হয়। পৃঃ ১৭

(১৮) প্যারিসে ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, সার্দিনিয়া, প্রাশিয়া ও তুরস্কের প্রতিনিধিদের সম্মেলনের কথা এখানে বলা হয়েছে; এই সম্মেলনের শেষে ৩০ মার্চ, ১৮৫৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয় প্যারিস শান্তি সন্ধি, এবং অবসান হয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৩-১৮৫৬)। পৃঃ ১৮

(১৯) এখানে **ইতালীয় যুদ্ধের** কথা বলা হচ্ছে। এ যুদ্ধ ঘটে ১৮৫৯ সালে এক দিকে অস্ট্রিয়া আর অন্য দিকে ফ্রান্স ও পিয়েমোঁর মধ্যে। এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করা চলে তৃতীয় নেপোলিয়নকে, যিনি বুঝি বা ইতালির মুক্তির জন্য এ যুদ্ধ শুরু করেছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অন্য দেশের অঞ্চল দখল করা এবং ফ্রান্সে বোনাপার্ট সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করা। তবে ইতালিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিপুল আকার দেখে ভীত হয়ে এবং সেখানকার রাজনৈতিক ফাটল বজায় রাখার প্রয়াসে তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে এক শান্তি সন্ধি সমাপন করেন। যুদ্ধের ফল হিসেবে ফ্রান্স পায় স্যাভয় আর নীস্। লম্বার্দি সংযুক্ত হয় সার্দিনিয়ার সঙ্গে, ভেনিস থেকে যায় অস্ট্রিয়ার শাসনের আওতায়। পৃঃ ১৮

(২০) ১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(২১) **১৭৯৫-এর বাসেল শান্তি** ছিল প্রাশিয়া ও ফরাসী প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ৫ এপ্রিল তারিখে স্বাক্ষরিত এক পৃথক সন্ধি। এর দ্বারা প্রাশিয়া প্রথম ফরাসী-বিরোধী কোয়ালিশনে তার মিত্রদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। পৃঃ ১৯

(২২) অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও পিয়েমোঁর যুদ্ধের সময় প্রুশীয় বৈদেশিক মন্ত্রী ফন শ্লেইনিৎস ১৮৫৯ সালে প্রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য এই ভাষাতেই বর্ণনা করেছিলেন। এই নীতি ছিল যুধ্যমান কোনো পক্ষেই যোগ না-দেওয়া, অথচ নিরপেক্ষতা ঘোষণা করতেও সম্মত না-হওয়া। পৃঃ ১৯

(২৩) এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ১৮৫২ সালে স্থাপিত একটা বিরাট ফরাসী ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন — Société Générale du Crédit Mobilier-এর কথা। ব্যাঙ্কের আয়ের প্রধান উৎস ছিল সরকারী জামানত নিয়ে ফাটকাবাজি। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সরকারী মহলগুলির সঙ্গে Crédit Mobilier ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। ১৮৬৭ সালে এটি দেউলিয়া হয়ে যায় এবং ১৮৭১ সালে উঠে যায়। পৃঃ ১৯

(২৪) **রেনিশ কনফেডারেশন** ছিল প্রথম নেপোলিয়নের আশ্রিত দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানির রাষ্ট্রগুলির একটি ইউনিয়ন, এটি গঠিত হয়েছিল জুলাই, ১৮০৬-তে। কনফেডারেশনের মধ্যে ছিল কুড়িটির বেশি রাষ্ট্র, এগুলি ছিল কার্যত ফ্রান্সের সামন্ত। নেপোলিয়নের বাহিনীর পরাজয়ের ফলে ১৮১৩ সালে এই কনফেডারেশন ভেঙে যায়। পৃঃ ২০

(২৫) এখানে প্রধানত ফরাসী সীমান্তের কাছে অবস্থিত জার্মান কনফেডারেশনের দুর্গগুলির কথা বলা হয়েছে (কনফেডারেশন সম্পর্কে ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য)। এই দুর্গগুলির গ্যারিসনে ছিল কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির ফৌজ, প্রধানত অস্ট্রীয় ও প্রুশীয় সৈন্য। পৃঃ ২২

(২৬) ভিয়েনায় ১৩ মার্চ, ১৮৪৮ তারিখে জনগণের অভ্যুত্থানে যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার পরাজয়ের পর নভেম্বর, ১৮৪৮-এ গঠিত প্রিন্স শোয়ারৎসেনবের্গের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ২২

(২৭) **'রিয়্যালপলিটিক'** কথাটি ব্যবহার করা হত বিসমার্কের নীতি বর্ণনা করার জন্য; তাঁর সমসাময়িকেরা মনে করতেন এই নীতি সুবিবেচনাপ্রসূত। পৃঃ ২৩

(২৮) ডিসেম্বর, ১৭৪০-এ তৎকালীন অস্ট্রীয় শাসনাধীন সাইলেসিয়ার উপরে দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের আক্রমণের কথা বলা হয়েছে। পৃঃ ২৩

(২৯) ১৪ অক্টোবর, ১৮০৬ তারিখে প্রুশীয় বাহিনী ফরাসী বাহিনীর হাতে একসঙ্গে পরাস্ত হয় দুটি যুদ্ধে — **ইয়েনা ও আউয়েরস্টেড্‌টে;** এর ফলে প্রুশীয় রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। পৃঃ ২৪

(৩০) *Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe* ('রাজনীতি, বাণিজ্য আর শিল্প-সংক্রান্ত রেনিশ গেজেট') —১৮৪২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮৪৩ সালের মার্চ পর্যন্ত কলোনে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র। মার্কস ও এঙ্গেলস এই সংবাদপত্রে লিখতেন। ১৮৪২ সালের অক্টোবর থেকে মার্কস এর অন্যতম সম্পাদক হন। পৃঃ ২৫

(৩১) **ল্যান্ডভের** (Landwehr) — নেপোলিয়নের সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য জনগণের স্বেচ্ছাব্রতী বাহিনী হিসেবে ১৮১৩ সালে প্রাশিয়ায় গঠিত প্রুশীয় স্থলবাহিনীর অংশ। স্বেচ্ছাব্রতীদের বয়স অনুযায়ী একে ব্যবহার করা হত রণক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য অথবা গ্যারিসনে কাজের জন্য। পৃঃ ২৬

(৩২) **'কুলটুরকাম্‌ফ'** ('সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম') —১৯শ শতকের অষ্টম দশকে বিসমার্ক সরকার আইনসংক্রান্ত যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে, সেগুলিকে বুর্জোয়া উদারপন্থীরা এই নামে অভিহিত করে। এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সুউচ্চ সংস্কৃতির ধ্বনি তুলে। নবম দশকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে মিলন ঘটানোর প্রয়াসে বিসমার্ক এই ব্যবস্থার অধিকাংশই প্রত্যাহার করে নেন। পৃঃ ২৬

(৩৩) **অঞ্চল-মণ্ডূক উদারপন্থী** — স্বশাসিত কতকগুলি ক্যান্টন নিয়ে গঠিত সুইশ আদল অনুসরণে এক ফেডারেলধর্মী রাষ্ট্রে জার্মানির রূপান্তরের পক্ষপাতী উদারপন্থীদের কথা বলতে গিয়ে এঙ্গেলস ব্যঙ্গচ্ছলে এই কথাটি ব্যবহার করেছেন। পৃঃ ২৭

(৩৪) **ভ্রোস্টে-ফিশারিং** — বিদ্রূপাত্মক জার্মান লোকগাথার অন্যতম চরিত্র। পৃঃ ২৭

(৩৫) **১৮৪৮ সালের ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি** ফ্রান্সে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়; এর ফলে লুই ফিলিপের জুলাই রাজত্বের অবসান ঘটে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিজয়ের মাধ্যমেই শুরু হয় ১৮৪৮ সালের বিপ্লব।

১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে জার্মান রাষ্ট্রগুলি ও অস্ট্রিয়ায় বৈপ্লবিক অভিযান শুরু হয়। পৃঃ ২৮

(৩৬) **জুন অভ্যুত্থান** — ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুন প্যারিসের শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ

অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে। অতি নিষ্ঠুরভাবে এটিকে দমন করে ফরাসী বুর্জোয়ারা। এই অভ্যুত্থান হল প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ইতিহাসে প্রথম মহান গৃহযুদ্ধ। পৃঃ ২৮

(৩৭) নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৪৮-এ প্রাশিয়ায় কু দে'তা ও তার পরে প্রতিক্রিয়ার কালপর্বের কথা এখানে বলা হয়েছে। পৃঃ ২৮

(৩৮) *Der Sozialdemokrat* ('সোশ্যাল-ডেমোক্রাট') — জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র, জার্মান ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা। সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮ পর্যন্ত জুরিখ থেকে এবং অক্টোবর, ১৮৮৮ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ পর্যন্ত লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পৃঃ ২৯

(৩৯) ১৮৫৮ সালে অন্তর্বর্তীকালীন রাজপ্রতিনিধি প্রিন্স ভিলহেল্ম মানটুফেলের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নরমপন্থী উদারপন্থীদের ক্ষমতায় তুলে আনেন; বুর্জোয়া পত্রিকা-জগৎ ভণ্ডামি করে এই নীতিকে অভিহিত করে 'নবযুগ' বলে। প্রকৃতপক্ষে ভিলহেল্মের কর্মনীতির একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রুশীয় রাজতন্ত্র ও য়ুঙ্কারদের অবস্থান সুদৃঢ় করা। 'নবযুগ' বিসমার্কের একনায়কতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তিনি ক্ষমতায় আসেন সেপ্টেম্বর ১৮৬২-তে। পৃঃ ২৯

(৪০) সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত বিলটি ল্যান্ডটাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অনুমোদন করতে অস্বীকার করলে ফেব্রুয়ারি ১৮৬০-এ প্রুশীয় সরকার ও ল্যান্ডটাগের বুর্জোয়া-উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে তথাকথিত সাংবিধানিক বিরোধ বাধে। মার্চ, ১৮৬২-তে কক্ষের উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ যখন সামরিক ব্যয় অনুমোদন করতে আবার অস্বীকার করে, সরকার তখন ল্যান্ডটাগ ভেঙে দেয় এবং ঘোষণা করে যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেপ্টেম্বর, ১৮৬২-র শেষ দিকে গঠিত বিসমার্কের প্রতিবিপ্লবী মন্ত্রিসভা সেই বছরেরই অক্টোবর মাসে আবার ল্যান্ডটাগ ভেঙে দেয় এবং এক সামরিক সংস্কারকর্ম শুরু করে, ল্যান্ডটাগের অনুমোদন ছাড়াই এ জন্য অর্থ ব্যয় করে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার বিজয়ের পর বিসমার্কের কাছে প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্মসমর্পণের দরুন ১৮৬৬ সালে বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। পৃঃ ২৯

(৪১) হেসেন-এর ইলেক্টরেটে অস্ট্রো-ব্যাভেরীয় ফৌজের প্রবেশের জবাবে প্রুশীয় সরকার নভেম্বর, ১৮৫০-এর গোড়ার দিকে সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ দেয় এবং ইলেক্টরেটে তার ফৌজ পাঠায়। ৮ নভেম্বর তারিখে অস্ট্রো-ব্যাভেরীয় ও প্রুশীয় অগ্রবর্তী সৈন্যদলের মধ্যে ছোটখাট ধরনের এক সংঘর্ষ হয়, তাতে দেখা যায় যে প্রাশিয়ার সামরিক ব্যবস্থায় গুরুতর ত্রুটি আছে এবং তার

সেনাবাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম অচল। ফলে প্রাশিয়া সামরিক তৎপরতা থেকে বিরত থাকতে ও অস্ট্রিয়ার কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। পৃঃ ৩০

(৪২) ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইনে অনুষ্ঠিত বুর্জোয়া উদারপন্থীদের কংগ্রেসে ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ তারিখে গঠিত হয় **জাতীয় লীগ।** লীগের সংগঠকরা প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে অস্ট্রিয়া বাদে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্তব্যভার গ্রহণ করেন। ১১ নভেম্বর, ১৮৬৭ তারিখে উত্তর জার্মান কনফেডারেশন চালু হওয়ার পর লীগ ঘোষণা করে যে সেটি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। পৃঃ ৩১

(৪৩) প্যারিসে ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত লুই বোনাপার্টের 'নেপোলিয়নীয় ধ্যানধারণা' গ্রন্থটির কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে (নেপোলিয়ন — লুই বোনাপার্ট, 'Des idées napoléoniennes')। পৃঃ ৩২

(৪৪) ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৩ তারিখে, পোল্যান্ডে জাতীয় মুক্তি-অভ্যুত্থানের সময়ে রাশিয়া ও প্রাশিয়া অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সৈন্যবাহিনীর সম্মিলিত তৎপরতার ব্যবস্থা করে এক কনভেনশন স্বাক্ষর করেছিল। কনভেনশনটি স্বাক্ষরিত হওয়া আগে প্রুশীয় সৈন্যদের পাঠানো হয়েছিল সীমান্তে, শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, যাতে অভ্যুত্থানকারীদের প্রাশিয়ায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যায়। পৃঃ ৩৫

(৪৫) ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ১৬ জানুয়ারি, ১৮৬৪ তারিখে দিনেমার সরকারের কাছে এক চরমপত্র পাঠিয়ে দাবি করে যে, শ্লেজভিগের ডেনমার্কে চরম অন্তর্ভুক্তির কথা ঘোষণা করে ১৮৬৩ সালের যে সংবিধান রয়েছে তা বাতিল বলে ঘোষণা করা হোক। দিনেমার সরকার যখন এই চরমপত্র মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং জুলাই, ১৮৬৪-র মধ্যে দিনেমার ফৌজ পরাজিত হয়। ফ্রান্স ও রাশিয়া এই সংঘাত চলাকালীন অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতি সদাশয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। ৩০ অক্টোবর, ১৮৬৪ তারিখে ভিয়েনায় স্বাক্ষরিত শান্তি সন্ধি অনুযায়ী প্রধানত অ-জার্মানদের বসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলি সমেত ডাচিগুলির ভূখন্ডকে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুক্ত অধিকারভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়, আর ১৮৬৬-র অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের পর তার সমগ্রটাই চলে আসে প্রাশিয়ার দখলে। পৃঃ ৩৬

(৪৬) রাশিয়া ও ডেনমার্কের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত ৫ জুন, ১৮৫১ তারিখের **ওয়ারশ প্রটোকল** এবং দিনেমার প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, প্রাশিয়া ও সুইডেনের সম্মিলিতভাবে স্বাক্ষরিত ৮ মে, ১৮৫২ তারিখে

লণ্ডন প্রটোকলে শ্লেজভিগ ও হলস্টাইন ডাচি সহ দিনেমার রাজের অধিকৃত অঞ্চলগুলির অবিভাজ্যতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃঃ ৩৭

(৪৭) **মেক্সিকো অভিযান — ১৮৬২-১৮৬৭** সালে, প্রথম দিকে ব্রিটেন ও স্পেনের সঙ্গে যুক্তভাবে ফ্রান্সের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ; এর উদ্দেশ্য ছিল মেক্সিকোর বিপ্লব দমন এবং মেক্সিকোকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশে পরিণত করা। মেক্সিকোর জনগণের বীরত্বপূর্ণ মুক্তি-সংগ্রামের ফলে হস্তক্ষেপকারীদের পরাজয় ঘটে, তারা ১৮৬৭ সালে মেক্সিকো থেকে তাদের ফৌজ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। পৃঃ ৩৮

(৪৮) ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৪৯) প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাসবেত্তা ও লেখক হাইনরিখ লিও ১৮৫৩ সালে **'নবশক্তিদায়ক আনন্দময় যুদ্ধ'** কথাটি প্রবর্তন করেন, পরে তা একই সমরবাদী ও জাত্যভিমানী অর্থে ব্যবহৃত হত। পৃঃ ৩৯

(৫০) প্রুশীয় কর্তৃত্বাধীনে **উত্তর জার্মান কনফেডারেশন** ১৮৬৭ সালে গঠিত হয় বিসমার্কের প্রস্তাবক্রমে, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তর ও মধ্য জার্মানির ১৯টি রাষ্ট্র ও ৩টি স্বাধীন নগর। এই কনফেডারেশন গঠন প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে জার্মানির একীকরণের দিকে একটা বড় পদক্ষেপ ছিল। জানুয়ারি, ১৮৭১-এ জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ায় কনফেডারেশনের অবসান ঘটে। পৃঃ ৩৯

(৫১) এখানে ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। পৃঃ ৪০

(৫২) ১৮৬৬-র বসন্তকালে অস্ট্রিয়া ফেডারেল ডায়েটের (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য) কাছে অভিযোগ করে যে প্রাশিয়া শ্লেজভিগ ও হলস্টাইন ডাচির যুক্ত প্রশাসন-সংক্রান্ত চুক্তি লঙ্ঘন করেছে; বিসমার্ক ডায়েটের সিদ্ধান্ত পালন করতে অস্বীকার করেন, অস্ট্রিয়ার পীড়াপীড়িতে ডায়েট প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে প্রাশিয়ার সাফল্যগুলির দরুন ডায়েট ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইন থেকে অগসবুর্গে উঠে যেতে বাধ্য হয়। ২৪ অগস্ট, ১৮৬৬ তারিখে ডায়েট নিজের অবলুপ্তি ঘোষণা করে। পৃঃ ৪০

(৫৩) সাংবিধানিক বিরোধের সময়ে বৈধ ক্ষমতা ছাড়াই যে অর্থব্যয় করা হয়েছিল তার দায়িত্ব থেকে সরকারকে নিষ্কৃতি দেওয়া সম্পর্কে বিসমার্কের উত্থাপিত একটি খসড়া আইন সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬-তে প্রুশীয় প্রতিনিধি সভা গ্রহণ করে। (৪০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।) পৃঃ ৪৩

(৫৪) ৩ জ্বলাই, ১৮৬৬ তারিখে সাদোভা গ্রামের কাছে কনিগ্‌গ্রাৎসে অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের নিয়ামক লড়াইয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। সাদোভার লড়াইয়ে অস্ট্রীয়দের বিরাট পরাজয় ঘটেছিল। পৃঃ ৪৩

(৫৫) **উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান** ১৭ এপ্রিল, ১৮৬৭ তারিখে কনফেডারেশনের সংবিধান-রচনাকার রাইখস্টাগে অনুমোদিত হয়। কনফেডারেশনে প্রাশিয়ার কার্যত আধিপত্য মজবুত হয়। প্রুশীয় রাজা কনফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট ও ফেডারেল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষিত হন; বৈদেশিক নীতির দায়িত্বও থাকে তাঁর হাতে। সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত কনফেডারেশনের রাইখস্টাগের বৈধানিক ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ছিল: তার অনুমোদিত আইনগুলি বলবৎ হত প্রতিক্রিয়াশীল ফেডারেল পরিষদের অনুমোদন ও প্রেসিডেণ্টের অনুমোদনের পরেই। কনফেডারেশনের সংবিধান পরে জার্মান সাম্রাজ্যের সংবিধানের ভিত্তি হয়।

১৮৫০-এর সংবিধান অনুযায়ী প্রাশিয়ায় এক ঊর্ধ্বতন কক্ষ থেকে যায়, এটি গঠিত ছিল প্রধানত ভূম্যধিকারীদের (Herrenhaus) প্রতিনিধিদের নিয়ে, আর ল্যাণ্ডটাগের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত — সমস্ত বৈধানিক উদ্যোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মন্ত্রীদের নিযুক্ত করতেন রাজা এবং তাঁরা তাঁর কাছেই দায়ী থাকতেন। রাজদ্রোহের বিচার করার জন্য সরকারের বিশেষ আদালত গঠনের অধিকার ছিল। ১৮৭১ সালে জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ার পরেও ১৮৫০-এর সংবিধান প্রাশিয়ায় বলবৎ ছিল। পৃঃ ৪৩

(৫৬) *The Manchester Guardian* — ব্রিটিশ সংবাদপত্র, 'অবাধ বাণিজ্যের' পক্ষপাতীদের মুখপত্র, পরে লিবারেল পার্টির মুখপত্র হয়; ১৮২১ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে স্থাপিত। পৃঃ ৪৫

(৫৭) **কাস্টমস পার্লামেণ্ট** — ১৮৬৬-র যুদ্ধের পর ৮ জুলাই, ১৮৬৭ তারিখে প্রাশিয়া ও দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তি সন্ধির পরে পুনর্বিন্যস্ত কাস্টমস ইউনিয়নের পরিচালন-সংস্থা। পার্লামেণ্ট গঠিত হয়েছিল উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের রাইখস্টাগের সদস্যবৃন্দ এবং দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রগুলির বিশেষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে। এর একমাত্র কাজ ছিল বাণিজ্য ও শুল্ক নীতির প্রশ্ন বিবেচনা করা; ক্রমে ক্রমে এর ক্ষমতা বাড়িয়ে অন্যান্য, রাজনৈতিক বিষয় পর্যন্ত প্রসারিত করার জন্য বিসমার্ক যে-চেষ্টা করেন, দক্ষিণ জার্মানির প্রতিনিধিদের তরফ থেকে তা দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। পৃঃ ৪৫

(৫৮) মাইন নদী ছিল উত্তর জার্মান কনফেডারেশন ও দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমান্ত রেখা। পৃঃ ৪৫

(৫৯) ৫৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৬০) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ৩ অক্টোবর, ১৮৬৬ তারিখে ভিয়েনায় স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষে অংশগ্রহণকারী ইতালিকে ভেনিস ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু দক্ষিণ টিরোল ও ত্রিয়েস্ত দখলের দাবি পূরণ করা হয় নি। পৃঃ ৪৮

(৬১) প্যারিসস্থিত রাষ্ট্রদূত কাউণ্ট আপোনিয়াই-র কাছে ৬ অগস্ট, ১৮৪৭ তারিখে প্রেরিত বার্তায় অস্ট্রীয় চ্যান্সেলার মেটেরনিখের এই উক্তির প্রসঙ্গোল্লেখ করা হয়েছে: 'ইতালি — একটা ভৌগোলিক ধারণা'। পরে তিনি জার্মানির ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করেন। পৃঃ ৪৮

(৬২) লুক্সেমবুর্গ প্রশ্ন নিয়ে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, নেদার্ল্যান্ডস ও লুক্সেমবুর্গের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের **লণ্ডন সম্মেলন** অনুষ্ঠিত হয় ৭ থেকে ১১ মে, ১৮৬৭-তে। ১১ মে তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী লুক্সেমবুর্গ ডাচিকে (আগেকার মতোই, ডিউক উপাধিটির স্থায়ী অধিকারী থাকেন নেদার্ল্যান্ডসের রাজা) নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। প্রাশিয়া অবিলম্বে লুক্সেমবুর্গ দুর্গ থেকে তার গ্যারিসন সরিয়ে নেওয়ার কথা দেয় এবং তৃতীয় নেপোলিয়নকে লুক্সেমবুর্গ দখলের দাবি পরিত্যাগ করতে হয়। পৃঃ ৪৮

(৬৩) **'বদমাশের দল'** প্রথমে ছিল ১৮শ শতকের অষ্টম দশকে ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমিতির নাম, সদস্যদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য তা কুখ্যাতি অর্জন করেছিল; পরে 'বদমাশের দল' কথাটা যেকোনো দুর্বৃত্ত ও সন্দেহজনক লোকজনের দঙ্গলের সাধারণ নাম হয়ে গিয়েছিল। পৃঃ ৫০

(৬৪) **স্পিখার্ন** (লোরেন) ও **ভোর্থ** (অ্যালসেস)-এর লড়াইয়ে প্রুশীয় সৈন্যরা ৬ অগস্ট, ১৮৭০ তারিখে ফরাসীদের পরাস্ত করে। ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে সবচেয়ে বড় লড়াইগুলির অন্যতম — সেদান এলাকার লড়াইয়ে ফরাসী বাহিনী ২ সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ তারিখে নতিস্বীকার করে এবং সম্রাটসহ বন্দী হয়। পৃঃ ৫১

(৬৫) **১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর** জনগণ বিপ্লবের পথে নামে, যার ফলে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন (১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য) এবং একই সঙ্গে প্রজাতন্ত্র আর

অস্থায়ী সরকারের গোড়াপত্তন ঘটে। তবে এ সরকার দেশদ্রোহিতা এবং বহিঃশত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশ্বাসঘাতকতামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।
পৃঃ ৫১

(৬৬) **য়ুংকার** — সংকীর্ণ অর্থে প্রাশিয়ার ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী; ব্যাপক অর্থে — জার্মান ভূস্বামীদের শ্রেণী। পৃঃ ৫২

(৬৭) **ফ্রাঁ-তিরো** — ১৮৭০-১৮৭১-এর ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধের সময়ে প্রুশীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ফরাসী গেরিলাদের এই নাম দেওয়া হয়েছিল। পৃঃ ৫২

(৬৮) **'লান্ডস্টার্ম সংবিধি'** — নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে ও দুই পাশে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি গ্রহণ করবে এমন স্বেচ্ছাব্রতী বাহিনী গঠনের বন্দোবস্ত করে ২১ এপ্রিল, ১৮১৩ তারিখে প্রাশিয়ায় গৃহীত একটি আইন।
পৃঃ ৫২

(৬৯) *Kölnische Zeitung* ('কলোন সংবাদপত্র') — ১৮০২ সাল থেকে কলোনে প্রকাশিত জার্মান দৈনিক সংবাদপত্র। পৃঃ ৫৩

(৭০) ১৯ মার্চ তারিখে বার্লিনের অভ্যুত্থানকারী জনগণ প্রুশীয় রাজা চতুর্থ ফ্রিডরিখ ভিলহেল্মকে অলিন্দে এসে জনগণের সামনে দেখা দিতে এবং ১৮ মার্চ, ১৮৪৮ তারিখের গণ অভ্যুত্থানে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁদের মৃতদেহের সামনে তাঁর মাথা অনাবৃত করতে বাধ্য করেন। পৃঃ ৫৪

(৭১) জার্মান সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত স্ত্রাসবুর্গ ফরাসী সৈন্যরা চতুর্দশ লুইয়ের নির্দেশে ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৬৮১ তারিখে অধিকার করে নেয়। বিশপ ফ্যুরস্টেনবার্গের নেতৃত্বে নগরীর ক্যাথলিক পার্টি ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তিকে অভিনন্দন জানায় এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যাতে না হয় সে জন্য সাহায্য করে।
পৃঃ ৫৫

(৭২) **'পুনর্মিলন কক্ষ'** চতুর্দশ লুই গঠন করেন ১৬৭৯ ও ১৬৮০ সালে; প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির জমির উপরে ফ্রান্সের দাবির যাথার্থ্য প্রমাণ করার জন্য আইনগত ও ঐতিহাসিক যুক্তি যোগানোর দায়িত্ব এর উপরে ন্যস্ত করা হয়েছিল; পরবর্তীকালে ফরাসী ফৌজ এই জমিগুলি দখল করে নেয়।
পৃঃ ৫৬

(৭৩) **'মার্সেইয়েজ'** — ১৮শ শতকের শেষ দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের বৈপ্লবিক গান। পৃঃ ৫৮

(৭৪) **কার্টেল** — জানুয়ারি, ১৮৮৭-তে বিসমার্ক রাইখস্টাগ ভেঙে দেওয়ার পরে গঠিত দুটি রক্ষণশীল পার্টি ('রক্ষণশীল' ও 'মুক্ত রক্ষণশীল') ও জাতীয় উদারপন্থীদের জোট। তারা বিসমার্ক সরকারকে সমর্থন করে। ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭-তে কার্টেল নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং রাইখস্টাগে অধিকার করে প্রাধান্যপূর্ণ স্থান (২২০টি আসন)। এই জোটের উপরে নির্ভর করে বিসমার্ক য়ুঙ্কার ও বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল আইন চালু করেন। কার্টেলের শরিকদের মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি এবং ১৮৯০-এর নির্বাচনে তার পরাজয়ের ফলে (তারা মাত্র ১৩২টি আসন পেয়েছিল) কার্টেল ভেঙে যায়। পৃঃ ৬৩

(৭৫) ভার্সাই প্রাসাদে ১৮ জানুয়ারি, ১৮৭১ তারিখে প্রুশীয় রাজা প্রথম ভিলহেল্মের জার্মান সম্রাট ঘোষিত হওয়ার কথা এঙ্গেলস এখানে উল্লেখ করছেন। পৃঃ ৬৪

(৭৬) এখানে ১৮৭৩ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলা হচ্ছে। 'ব্যাপক ভাঙনের' মধ্য দিয়ে এ সংকট শুরু হয় জার্মানিতে, ১৮৭৩ সালের মে মাসে। দীর্ঘমেয়াদি সেই সংকটের এটি ছিল কেবল সূচনা মাত্র। এ সংকট চলে ৭০-এর বছরগুলির শেষ পর্যন্ত। পৃঃ ৬৬

(৭৭) **প্রগতিবাদীরা** — জুন, ১৮৬১-তে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রুশীয় বুর্জোয়া পার্টির সদস্যবৃন্দ। প্রগতিবাদী পার্টি ছিল প্রুশীয় কর্তৃত্বাধীনে জার্মানির একীকরণের পক্ষপাতী, এবং এক সারা-জার্মান পার্লামেণ্ট আহ্বান ও প্রতিনিধি সভার কাছে দায়ী এক উদারপন্থী মন্ত্রিসভা গঠনের ডাক দিয়েছিল। পৃঃ ৬৭

(৭৮) এখানে বেবেল ও লিব্‌ক্লেখ্‌টের নেতৃত্বে গঠিত **জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি** (আইজেনাখপন্থী) এবং **লাসালপন্থীদের নিখিল জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের** কথা বলা হচ্ছে।

১৮৭৫ সালের ২২-২৭ মে গোথা কংগ্রেসে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের এই দুই ধারার মিলন ঘটে। মিলিত সেই পার্টির নাম হয়েছিল জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি। পৃঃ ৬৮

(৭৯) **ডন্ কুইক্সোট** — পর্যটক নাইট, স্পেনের লেখক সেরভানতেসের উপন্যাস 'ডন্ কুইক্সোট'-এর নায়ক। পৃঃ ৭০

(৮০) উত্তর জার্মান কনফেডারেশনে অন্তর্ভুক্তি (নভেম্বর, ১৮৭০) সংক্রান্ত চুক্তিতে এবং জার্মান সাম্রাজ্যের সংবিধানে লিপিবদ্ধ ব্যাভেরিয়া ও ভ্যুর্টেমবের্গের

বিশেষ অধিকারের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ফেডারেল পরিষদে ব্যাভেরিয়া, ভ্যুর্টেমবের্গ ও স্যাক্সনির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে এক বিশেষ কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার ছিল ভেটো প্রয়োগের অধিকার। পৃঃ ৭১

(৮১) **শোফেনের আদালত** — জার্মান সাম্রাজ্যের নিম্নতর আদালত, এগুলি ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর কতকগুলি জার্মান রাষ্ট্রে এবং ১৮৭১ সাল থেকে সারা জার্মানিতে প্রবর্তন করা হয়েছিল। তখন সেগুলি তৈরি হত রাজশক্তির একজন আধিকারিক ও দুজন শোফেনকে নিয়ে। জুরিদের সঙ্গে শোফেনদের তফাৎ ছিল এই যে তারা শুধু অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কেই সিদ্ধান্ত নিত না, বিচারকের সঙ্গে রায়ও দিতে পারত; একমাত্র আবাসিক ও সম্পত্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই পদে কাজ করতে পারত। পৃঃ ৭৬

(৮২) এখানে **১৮৭২ সালের প্রুশীয় প্রশাসনিক সংস্কারের** কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে গ্রামাঞ্চলে উত্তরাধিকারযোগ্য সামন্ততান্ত্রিক ভূসম্পত্তির বিলোপ ঘটানো হয় এবং কিছুটা স্থানীয়-স্বশাসন প্রবর্তন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য য়ুঙ্কার-ভূস্বামীরা স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে তাদের ক্ষমতা বজায় রেখেছিল, তারা অধিকাংশ নির্বাচিত ও নিযুক্ত পদ রেখে দিয়েছিল নিজেদের হাতে, অথবা সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত তাদের নিজেদের লোকজন মারফৎ। পৃঃ ৭৭

(৮৩) এখানে ১৮৮৮ সালে রূপায়িত **ব্রিটেনের স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্কারের** কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংস্কার অনুযায়ী শেরিফের কাজ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কাউন্টিগুলিতে নির্বাচিত পরিষদের কাছে, তারাই কর সংগ্রহ, স্থানীয় বাজেট প্রভৃতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। পার্লামেণ্ট নির্বাচনের ভোটাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিরা এবং ত্রিশ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে নারীরা কাউন্টি পরিষদ নির্বাচিত করত। পৃঃ ৭৮

(৮৪) **Helot** — প্রাচীন স্পার্টার ভূমিদাস, তারা ভূমির সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ ছিল আর জমিদার, তথা স্পার্টানদের (প্রাচীন স্পার্টার পরিপূর্ণ অধিকারসম্পন্ন নাগরিক সম্প্রদায়) সেবা করতে বাধ্য ছিল। পৃঃ ৭৯

(৮৫) **আলট্রামনটানিজম** — ক্যাথলিক ধর্মমতে এক অতি-প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা, যার অভীষ্ট ছিল সব দেশের ধর্মীয় ও ধর্ম-বহির্ভূত বিষয়ে পোপের সীমাহীন প্রভাব। আলট্রামনটানিস্টদের (পোপের অপ্রতিহত ক্ষমতায় বিশ্বাসীদের) জয়ের ফলে ভাটিকান পোপের 'অভ্রান্ততার' মতবাদ গ্রহণ করে। পৃঃ ৮০

(৮৬) পোপ-শাসিত অঞ্চলে ২ অক্টোবর, ১৮৭০ তারিখে এক গণভোটের পর সেই অঞ্চল ইতালীয় রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্পূর্ণ হয় দেশের একীকরণ।

ভাটিকান ও লাটেরান প্রাসাদের এবং তাঁর শহরের বাইরের বাসভবনের গণ্ডীর ভিতরে ছাড়া পোপের সমস্ত ধর্ম-বহির্ভূত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। প্রতিবাদে পোপ নিজেকে 'ভাটিকানের বন্দী' বলে ঘোষণা করেন। পোপ ও ইতালি সরকারের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি হয় ১৯২৯ সালে। পৃঃ ৮০

(৮৭) **গোয়েল্‌ফরা** — হানোভারের প্রাশিয়ায় অন্তর্ভুক্তির পর ১৮৬৬ সালে গঠিত হানোভারের একটি পার্টি (হানোভার সার্বভৌমদের প্রাচীন বংশ গোয়েল্‌ফ থেকে এই নামকরণ)। পার্টির লক্ষ্য ছিল হানোভার রাজবংশের অধিকার পুনরুদ্ধার এবং জার্মান সাম্রাজ্যের ভিতরে হানোভারের স্বায়ত্তশাসন। পৃঃ ৮১

(৮৮) **'১৮৯১-এর খসড়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচির সমালোচনা'** রচনাটি সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে এবং জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিপ্লবী, মার্কসবাদী কর্মসূচির জন্য এঙ্গেলসের আপসহীন সংগ্রামের একটি নিদর্শন। এটি লেখার অব্যবহিত কারণ ছিল পার্টির কার্যনির্বাহী সংস্থা প্রণীত জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির খসড়া কর্মসূচি, এটি এঙ্গেলসের কাছে পাঠানো হয়েছিল। নতুন কর্মসূচিটি এরফুর্ট কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়ে ১৮৭৫ সালের গোথা কর্মসূচির স্থলে বলবৎ হওয়ার কথা ছিল। রাজনৈতিক দাবি সংবলিত যে-অংশে পুঁজিবাদের শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা-সংক্রান্ত সুবিধাবাদী চিন্তাকে টেনে নিয়ে চলার চেষ্টা করা হয়েছিল এঙ্গেলস তার কঠোর সমালোচনা করেন। খসড়ার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির সমালোচনা করে এঙ্গেলস এই রচনায় কতকগুলি মার্কসীয় নীতির বিকাশ ঘটান: প্রলেতারীয় আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিভিন্ন পথ সম্পর্কে, প্রলেতারীয় রাষ্ট্র ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে। এঙ্গেলসের সমালোচনামূলক মন্তব্য এবং এঙ্গেলসের নির্বন্ধে একই সময়ে প্রকাশিত মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা খসড়া' (এই সংস্করণের ৯ম খণ্ড দ্রষ্টব্য) কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার ধারার উপরে ও তার বিশদীকরণের উপরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এরফুর্টে ১৪ থেকে ২১ অক্টোবর, ১৮৯১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জার্মানির **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কংগ্রেসে** গৃহীত কর্মসূচি গোথা কর্মসূচির তুলনায় সামনের দিকে একটা বড় পদক্ষেপ ছিল; সংস্কারপন্থী লাসালীয় গোঁড়া মতবাদ থেকে তা মুক্ত হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিগুলি সূত্রায়িত হয়েছিল আরও স্পষ্টভাবে। পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পতন

ও সমাজতন্ত্রের দ্বারা তার স্থান গ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞাকে কর্মসূচিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছিল এবং সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছিল যে সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরসাধনের উদ্দেশ্যে প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে।

সেই সঙ্গে এরফুর্ট কর্মসূচির গুরুতর কিছু ত্রুটিও ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞাটির অনুপস্থিতি। এইভাবে, কর্মসূচির চূড়ান্ত বয়ান রচনার সময়ে এঙ্গেলসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটিই উপেক্ষা করা হয়েছিল।

এঙ্গেলসের '১৮৯১-এর খসড়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচির সমালোচনা' জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতৃত্ব দীর্ঘকাল প্রকাশ করেন নি; এটি প্রকাশিত হয় কেবল ১৯০১ সালে *Neue Zeit* পত্রিকায়।

পৃঃ ৮২

(৮৯) এখানে ১৮৭৫ সালের গোথা কর্মসূচির কথা হচ্ছে। পৃঃ ৮২

(৯০) **সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন** জার্মানিতে জারি করা হয়েছিল ১৮৭৮ সালের ২১ অক্টোবর। এই আইন বলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, বড় বড় শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়; সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য করা হয় বাজেয়াপ্ত, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের উপর চালান হয় নির্যাতন। বিপুল শ্রমিক আন্দোলনের চাপের ফলে এই আইন রদ করা হয় ১৮৯০ সালের ১ অক্টোবর। পৃঃ ৮৩

(৯১) ৫৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯২) ৪০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯৩) ১৮৭১ সালে জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বড় ও ছোট তরফের রয়েস ডিউকদের অধীনস্থ দুটি বামনাকৃতি 'সার্বভৌম' রাষ্ট্র — রয়েস-গ্রেইৎস ও রয়েস-গ্রেইৎস-শ্লেইৎস-লোবেনস্টাইন-এবের্সডর্ফকে এঙ্গেলস ব্যঙ্গচ্ছলে একটিমাত্র নামে যুক্ত করেছেন। পৃঃ ৮৮

(৯৪) **ম্যাঞ্চেস্টারবাদ** — শিল্প-বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের পরিচায়ক অর্থনৈতিক চিন্তার একটি ধারা। এই ধারার প্রবক্তারা — অবাধ বাণিজ্যপন্থীরা ছিল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী এবং অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের সমস্ত হস্তক্ষেপের বিরোধী। দুজন সুতিবস্ত্র কারখানা-মালিক কবডেন ও ব্রাইটের নেতৃত্বে এদের কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল ম্যাঞ্চেস্টারে। সপ্তম দশকে অবাধ বাণিজ্যপন্থীরা ছিল উদারপন্থী পার্টির বামপন্থী অংশ। পৃঃ ৯০

(৯৫) ৮২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯৬) এখানে উল্লেখ করা হয়েছে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের একনায়কতন্ত্রের কথা, ১৭৯৯ সালের ১৮ ব্রুমেয়ার (৯ নভেম্বর) কু দে'তার ফলে তিনি নিজেকে প্রথম কনসাল বলে ঘোষণা করেন। ১০ অগস্ট, ১৭৯২ তারিখে ফ্রান্সে যে প্রজাতন্ত্রীয় ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল, এই সরকার তার স্থান গ্রহণ করে। ১৮০৪ সালে ফ্রান্সকে একটি সাম্রাজ্য বলে এবং নেপোলিয়নকে সরকারীভাবে তার সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়। পৃঃ ৯২

(৯৭) নভেম্বর, ১৮৮০-তে হাভ্র কংগ্রেসে গৃহীত ফরাসী শ্রমিক পার্টির কর্মসূচির কথা এঙ্গেলস উল্লেখ করছেন। মে, ১৮৮০-তে অন্যতম ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতা জ. গেদ লন্ডনে এসে পেঁছিন, সেখানে মার্কস, এঙ্গেলস ও লাফার্গের সঙ্গে একত্রে তিনি খসড়া কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। কর্মসূচির তত্ত্বগত মুখবন্ধটি মার্কস মুখে বলে যান গেদ তা লিখে নেন। পৃঃ ৯৫

(৯৮) স্পেনের সোশ্যালিস্ট শ্রমিক পার্টির কর্মসূচি ১৮৮৮ সালে বার্সেলোনা কংগ্রেসে গৃহীত হয়। পৃঃ ৯৫

(৯৯) এখানে ১৮৪৬ সালের জুনে ইংলন্ডের পার্লামেণ্ট কর্তৃক শস্য আইন রদ-সংক্রান্ত বিলের কথা বলা হচ্ছে। বিদেশ থেকে শস্য আমদানি সীমাবদ্ধ কিংবা নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত তথাকথিত **শস্য আইন** ইংলন্ডে চালু হয়েছিল বড় জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। অবাধ বাণিজ্যের স্লোগান নিয়ে যে-সমস্ত শিল্প-বুর্জোয়ারা শস্য আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিল, ১৮৪৬ সালে এই বিল গৃহীত হবার ফলে তাদেরই বিজয় ঘোষিত হয়। পৃঃ ৯৮

(১০০) ট্রাক-সিসটেম নিষিদ্ধ করা বিল গৃহীত হয় ১৮৩১ সালে; কিন্তু বহু কারখানা-মালিক তা লঙ্ঘন করে।

শুধু বালক ও নারী-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দশ-ঘণ্টা শ্রমদিনের বিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত হয় ৮ জুন, ১৮৪৭ তারিখে। পৃঃ ৯৯

(১০১) **ছোট আয়ার্ল্যান্ড** ('Little Ireland') — ম্যাঞ্চেস্টারের দক্ষিণ শহরতলীর একটি মহল্লা, এখানে প্রধানত আইরিশ শ্রমিকদের বাস।

সেভেন ডায়াল্স ('Seven Dials') — লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে শ্রমিকদের একটি মহল্লা। পৃঃ ১০১

(১০২) **কুটির প্রথা** অনুযায়ী কারখানা-মালিকরা শ্রমিকদের বাসস্থান যোগাত শৃঙ্খলিত করে রাখার মতো শর্তে। মজুরি থেকে ভাড়া কেটে নেওয়া হত। পৃঃ ১০২

(১০৩) এখানে ২২ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ পর্যন্ত পেনসিলভানিয়ায়

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ১২,০০০-এর বেশি খনি-শ্রমিকদের ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্লাস্ট ফার্নেস ও কোক ফার্নেসের শ্রমিকরা আরও বেশি মজুরি ও উন্নততর কাজের অবস্থা দাবি করে এবং কতকগুলি দাবি আদায়ে সফল হয়। পৃঃ ১০২

(১০৪) *The Commonweals* ('সাধারণ কল্যাণ') — ১৮৮৫ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত এবং ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক; এটি ছিল সোশ্যালিস্ট লীগের মুখপত্র। ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ সালে এঙ্গেলস এই পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। পৃঃ ১০৪

(১০৫) **জনগণের সনদ** — চার্টিস্টদের দাবিদাওয়া সম্বলিত এই সনদটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালের ৮ মে। (**চার্টিজম** — ১৮৩০-১৮৫০ সালে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতদের প্রথম বৈপ্লবিক গণ আন্দোলন।) খসড়া আইন হিসেবে এই সনদটি পাশ করানোর প্রয়াসে পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। এতে মোট ছয় দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল: সর্বজনীন ভোটাধিকার (একুশ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের পুরুষের ক্ষেত্রে), প্রতিবছর পার্লামেণ্টে ভোট-ব্যবস্থা, গোপন ভোটদান প্রথা, প্রতিটি ভোটদান কেন্দ্রের সমতা, পার্লামেণ্টে ডেপুটি পদপ্রার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তির শর্তের বিলোপসাধন, প্রতিনিধিদের পুরস্কৃত করা। জনগণের সনদ পাশ করার দাবি জানিয়ে যে-তিনবার চার্টিস্টরা পার্লামেণ্টে আবেদন জানান, তা যথাক্রমে ১৮৩৯, ১৮৪২ ও ১৮৪৯ সালে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়। পৃঃ ১০৪

(১০৬) এখানে জনগণের সনদ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে আবেদনপত্র পেশ কারর জন্য ১৮৪৮ সালের ১০ এপ্রিল চার্টিস্টরা লণ্ডনে যে বিপুল শোভাযাত্রার আয়োজন করেন তার কথা বলা হচ্ছে; সংগঠকদের দোদুল্যমানতা ও দুর্বল মনোভাবের জন্য তা ব্যর্থ হয়। শোভাযাত্রার এই ব্যর্থতার ঘটনাটিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি শ্রমিকদের উপর আক্রমণ ও চার্টিস্টদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগায়। পৃঃ ১০৫

(১০৭) এখানে ১৮৩১ সালে ব্রিটিশ কমন্স সভায় গৃহীত এবং ১৮৩২ সালের জুনে লর্ড সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত **ভোটাধিকার সংস্কার** বিলের কথা বলা হচ্ছে। এই সংস্কারের ফলে শিল্প-বুর্জোয়াদের পার্লামেণ্টে প্রবেশের পথ সুগম হয়। এই সংস্কারের সমর্থনে সংগ্রামের প্রধান শক্তি তথা প্রলেতারিয়েত আর পেটি বুর্জোয়ারা উদারপন্থী বুর্জোয়া কর্তৃক প্রতারিত হয়, ফলে তারা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। পৃঃ ১০৫

(১০৮) **১৮৬৭ সালে** শ্রমিক গণ আন্দোলনের চাপে ব্রিটেনে **দ্বিতীয় পার্লামেণ্টারি সংস্কার** সম্পন্ন হয়। এর ফলে ব্রিটেনে ভোটদাতার সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পায়; দক্ষ শ্রমিকদের নির্দিষ্ট অংশও ভোটাধিকার পায়।

১৮৮৪ সালে গ্রামাঞ্চলে গণ আন্দোলনের চাপে ব্রিটেনে **তৃতীয় পার্লামেণ্টারি সংস্কার** সম্পন্ন হয়। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে ভোটাধিকার দেওয়া হয় সেই সব শর্তে, যেগুলি ১৮৬৭ সালেই শহরের মানুষের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল। সংস্কারের পরও জনসমষ্টির ব্যাপক অংশ, বিশেষত গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত, শহরের গরিব ও নারীরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। পৃঃ ১০৭

(১০৯) **ইস্ট এণ্ড** — লণ্ডনের একটি অঞ্চল। পৃঃ ১০৯

(১১০) **বৈজ্ঞানিক বিকাশসাধনের ব্রিটিশ সমিতি** ১৮৩১ সালে স্থাপিত হয় এবং বর্তমানেও তা টিকে রয়েছে; সমিতির বার্ষিক সভার মাল-মশলা প্রকাশিত হয় বিবরণীরূপে। পৃঃ ১১০

(১১১) ইতালির শ্রমজীবী জনগণের সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতাদের অনুরোধে এঙ্গেলস এই প্রবন্ধটি লেখেন; দেশের শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন যখন এক ব্যাপক আকার ধারণ করছে সেই সময়ে পার্টির কোন রণকৌশল গ্রহণ করা উচিত সে-বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করার জন্য তারা তাঁকে অনুরোধ করেছিল। ইতালিতে যে বিপ্লব পরিপক্ব হয়ে উঠছে তার বুর্জোয়া চরিত্রের উপরে জোর দিয়ে এঙ্গেলস বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এবং শ্রেণী হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সোশ্যালিস্টদের গ্রহণীয় রণকৌশল বর্ণনা করেছেন। পৃঃ ১১৬

(১১২) **'পরিবর্তিত'** প্রজাতন্ত্রী নামটি দেওয়া হয়েছিল ফ. কাভালোত্তির নেতৃত্বাধীন ইতালীয় র‍্যাডিক্যালদের। পেটি ও মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ প্রকাশ করে র‍্যাডিক্যালরা গণতান্ত্রিক অবস্থান গ্রহণ করেছিল এবং অনেকগুলি ক্ষেত্রে সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। পৃঃ ১১৭

(১১৩) *La Réforme* ('সংস্কার') — পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী বিপ্লবী ও পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের মুখপত্র, ফরাসী দৈনিক সংবাদপত্র। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১২০

(১১৪) ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮ তারিখে গঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকারে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী লেদ্রু-রলাঁ ও ফ্লকোঁ, পেটি বুর্জোয়া সোশ্যালিস্ট লুই ব্লাঁ-র অংশগ্রহণের কথা এখানে বলা হয়েছে। পৃঃ ১২০

(১১৫) এঙ্গেলসের **'ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা'** কৃষি-বিষয়ক প্রশ্নে একটি প্রধান মার্কসবাদী রচনা। এটি লেখার আশু কারণ ছিল ফলমার ও অন্য সুবিধাবাদীদের ১৮৯৪ সালে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ফ্রাংকফুর্ট কংগ্রেসে খসড়া কৃষি-বিষয়ক কর্মসূচির আলোচনাকে ধনী কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর, ইত্যাদি সংক্রান্ত মার্কসবাদ-বিরোধী 'তত্ত্ব' চোরাপথে আমদানি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা। ১৮৯২ সালে মার্সাইয়ে গৃহীত ও ১৮৯৪ সালে নান্তে পরিবর্ধিত কৃষি-বিষয়ক কর্মসূচিতে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে ও সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে ফরাসী সোশ্যালিস্টরা যে-ভুল করেছিল তা সংশোধন করার বাসনাও এঙ্গেলসকে এই রচনাটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এঙ্গেলস কৃষকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামনা-সামনি প্রলেতারীয় কর্মনীতির বিপ্লবী নীতি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতি কৃষকসমাজের মধ্যে মৈত্রীর ধারণাটিকে বিশদ করেছেন। পৃঃ ১২২

(১১৬) ১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১১৭) **দেওয়ানি বিধিটি** (Code civil) গৃহীত হয় ১৮০৪ সালে প্রথম নেপোলিয়নের আমলে এবং ইতিহাসে তা 'নেপোলিয়ন সংহিতা' হিসেবে বিখ্যাত। পৃঃ ১২৮

(১১৮) *Sozialdemokrat* ('সোশ্যাল-ডেমোক্রাট') — জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৮৯৪-১৮৯৫ সালে বার্লিনে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৪৩

(১১৯) মধ্যযুগীয় জার্মান জাতির পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের (১০ নং টীকা দ্রষ্টব্য) নাম এঙ্গেলস পরিবর্তন করেছেন এই বিষয়টির উপরে জোর দেওয়ার জন্য যে জার্মানির একীকরণ কার্যকর হয়েছিল প্রুশীয় কর্তৃত্বাধীনে এবং তার সহগ ছিল জার্মান ভূমির প্রুশীয়করণ। পৃঃ ১৪৭

(১২০) যে বইটির কথা বলা হয়েছে সেটি হল ১৮৯০ সালে লাইপজিগে প্রকাশিত প. বার্টের 'Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer bis auf Marx und Hartmann' ('হেগেল এবং মার্কস ও হার্টমান অবধি হেগেলপন্থীদের ইতিহাসের দর্শন')। পৃঃ ১৪৯

(১২১) *Deutsche Worte* ('জার্মান বাণী') — অস্ট্রীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক পত্রিকা, ১৮৮১ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত ভিয়েনায় প্রকাশিত হয়।

ম. ভির্ট-এর 'সমকালীন জার্মানিতে হেগেল বিষয়ে দৌরাত্ম্য ও তাঁর নিগ্রহ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকার ১৮৯০ সালের ৫ম সংখ্যায়। পৃঃ ১৪৯

(১২২) *Berliner Volks-Tribüne* ('বার্লিন গণমঞ্চ') — সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সাপ্তাহিক পত্র; 'ইয়ং' নামধারী আধা-নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীর দিকে ঝুঁকেছিল; প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে।

'প্রত্যেককে সম্পূর্ণ শ্রমফল' বিষয়ে আলোচ্য নিবন্ধটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৪ জুন ও ১২ জুলাই, ১৮৯০-এর মধ্যে। পৃঃ ১৫০

(১২৩) **রিফর্মেশন** (ধর্মসংস্কার)—ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক গণ আন্দোলন; ১৬শ শতকে এতে জড়িত হয়েছিল জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইংলন্ড, ফ্রান্স এবং অন্য আরো দেশ। যে-সমস্ত দেশে ধর্মসংস্কার জয়ী হয় সেখানে এর ধর্মীয় উত্তরাধিকার হিসেবে গড়ে ওঠে বহু নতুন তথাকথিত প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্চ (ইংলন্ডে, স্কটল্যান্ডে, নেডারল্যান্ডসে, জার্মানির কিছু কিছু অঞ্চলে ও স্ক্যানডিনেভিয়ায়)। পৃঃ ১৫৫

(১২৪) *Züricher Post* ('জুরিখ পোস্ট') — ১৮৭৯-১৯৩৬ সালে জুরিখে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র। পৃঃ ১৫৭

(১২৫) এখানে **নেপোলিয়ন সংহিতা** বলতে এঙ্গেলস কেবল দেওয়ানি বিধিটিকেই (Code civil) (১১৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য) বোঝাচ্ছেন না, বরং ব্যাপক অর্থে তিনি ১৮০৪-১৮১০ সালে প্রথম নেপোলিয়নের আমলে গৃহীত পাঁচটি বিধি (দেওয়ানি, দেওয়ানি মোকদ্দমা, বাণিজ্যিক, ফৌজদারি ও ফৌজদারি মোকদ্দমা) সম্বলিত বুর্জোয়া আইনের সমগ্র পদ্ধতিটিকেই বোঝাতে চাইছেন। নেপোলিয়নের ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত জার্মানির পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলগুলিতে এই বিধি জারি করা হয়েছিল আর ১৮১৫ সালে রেনিশ প্রদেশ প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর পর্যন্ত সে অঞ্চলে এই বিধি চালু ছিল। পৃঃ ১৬১

(১২৬) এখানে ইংলন্ডের **১৬৮৮ সালের রাষ্ট্রীয় কু দে'তার** কথা বলা হচ্ছে, যার ফলে ইংলন্ডে স্টুয়ার্ট বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে এবং ১৬৮৯ সালে অরেঞ্জের উইলিয়মের নেতৃত্বে সংবিধানসম্মত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ভূস্বামী অভিজাত সম্প্রদায় আর বৃহৎ বুর্জোয়াদের মাঝে একটি আপসস্বরূপ। পৃঃ ১৬৩

(১২৭) **ডিইজ্ম**—ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত অন্যতম মতধারা, যাতে ঈশ্বরকে জগতের

নিরাকার ও অতিজ্ঞানী আদি হেতু বলে ধরা হত, তবে তাতে বলা হত যে তিনি কখনই প্রকৃতি ও সমাজের জগতে হস্তক্ষেপ করেন না। পৃঃ ১৬৩

(১২৮) এখানে মেরিংয়ের 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সংক্রান্ত' নামক প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে; এটি ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'লেসিং কিংবদন্তী'র' গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে। পৃঃ ১৬৬

(১২৯) রুসোর তত্ত্বানুসারে আদিকালে মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে বসবাস করত, যেখানে সকলেই ছিল সমান। ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দেওয়ার এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে অসমতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই স্বাভাবিক পরিবেশ ছেড়ে নাগরিক অবস্থায় চলে আসে এবং এর ফলে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের, যা গড়ে উঠেছিল সামাজিক চুক্তির উপর ভিত্তি করে। তবে রুসোর তত্ত্বানুসারে বলা চলে যে, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অসমতা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক এই চুক্তি লঙ্ঘিত হয় এবং অন্যায়-অবিচারের নতুন এক অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই অন্যায়-অবিচার বিলোপ করার ডাক দেয় উন্নত এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, যা কিনা গড়ে ওঠে নতুন এক সামাজিক চুক্তির উপর ভিত্তি করে। পৃঃ ১৬৮

(১৩০) **বাণিজ্যপন্থা** — ১৫-১৮শ শতকে ইউরোপের একাধিক দেশে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে পরিচালিত অর্থনৈতিক রাজনীতি ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতধারার যৌথ পদ্ধতি। যে-সমস্ত রাষ্ট্র বাণিজ্যপন্থী মারকেণ্টাইল পদ্ধতি সমর্থন করত সেখানে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু ছিল, যার কল্যাণে দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ সর্বদাই বেশি ছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই পরিচালিত হত দেশীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতামূলক রাজনীতি।

ফিজিওক্রাট —১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাণিজ্যপন্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত বুর্জোয়া ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম ধারা। বুর্জোয়া সম্পর্ক বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলার উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মনীতির সমর্থনে কাজ করত ফিজিওক্রাটরা; তারা পৃষ্ঠপোষকতাবাদের বিরোধিতা করত, কারখানায় শিল্প-বিভাগ সংকোচনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত, অবাধ বাণিজ্য আর প্রতিযোগিতার দাবি জানাত। পৃঃ ১৬৮

(১৩১) **ক্রুসেড যুদ্ধ** (ধর্ম যুদ্ধ) — ১০৯৬-১২৭০ সালের প্রাচ্যাভিমুখী (সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, উত্তর আফ্রিকা) ঔপনিবেশিক অভিযান; এর উদ্যোক্তা ছিল পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত রাজ আর ক্যাথলিক চার্চ। 'ঈশ্বরের সমাধি-স্থল'

আর 'পবিত্র ভূমি' (প্যালেস্টাইন) উদ্ধারের জন্য ধর্মীয় সংগ্রামের ধ্বনি তুলে বাস্তবে তারা তাদের অন্য দেশ অধিকারের উদ্দেশ্যকে ঢাকার প্রয়াস পেয়েছিল।
পৃঃ ১৬৮

(১৩২) *Die Neue Zeit* ('নবযুগ') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির তাত্ত্বিক পত্রিকা, ১৮৮৩ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত স্টুট্‌গার্টে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫-১৮৯৪ সালে এঙ্গেলস এই পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পৃঃ ১৬৯

(১৩৩) ৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩৪) ১০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩৫) ন. ফ. দানিয়েলসন-এর 'Sketches on our Post-Reform Social Economy' গ্রন্থের কথা এখানে বলা হয়েছে। বইটি ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।
পৃঃ ১৭২

(১৩৬) ১৮৬১ সালে রাশিয়ায় ভূমিদাস-প্রথা লোপ পাবার পর সেখানে উদ্ভূত কৃষি-সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে এখানে। পৃঃ ১৭২

(১৩৭) রাশিয়ার (ভূ) **গোষ্ঠী** — যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার একটি রূপ, যার বিশেষত্ব ছিল অখন্ড বন আর গোচারণ ভূমি, অবশ্যকরণীয় একাধিক ফসলের চাষ। রুশ ভূ-গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বটি হল একের জন্য সকলে দায়ী হওয়া ও সকলের জন্য একজনের দায়ী হওয়া (রাষ্ট্র ও জমিদারদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সঠিক সময়ে পুরো খাজনা দেওয়া আর নানান দায়িত্ব পালন করা — এ সমস্ত ব্যাপারেই কৃষকদের বাধ্যতামূলক যৌথ দায়িত্ব), নিয়মিতভাবে জমিকে পুনর্বণ্টন করা, জমি ছেড়ে পালানোর অধিকার না থাকা, জমি কেনাবেচার উপর নিষেধাজ্ঞা। পৃঃ ১৭৪

(১৩৮) **কুলাক** — গ্রামের গরিবদের শোষণকারী ধনী কৃষক।
মিরোয়েদ — পরাশ্রয়ী। পৃঃ ১৭৪

(১৩৯) **ধার্মিকপনা** — ১৭শ শতকের শেষে প্রটেস্ট্যান্টদের (বিশেষত জার্মান লুথারপন্থীদের) মাঝে উদ্ভূত ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয়বাদী একটি ধারা। এটি চার্চের লোকদেখানো পুজার্চনা মানত না, বিশ্বাসের গভীরতাসাধনের ডাক দিয়েছিল, আমোদ-প্রমোদকে পাপকাজ হিসেবে ঘোষণা করেছিল।
ব্যাপক অর্থে — ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয়বাদ একটি মনোভাব, আচরণ।
পৃঃ ১৭৭

(১৪০) এঙ্গেলসের চিন্তায় রয়েছে গ. গ্যুলিখের নিম্নলিখিত বিশাল রচনাটি: 'Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit' ('আমাদের কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রাষ্ট্রগুলির — বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ঐতিহাসিক বিবরণ'); ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। পৃঃ ১৭৮

(১৪১) *Archiv für Sociale Gesetzgebung und Statistik* পত্রিকার ১৮৯৪ সালের ৭ম খণ্ডে প্রকাশিত জম্বার্টের 'Zur Kritik des ökonomischen Systems von Karl Marx' ('কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক মত বিচার') প্রবন্ধটির কথা বলা হয়েছে। পৃঃ ১৭৯

(১৪২) মে, ১৮৯৫-তে এঙ্গেলস লেখেন তাঁর ''পুঁজি', তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট': 'মূল্য ও মুনাফার হারের নিয়ম' ও 'স্টক এক্সচেঞ্জ'। পৃঃ ১৮২

নামের সূচি

ন

প

ফ

ভ

শ

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union